প্রকাশক :

রুশো মিত্র
৯০ জেমস লঙ্ সরণি
[পূর্বতন, সত্যেন রায় রোড]
কলিকাতা ৩৪

প্রথম প্রকাশ :
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ১৩৬০

প্রচ্ছদ :
প্রবীর সেন

মুদ্রাকর :
অমলেন্দু শিকদার
জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩/২ মণীন্দ্র মিত্র রো
কলিকাতা ৭০০০০৯

বন্ধুবর

অধ্যাপক ড. শ্রীচিত্তরঞ্জন লাহা

এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট.

অশেষ প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি

কর্তাভজাধর্ম : ইতিহাস ও সাহিত্য

লালন ফকির : কবি ও কাব্য

বাঘ ও সংস্কৃতি [সম্পাদিত]

লোকসংস্কৃতি কোষ

Folk Life and Lore of West Bengal

জগতে কোন কিছুই পরিপূর্ণ খারাপ নয়। তাই মারনেওয়ালা ছোট-ইংরেজের অত্যাচার-শোষণ-পীড়ন ও পর-শাসনকে ছাড়িয়ে 'সর্বাংশে মানুষের মতো' বড়ো-ইংরেজ 'তার শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম ও সমাজ লইয়া' সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বাঙালীর মজা চিত্ত-খাতে পূর্ণ-প্রবাহের জোয়ার নিয়ে এসেছিলো,—যার সর্বপ্রধান ফল হলো শেক্সপীয়রের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। সেদিন শেক্সপীয়রকে পেয়ে নতুন নতুন শাখা-প্রশাখায় বাড়তে থাকা আমাদের সাহিত্য-শিশুতরুটি হঠাৎ যেন মহীরুহে পরিণত হয়ে গেলো। সে-এক বিচিত্র ইতিহাস। এখানে সেই বহুধা-বিস্তৃত ইতিহাসের মধ্যে থেকে শুধু বাঙলা নাট্য-সাহিত্য-শাখায় শেক্সপীয়র কতখানি বেগ সঞ্চার করতে পেরেছিলেন তারই আলোচনা করা হয়েছে। শেক্সপীয়রের প্রভাব ভেতর ও বাইরে থেকে বাঙলা নাট্যসাহিত্যকে কতখানি সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করেছে তার আলোচনায় অসম্পূর্ণতা কেউ লক্ষ্য করলে আমি ক্ষুন্ন হবো না,—বরঞ্চ ভবিষ্যতে নিজেকে আরও সম্পূর্ণ করে নিতে পারবো। অতএব রসজ্ঞ পাঠকের কাছে গঠনমূলক অভিভাবনের প্রত্যাশা জানিয়ে রাখলাম।

এই বইটি ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা পত্র হিসাবে 'স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি স্বর্ণপদক'-এর জন্য জমা দিই। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে তার ফল প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যের স্বনামখ্যাত দুই অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ড. অমলেন্দু বসু এবং ড. জগন্নাথ চক্রবর্তী আমার গবেষণাকে অনুমোদন করেন। এই সুযোগে তাঁদের আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এর পরেও কিন্তু দীর্ঘদিন গবেষণাপত্রটিকে ফেলে রাখি আরও কিছু তথ্য-সংগ্রহ ও আমার যুক্তিগুলোকে আরও কিছু পোক্ত জমিতে দাঁড় করানোর আশায়। এই অবসরে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের রীডার প্রীতিভাজন বন্ধু ড উজ্জ্বলকুমার মজুমদারকে ঐ পাণ্ডুলিপিটিকে পড়তে দিই। তিনি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে সেটি পড়ে আমাকে বিভিন্নভাবে পরিমার্জনা করতে বলেন,—তার পরেই সাহস করে ছাপতে দিই। তাই মামুলি ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতিকে ছোট করতে চাই না। অভিন্নহৃদয় বন্ধু ড. পল্লব সেনগুপ্ত এই গবেষণাপত্রটি তৈরীর সময় থেকে গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্ত পর্যন্ত নানা নির্দেশ, পরিকল্পনা করে ও প্রুফ দেখে দিয়ে যেভাবে সাহায্য করেছেন তা এই মৈত্রী

আলাপ ও অকৃত্রিম সুবিধাবাদের দিনে এক দুর্লভ সম্পদ হিসেবে আমার ভাঁড়ারে জমা হয়ে রইল। এই সঙ্গে সহপাঠী বন্ধু কথাসাহিত্যিক তপোবিজয় ঘোষ-এর আগ্রহকেও প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করি।

আমার শিক্ষক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য আমাকে যেভাবে বঙ্গীয় সংস্কৃতি-চর্চার নানাবিভাগে পাদচারণা করতে শিখিয়েছেন তার প্রভাব এই গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রেও অস্পষ্ট থাকে নি, তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আমার দাদা অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত ও দিদিভাই অধ্যাপয়িত্রী ড. জ্যোৎস্না গুপ্ত বরাবর আমার সমস্ত কর্মোদ্যমকে নিষ্কুণ্ঠভাবে শুভেচ্ছা দান করে থাকেন, এখানেও তার ব্যত্যয় হয়নি এবং অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক ও প্রবীণ সাংবাদিক ড. প্রভাতকুমার গোস্বামীও আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের আমার শ্রদ্ধা জানাই।

এই গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রকাশন দপ্তরের সম্পাদক অনুজপ্রতিম ড. তুষারকান্তি মহাপাত্র-এর কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। কারণ, তাঁর সম্প্রীতিঋদ্ধ সহযোগিতা না পেলে এই গ্রন্থপ্রকাশ করা আদৌ সম্ভব হতো না। আমার সহকর্মীদ্বয় ইংরেজীর অধ্যাপক দামোদর দে ও প্রশান্তকুমার সেন আমাকে শেক্সপীয়র ব্যাখ্যায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদেরও আমার আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাই।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সেকালের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আলোকচিত্রগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন প্রখ্যাত নাট্যরসিক শ্রদ্ধেয় হরীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। ঐ আলোকচিত্রগুলি গ্রহণ ও তাকে পরিস্ফুট করার ব্যাপারে 'স্টুডিও রূপার' অজিত দাশগুপ্ত সহযোগিতা করায় তিনি ধন্যবাদার্হ। 'পুস্তক-বিপণি'-র অনুজপ্রতিম অনুপকুমার মাহিন্দার এবং আমার পুত্র-কন্যা রুশো ও কুমারী মহুয়া বইটি প্রকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাতে আমার পক্ষে কাজ করা সহজ হয়েছে, তাঁদের আমার শুভেচ্ছা ও আশিস্ জানাই। আমার কলেজ লাইব্রেরীর তিন কর্ণধার অসিত ব্রহ্ম, জয়দেব কর্মকার, ও হারাধন ভট্টাচার্য আমাকে প্রয়োজনমাত্র বই সরবরাহ করে সাহায্য করায় আমি কৃতজ্ঞ।

সনৎকুমার মিত্র।

● বিষয়-সূচী ●

'শেক্সপীয়ারের নাটক বরাবর আমাদের কাছে নাটকের আদর্শ। তার বহু শাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

['মালিনী' নাটকের ভূমিকা]

বক্ষ্যমান গ্রন্থে শেক্সপীয়রের ইংরেজী উদ্ধৃতির জন্য
The Tudor Edition of William Shakespeare,

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

রোমিও এবং জুলিএটের মনোহর উপাখ্যান।

সেক্সপিয়ারকৃত নাটক গ্রন্থের সংগৃহিত লেম্বস্‌কৃত ইতিহাসের গ্রন্থ হইতে।

শ্রীযুত গুরুদাস হাজরা কর্ত্তৃক বঙ্গীয় সাধুভাষায় অনুবাদিত হইয়া।

শ্রীযুত কালীনাথ সার্ব্বভৌম ও শ্রীযুত গণেশচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের দ্বারা সংশোধিত পুরঃসর।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

TRANSLATED FROM LAMBS TALES FROM SHAKSPEARE.

☞এই পুস্তক যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি সাং মলঙ্গা শুড়িয়ারমাতার পুষ্করণীর দক্ষিণাংসে শ্রীযুত বদনচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের ৩৩ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

সন ১২৫৫ সাল।

বাঙলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম শেক্সপীয়রের অনুবাদ গ্রন্থের পুষ্পিকা।

অশোক উপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

↑
ক্লিওপেট্রার ভূমিকায়
বিনোদিনী দাসী।

'হরিরাজ' ['হ্যামলেট']-এর
ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ।

'ডেস্‌ডিমনা' [তারাসুন্দরী] ও 'ওথেলো' [তারকনাথ পালিত]-র ভূমিকাভিনয়।

আলোকচিত্রত্রয়

হরীন্দ্রনাথ দত্ত-র সৌজন্যে।

শেক্সপিয়র

'যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
ইংলণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে ; ভেবেছিল বুঝি তারি তুমি
কেবল আপন ধন ; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা অঞ্চল অন্তরালে
বনপুষ্পবিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। দ্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠে নি জেগে কবিসূর্যবন্দনাসংগীতে।
তার পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছ দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে ;
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া ; তাই হেরো যুগান্তরশেষে
ভারতসমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।'

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই সনেটটি ১৩২২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা 'সবুজপত্রে' 'শেক্সপিয়র' শিরোনামাঙ্কিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কবি এই কবিতাটি লেখেন শেক্সপীয়র ত্রিশত বার্ষিকী উৎসব কমিটির অনুরোধে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন যে : '১৯১৫ সালে শেক্সপীয়র সোসাইটী একটি ত্রিশতবার্ষিক জয়ন্তী খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেন ; উহাতে পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ ভাষার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা সংগৃহীত হয়।' রবীন্দ্রনাথের এই সনেটটি সেই উপলক্ষে রচিত [শিলাইদহ : ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩২২]। 'সবুজপত্রে' প্রকাশকালে এর নাম ছিলো 'শেক্সপিয়র' কিন্তু 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে [১৯১৬] সংগৃহীত হওয়ার সময় এটি শীর্ষনাম বর্জিত হয়ে ৩৯ নং কবিতা রূপে পরিচিত হয়। এই সঙ্গে আমরা কবি-কৃত এই কবিতার ইংরেজী রূপটিও মুদ্রিত করলাম।

SHAKESPEARE.

When by the far-away sea your fiery disk appeared from behind the unseen, O poet, O Sun, England's horizon felt you near her breast, and took you to be her own.

She kissed your forehead, caught you in the arms of her forest branches, hid you behind her mist mantle and watched you in the green sward where fairies love to play among meadow flowers.

A few early birds sang your hymn of praise while the rest of the woodland choir were asleep.

Then at the silent beckoning of the Eternal you rose higher and higher till you reached the mid-sky, making all quarters of heaven your own.

Therefore at this moment, after the end of centuries the palm groves by the Indian Sea raise their tremulous branches to the sky murmuring your praise..

[1916] Rabindranath Tagore.

১.

সূচনা

ক.

: ইংরেজ ও বাঙালী

ইতিহাস অনুসরণ করে দেখা যাচ্ছে যে ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ 'বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামক এক বণিক দলকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করবার জন্যে সনদ প্রদান করেন।[১] এরপর ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ বণিকেরা তৎকালীন বঙ্গীয় সুবেদার শাহজাহানের পুত্র সুজার [সুবেদারির কাল : এপ্রিল ১৬৩৯—এপ্রিল' ১৬৬০] কাছ থেকে বাঙলা দেশে বাণিজ্য করবার সনদ পান। এবং পরের বছরেই হুগলীতে তাঁরা তাঁদের সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন।[২]

এইভাবে ব্যবসাদারী ইংরেজদের আইন মোতাবেক বাঙলার মাটিতে পা দেওয়ার কয়েক বছর আগে থেকেই ঐ বাণিজ্যের সূত্রেই ইংরেজ বাণিজ্য-পোতকে বাঙলায় আসা-যাওয়া করতে দেখা যাচ্ছে। যেমন : 'For some years before it they had been making there purchases and sales in Bengal from their Agency or Head Factory at Balasore in Orissa [Founded in 1642], through subordinates who used to visit a few centres in Bihar and Bengal periodically every year. At first their transactions in Bengal were on a very limited scale and unprofitable.[৩]

কিন্তু এই বাণিজ্যিক যোগাযোগের মধ্যে বা আগে এবং উক্ত ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিনে ইংলণ্ডে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোং' তৈরী হওয়ার পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে কোন ইংরেজ সন্তানটি, কোন পথ ধরে এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বপ্রথম বাঙলার মাটিতে পা রেখেছিলেন তা আজ সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। তবুও এই বিষয়টি ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে যে ঐ সময়ের মধ্যে কেউ না কেউ জলপথে বা স্থলপথে, ধর্মপ্রচারের বা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে অথবা নিছক নতুন দেশ দেখার কৌতূহল নিয়ে বাঙলা দেশে এসেছিলেন। এবং যিনি এসেছিলেন

তাঁর মধ্যে দিয়েই ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালীর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটেছিলো। কিন্তু সেই সাক্ষাতের সম্ভাবনা যেমনই হোক এবং যার সঙ্গেই হোক, সত্যকারের পরিচয়ের—ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর—সূচনা হয় ঐ ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে নবাবী সনদ লাভের কিছু আগে থেকে। কিন্তু সেও খুবই সাময়িক এবং একান্তভাবেই তাৎক্ষণিক প্রয়োজন-ভিত্তিক পরিচয় বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। আসলে যদি এই ভাবে বলা যায় যে, ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে নবাবী সনদলাভ এবং পরের বছরের হুগলীতে ইংরেজের কুঠি স্থাপনের পর থেকে নানা ঘটনা এবং ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়টি একটি ঐতিহাসিক পথরেখা অনুসরণ করতে থাকে এবং সেই ইতিহাসটি এইরূপ: '১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার সুবাদার সুজা ইংরেজদিগকে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন। কিন্তু বাঙলার মুঘল কর্মচারীরা নানা অজুহাতে এই সুবিধা হইতে ইংরেজদিগকে বঞ্চিত করে। ইংরেজ বণিকগণ শায়েস্তা খান ও সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতেও ফরমান আদায় করেন; কিন্তু তাহাতেও কোন সুবিধা হয় না। ইংরেজরা তখন নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে হুগলীর শাসনকর্তা ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংরেজদের কুঠি আক্রমণ করিলেন। ইংরেজরা বাধা দিতে সমর্থ হইলেও ইংরেজ এজেণ্ট জব চার্ণক সেখানে থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া, প্রথমে সুতানুটি [বর্তমান কলিকাতার অন্তর্গত], পরে হিজলীতে তাহাদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাদের ক্ষতির প্রতিশোধ স্বরূপ বালেশ্বর সহরটি পোড়াইয়া দিলেন। মুঘল সৈন্য হিজলী অবরোধ করিলে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হইল এবং ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা সুতানুটিতে ফিরিয়া গেলেন [সেপ্টেম্বর], কিন্তু লণ্ডনের কর্তৃপক্ষের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাঙলায় একটি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থান অধিকার দ্বারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। জব চার্ণকের আপত্তি সত্ত্বেও ইংরেজরা সুতানুটি হইতে বাণিজ্য কেন্দ্র উঠাইয়া সমস্ত ইংরেজ অধিবাসী ও বাণিজ্য-দ্রব্য জাহাজে বোঝাই করিয়া জলপথে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হইয়া মাদ্রাজে [১৬৮৮] ফিরিয়া গেলেন। আবার উভয় পক্ষে সন্ধি হইল। বাঙলার সুবাদার বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন।'[৪]

এরপর '২৪ আগষ্ট ১৬৯০ সালে চার্ণক তৃতীয়বার সুতানুটির ঘাটে অবতরণ করেন এবং সামরিক ও বাণিজ্যিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সুতানুটিতেই তিনি কোম্পানির বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের স্থির সিদ্ধান্ত করেন। চার্ণকের সিদ্ধান্তের ফলে এই ঐতিহাসিক দিনেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এবং কলকাতা শহরের ভিত স্থাপিত হয়।'[৫] অর্থাৎ নিরাপদ স্থানে বাণিজ্যিক কুঠি নির্মিত হলো, এবং সেই কুঠি পরিচালনার জন্যে স্থায়ী ভাবে ঘরবাড়ী তৈরী হতে থাকলো। অবশ্য এর কিছু আগেই জোব চার্ণক 'ব্রাহ্মণ পত্নী'[৬] সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। অতএব সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাণিজ্য-সংঘর্ষ, চিতা থেকে উদ্ধার করা 'সতী'কে বিবাহ ও অন্যান্য ভাবে ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর যে ধীর পরিচয় ও ক্রম-ঘনিষ্ঠতার সূচনা হয়েছিলো তা এই শতাব্দীর শেষ দশকে এসে একটা স্থায়ী সম্পর্ক তৈরীর ভিত্তি স্থাপন করলো, নিশ্চয়ই। সেই কারণে ঐ তারিখে তৃতীয় দফায় জোব চার্ণকের কোলকাতা পদার্পণের ঘটনাকে ঐতিহাসিক বলা হয়েছে। এবং ঐ সুতানুটি ও তার দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী অপর দুটি গ্রাম কোলকাতা ও গোবিন্দপুরকে নিয়ে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে 'কলিকাতা' নামক স্থানে ইংরেজদের বঙ্গদেশে বাণিজ্যকেন্দ্রের প্রধান নগর গড়ে উঠলো। এবং প্রসঙ্গ সূত্রে আমরা একথা বলতে পারি যে এই কোলকাতাই কালক্রমে ইংরেজ ও বাঙালীর সম্পর্ক স্থাপনের পীঠভূমি রূপে চিহ্নিত হয়েছে। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশির [নদীয়া জেলা] আমবাগানে সিরাজের পরাজয়ের পর ইংরেজ ব্যবসাদার যখন বাঙলার রাজনীতির নিয়ামক হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন থেকেই কোলকাতার অর্থনৈতিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অতিরিক্ত আরও একটি মাত্রা [dimension] যোগ হয়েছে।

সুতানুটি গ্রামে পা রাখার তিন বছর পরে কোলকাতা মহানগরীর আদিপুরুষ, জোব চার্ণকের মৃত্যু হয় ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী। পূর্বেই বলেছি যে ব্রাহ্মণ রমণীকে বিয়ের পর এবং এ দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেলা করে চার্ণক আধা-বাঙালী হিসেবে পরম পরিতোষের আনন্দে শেষ কটা দিন কাটিয়ে গেছেন। ফলে, কয়েকটি মাটির কুঁড়ে ঘর ছাড়া সেদিনের কোলকাতার উৎপত্তি কেন্দ্রে আর কিছুই তৈরী হয় নি; বা বাণিজ্যকুঠি সম্প্রসারণের কোনোই চেষ্টাও অন্য কেউ করেনি। আসলে, তৈরী করার ইচ্ছে সেদিনের সুতানুটির ইংরেজ কুঠিয়ালদেরও বিশেষ ছিলো না। তাঁরা [জোব

চার্ণক সহ] দেশীয় বিবি, ব্যবসা-সূত্রে অর্জিত অঢেল অর্থ নিয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার থেকে ভেসে আসা উদ্যোগী পুরুষসিংহ ইংরেজরা সত্যিই ঐ আলস্যের পাঁকে স্থায়ী ভাবে আটকা পড়ে থাকে নি। তাদের চরিত্রে তার সম্ভাবনার বাষ্পটুকুও ছিলো অনুপস্থিত। তাই আমরা অচিরেই দেখতে পেলাম যে সুতানুটিতে ইংরেজদের সংস্থাপিত হওয়ার ক্রমাগ্রগতিমূলক ইতিহাসই হয়ে দাঁড়ালো ইংরেজ এবং বাঙালীর পরস্পরের প্রতি [দীর্ঘকাল পর্যন্ত] উভয়মুখী আকর্ষণের ইতিহাস।

এই ইতিহাসের তাৎক্ষণিক উদাহরণ হচ্ছে '১৬৯৮ সালে জুলাই মাসে মাত্র ১৯,০০০ টাকার বিনিময়ে ইংরেজদের কলকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটির জমিদারীর উপস্বত্ব লাভের লাভের অধিকার'[৭] পাওয়া। এবং যার নীট ফল হলো ব্যবসায়ী ইংরেজ কর্তৃক জমিদারীর শাসনদণ্ড গ্রহণ। অর্থাৎ কাল ও ঘটনাচক্রে এই দেশকে উপভোগ করবার সুযোগও ইংরেজের ভাগ্যে জুটে গেলো। এবং চারিদিকের অবস্থা দৃষ্টে এই জমিদারীর সূচনা যে অনতিকাল মধ্যেই রাজা-গিরিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে সে কথা বুঝে নিয়ে সেদিনের কৌশলী ইংরেজ "যথোচিত পদ মর্যাদা ও ক্ষমতা সহ কোম্পানির কর্তারা নতুন একটি অফিস সৃষ্টি করলেন, 'Jimmider' [জমিদার]-এর পদ [১৭০০ খ্রীঃ]। এই জমিদারই হলেন কলকাতার 'কলেকটর'।[৮]

অতএব এখন সুতানুটির সঙ্গে কোলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম যুক্ত হয়ে ইংরেজের বাণিজ্যিক অধিকার বিস্তারের যে মূলকেন্দ্র তৈরী হলো এবং যা পরবর্তী কালে কেবলমাত্র কোলকাতা নামে সুপরিচিত হয়েছে, তা ধীরে ধীরে সমগ্র দেশের মধ্যে তার পরিচয়ক্ষেত্রটিকে সুবিস্তৃত করে দিয়েছে। অপর পক্ষে, দেশীয় বাঙালীরাও নানা কারণে ও প্রয়োজনে কোলকাতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এখানে প্রায় ছুটে আসতে লাগলো এবং ইংরেজ বা ইংরেজ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক পরিচয়ের ক্ষেত্রে সংবদ্ধ হতে লাগলো। অর্থাৎ কোলকাতা-ই হয়ে উঠলো ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়ের পীঠভূমি। কারণ, আমরা জোব চার্ণকের সুতানুটি আগমনের মাত্র ষোল বছরের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি: 'Revenues especially the Rent to the Towns increase yearly, *people flocking there* to make the Neighbouring Jeminders envy them'.[৯]

ইংরেজের কোলকাতার প্রতি, প্রাথমিক স্তরে, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বশ্রেণীর

ও জাতের বাঙালীর এই অদম্য আকর্ষণের কারণ কি তার আলোচনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমাদের নয়, সমাজতত্ত্ববিদের। এখানে আমরা লক্ষ্য করবো যে, ইংরেজ যে কোলকাতাকে কেন্দ্র করে অর্থনীতির দিক থেকে বাঙলা দেশকে শোষণ করলো, যে কোলকাতাকে আশ্রয় করে বাঙালীকে শাসন করলো, সেই কোলকাতার মাটিতেই ইংরেজের মাধ্যমে আনীত ইংরেজী তথা য়ুরোপীয় ভাষা এবং সংস্কৃতির অভিনব আবহাওয়া কেমন ভাবে বাঙালী মনীষার পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছে, কেবল তাকেই।

এই সূত্রে এমন কথা সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা বোধহয় অনৈতিহাসিক হবে না যে ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষ লগ্ন থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তিমে জোব চার্ণক-এর দ্বারা সুতানুটিতে স্থায়ীভাবে কুঠি স্থাপন কালে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে এদেশীয়রা নিশ্চয়ই কিছু ইংরেজী শব্দও অন্তত আয়ত্ত করেছিলো, আর ইংরেজরা বিকৃত উচ্চারণের বাঙলা। অধিকন্তু ইংরেজ ও বাঙালীর প্রয়োজনভিত্তিক নৈকট্যের প্রথমাবস্থায় উভয়ের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে আন্তরিক কোনো দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলো কি না, তার কোনো ইতিহাস-সিদ্ধ প্রমাণ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

তবুও ইংরেজ সম্পর্কে বাঙালীর মনোভাব গোড়ায় কোনো দিনই সংঘর্ষাত্মক ছিলো বলে মনে হয় না। কারণ, ক। ইংরেজের যতদূর সম্ভব ব্যবসাদারী-সাধুতা ও নিষ্ঠা ছিলো। অর্থাৎ সেদিন এদেশীয়ের কাছে ব্যবসায়ী ইংরেজদের একটা good-will ছিলো। খ। বিনিময়ের বদলে অর্থের মাধ্যমে ব্যবসায় তাদের আগ্রহকে দেশীয়রা অত্যন্ত লোভনীয় বলে মনে করতো। গ। তাঁরা ছিলেন দুষ্টনিবারক ও যতদূর সম্ভব সদ্বিবেচক। ঘ। ধর্ম বিষয়ে স্পর্শ-কাতর এ-দেশীয়ের ধর্মে কোনো ভাবে আঘাত লাগে এমন কাজ ইংরেজরা কদাচ করতেন না। ফলে, একদিকে যেমন, শ্রীরামপুর বা মালদহে ধর্মীয় আস্তানা গড়লেও, বিলাতী খ্রীস্টান মিশনারীদের কোলকাতার চৌহদ্দিতে অনেকদিন পর্যন্ত ঠাঁই নিতে দেওয়া হয় নি; অন্যদিকে তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে চার্লস গ্রাণ্টের নেতৃত্বে বিলাতে আন্দোলন করতে হয়, যার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিলো এ দেশে খ্রীস্টান পাদ্রীদের অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া।[১০] এই কারণেই বোধ হয় ইংরেজকে বারে বারেই বলা হয়েছে 'ধর্মাবতার, ধর্মপ্রবর্তক'।

ইংরেজ-সম্পর্কে এই বাস্তব-অভিজ্ঞতা এবং তাদের সাহস ও জীবনাচরণের

অভিনবত্ব তাদের সম্পর্কে বাঙালীকে কৌতূহলী করে তুলেছিলো। এ ছাড়াও ইংরেজদের সঙ্গে ঠিকাদারী ও ইজারাদারী ইত্যাদির ব্যবসা, অথবা দেওয়ানী কিংবা বেনিয়ান, মুনশী, খাজাঞ্চী বা সরকারগিরি করতে গিয়ে অনেকেই কিছু 'ইয়েস-নো-ভেরি-ওয়েল' গোছের ইংরেজী শিখে নিয়েছিলো।[১১] কিন্তু প্রয়োজন বড় বালাই। ইংরেজ ক্রমেই নানাভাবে এই দেশের জীবন-জীবিকা ইত্যাদির সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেললো। বাঙালীরাও ইংরেজদের দিনের শেষের নাচ-গান, সপ্তাহান্তিক উপাসনা, স্বাজাত্যবোধ ও শৃঙ্খলাজ্ঞান সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও শ্রদ্ধা অনুভব করতে থাকে—উভয়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দু-জনের মধ্যেই একটি মিলন-সম্পর্ক পাতাবার আকাঙ্ক্ষায় উৎসাহ বোধ করতে থাকলো। এই ক্ষেত্রে এ-ঘটনাও সত্য যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যেখানে তাদের প্রতিপত্তিকে ধীরে ধীরে সুদৃঢ় করছিলো সেখানকার মানুষজনের মধ্যে প্রথমাবস্থায় প্রয়োজনানুগ ইংরেজী ভাষাজ্ঞানটুকু রীতিবদ্ধ প্রণালীতে শেখাবার ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকুও করতে চায় নি। এরও কারণ ঐ,—বিদেশী ভাষা শেখাবার ছলে ইংরেজরা আমাদের ধর্ম ও স্বতন্ত্রতাকে ধ্বংস করছে মনে করে এদেশীয়রা যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে; ফলে, যদি তাদের নিরঙ্কুশ ব্যবসা কার্যে কোনভাবে বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

কালের চাকা কখনও থেমে থাকে না। এ-দেশের, বিশেষ করে রত্নপ্রসূ বাঙলা দেশের সঙ্গে ব্যবসায়ের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মারফতে ইংলণ্ডীয় শিল্প-বিপ্লব বিলাত দেশটাকে সোনার করে তুলতে লাগলো। তাই স্বাভাবিক প্রয়োজনেই এদেশের সঙ্গে কাজ-কারবার, বাণিজ্যকে চিরস্থায়ী অর্থাগমের উৎস হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কোলকাতায় ফৌজ-দুর্গ, হৌস-মিউনিসিপ্যালিটি, কালেকটার ইত্যাদি জীবন ধারণ বা সম্প্রসারণের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় বা আধাপ্রয়োজনীয় উপকরণগুলিকে ইংরেজ বেশ দ্রুত গতিতেই বাড়িয়ে যেতে থাকে। ইংরেজ ক্রমে ক্রমে হৌস-কুঠি-জমিদারী-গড়-টাঁকশালের অতিরিক্ত নাচশালা ও রঙ্গশালা নির্মাণের দিকে মনোযোগী হতে বাধ্য হয়। যে-দেশে শেক্সপীয়রের মতো মহাকবি জন্মায়, সে-দেশের লোক বোধহয় দুর্গমতম অঞ্চলে বাসকালেও আহার এবং বাসস্থান জোগাড়ের পরেই একটি রঙ্গশালা নির্মাণের চেষ্টা দেখে। এ-দেশের ক্ষেত্রেও ইংরেজ তার স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটায় নি। তাই জোব চার্ণকের মৃত্যুর পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যেই কোলকাতায় নির্মিত বিলাতি রঙ্গশালার সন্ধান পাচ্ছি। এবং তাতে

শেক্সপীয়রকেও সগৌরবে অভিনীত হতে দেখছি। এ বিষয়টি পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

এরই মধ্যে ১৭৫৭-র যুদ্ধের প্রহসন কোলকাতাকে অতিক্রম করে সমগ্র বাঙালী জাতিকে এক নতুন ইতিহাসের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলো। ইংরেজ, ইংরেজীভাষা ও সংস্কৃতিকে কৌতূহলের সঙ্গে দূর থেকে দাঁড়িয়ে অবলোকন করার অবস্থা বাঙালীর পক্ষে আর রইলো না। এই পরিস্থিতির কিঞ্চিদধিক প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই এ-দেশীয় কয়েকজন মনীষী যেমন বুঝতে পারলেন যে ইংরেজী তথা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, তেমনি ইংরেজও বুঝলো যে, যে শাসন-ভার ঘটনাক্রমে তাঁহাদের হাতে এসে পড়েছে তাকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করতে হলে এ-দেশবাসীকে অবশ্যই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে [মেকলে সাহেবের ধারণা ও উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়]। এতোদিন ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়ের বিচিত্ররূপী যে রেখাচিত্রগুলি ইতস্তত এবং অসম্পূর্ণ রূপে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলো, এবার তা একটা পূর্ণাবয়ব চিত্ররূপ ধারণ করলো। অতএব, ইংরেজ এ-দেশে বাণিজ্য করতে এসে এবং পরবর্তীকালে দেশ শাসন করতে গিয়ে ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতির যে বীজ এখানকার মাটিতে উপ্ত করেছিলো তা বাঙালীর মনীষার রসধারায় অভিসিঞ্চিত হয়ে বিশাল এক মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। যার ফল, নব-জাগ্রত বঙ্গ ও বাঙালী।

খ.

: বিদেশী রঙ্গমঞ্চ : শেক্সপীয়র ও বাঙালী

'Man cannot live by bread alone' : এই প্রবাদ বাক্য অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে ইংরেজরাও তাদের জীবনোচ্ছল ও রসপিপাসু মন নিয়ে খুব বেশীদিন কোলকাতার মাটিতে কেবল দুর্গ নির্মাণ, গোলাগুলি বন্দুক, টাকা-আনা-পাউণ্ড শিলিং, ওজন-বাটকারার একঘেঁয়ে নীরস দৈনন্দিনতায় আটকে থাকতে পারে নি। তারা কাজ, ব্যবসা ও যুদ্ধের বাইরেও নিশ্চয়ই বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান করেছে।

আমরা দেখেছি যে ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে জোব চার্ণক সুতানুটিকে ইংরেজের ভবিষ্যৎ বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এর আড়াই বছরের

মধ্যেই ঐ সুতানুটিতে তাঁর জীবনান্ত হয়েছে [১০।১।১৬৯৩ খ্রীঃ]। এর বছর ছয়েকের মধ্যেই [জুলাই ১৬৯৮ খ্রীঃ] সুতানুটির দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী আরও দুটি গ্রাম কোলকাতা ও গোবিন্দপুর সহ এক বৃহৎ অঞ্চলে ইংরেজ ব্যবসাদারেরা জমিদারী উপস্বত্ব ভোগের অধিকার ক্রয় করেছে ১৬,০০০ টাকার বিনিময়ে। অতএব জোব চার্ণকের সময় থেকে মাত্র আট বছরের মধ্যেই সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে কোলকাতা [এখন থেকে আমরা ঐ তিনটি গ্রামের সমষ্টিকে 'কোলকাতা' বলেই অভিহিত করবো]-ই হচ্ছে বা হবে বাঙলাদেশে ইংরেজের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের প্রধানতম 'হেড কোয়াটার্স'। এই বিবেচনাকে সামনে রেখে ইংরেজ কোম্পানীর স্থানীয় এজেণ্টরা অগ্রসর হওয়ার ফলে জোব চার্ণকের কোলকাতা আগমনের মাত্র ষোল বছরের মধ্যেই [১৭০৬ খ্রীঃ] এখানকার কৌনসিল বেশ গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে তাঁর বিলাতীয় ডিরেক্টরদের লিখে পাঠালেন: 'Revenues specially the Rent to the Towns increase yearly, *people flocking there* to make the Neighbouring Jemindars envy them'[১২] অর্থাৎ কোলকাতায় লোক জমতে আরম্ভ করছে। ইংরেজরাও নিশ্চয়ই একটা মোটামুটি রকমের সুশৃঙ্খল, সংগঠনাত্মক ও অর্থোপার্জনের অনুকূল পরিবেশ এই অল্প সময়ের মধ্যেই এখানে গড়ে তুলতে পেরেছে। তা না হলে কোলকাতায় 'people flock' করতো না। আর অন্যদিকে দেশীয় জনসাধারণের এই ইংরেজ-অভিমুখী গতি দেখে স্থানীয় কর্মকর্তাদের মনে নিশ্চয়ই একটা আত্মপ্রসাদ জেগে উঠছিলো। যদিও দেশের চারদিকে তখন চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা, তথাপি কোলকাতাকে স্থায়ী ব্যাবসায়িক কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলতে ইংরেজ কোনো কার্পণ্য করেনি, সেই গোড়া থেকেই। ফলে, গঙ্গার পশ্চিম তীর ও চারিদিকের গ্রামাঞ্চল থেকে এদেশীয় বণিক ব্যবসায়ী ও অন্যান্য বৃত্তিজীবীরা অনেকে ইংরেজের অধীনে নিরাপদে বসবাস ও রাজকর্ম করার জন্যে পূর্বতীরের নতুন কলকাতা শহরে চলে আসেন। 'Stories about the security and protection of life and property afforded by the English factory at Calcutta were on all men's lips. The fair dealings of the English traders with Hindu merchants, and the latter's faithfulness to the Company became the talk of the day.'[১৩] এই অবস্থাতেই মানুষ উদরপূর্তির অতিরিক্ত মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তিরও চেষ্টা করে। ইংরেজও সেই কাজে বিলম্ব

করেনি। বিশেষত তারা তাদের পিতৃভূমি থেকে প্রায় চার হাজার মাইল দূরবর্তী এই ভিন্‌দেশে খুবই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, সমুচ্ছল অবকাশ যাপনকালে, বিনোদন-মাধ্যমের অভাব যে বোধ করবেন, তাতে আর কথা কি? তাই কোলকাতার বয়স পঞ্চাশ বছর না পার হতেই এখানে 'প্রথম ইংরেজী থিয়েটার ও তার সংলগ্ন একটি নাচঘর'[১৪]-এর জন্ম হলো। অবশ্য এর আগের ইতিহাসের পাতায় ঐ ইংরেজী থিয়েটার এর পূর্ববর্তী কোনো মঞ্চ বা অভিনয়ের কোনো সংবাদ না পাওয়া গেলেও ঘরোয়া ভাবে নাচ গানের অনুষ্ঠান বা নিজ দেশীয় কোনো নাট্যাদির অংশ বিশেষ অভিনীত যে হয় নি তাই বা কে বলবে?

যাই হোক, অনুমানকে অতিক্রম করে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে, ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই, 'লালবাজার স্ট্রীটের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, বর্তমান সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ গির্জার অপর পারে......আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে মার্টিন বার্ণের পাষাণ সৌধ'[১৫] সেইখানে 'ওল্ড প্লে হাউস' নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেই সময় দেশে একটিও সংবাদপত্র ছিলো না। ফলে, সেখান থেকে অথবা অন্য কোন সূত্র থেকে ঐ নাট্যশালা, বা তার অভিনয় ইত্যাদি সম্পর্কে কোন তথ্যই প্রায় সংগ্রহ করা যায় না। কেবল লেঃ উইলিসের আঁকা [১৭৫৩ খ্রীঃ] 'দি প্ল্যান অব দি ফোর্ট উইলিয়ম এণ্ড দি পার্ট অব্ দি সিটি অব্ ক্যালকাটা' নামক একটি মানচিত্র থেকে ঐ 'ওল্ড প্লে হাউসে'র নিশ্চিত অবস্থানটি জানা যায়। অবশ্য আধুনিক কালে ঐ নাট্যশালা সম্পর্কে দু-চারটি নিশ্চিত তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে: ক. এখানে স্ত্রী-পুরুষ সকল ভূমিকায় অভিনেতাই ছিলেন পুরুষ ও অবৈতনিক। খ. বিলাতের প্রখ্যাত নট এবং শেক্সপীয়র বিশেষজ্ঞ ডেভিড গ্যারিক এই নাট্যশালার অভিনেতাদের নানা ধরণের উপদেশ দিতেন। গ. ডেভিড গ্যারিকের সঙ্গে যেহেতু এই নাট্যমঞ্চের স্বত্বাধিকারী ও অভিনেতাদের যোগাযোগ ছিলো, সেহেতু একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এখানে শেক্সপীয়রের কিছু কিছু নাটক হয়তো অভিনীত হয়েছিলো। [We can at best conjecture that the Britons of David Garrick's age did not forget their Shakespeare in far Calcutta.'][১৬]

১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দের কিছু পূর্বে স্থাপিত ঐ নাট্যমঞ্চে যদি কিছু শেক্সপীয়রীয় নাটকের অভিনয় হয়েও থাকে, তবে তার সংখ্যা আদৌ বেশী নয় এবং সেইখান

থেকেই বাঙালী সমাজের খুব ছোট এক ভগ্নাংশের সামনে শেক্সপীয়রের নাট্য-সাহিত্যের বিস্ময়বিমুগ্ধ অভিযাত্রা সুরু হয়েছে বলে আমরা ধরতে পারি। কিন্তু রাজনৈতিক টালমাটালের মুখে পড়ে অল্পকালের মধ্যেই 'ওল্ড প্লে হাউস'-এর মৃত্যু হলো। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে এর ১৬ই জুন বাঙলার নবাব সিরাজদ্দৌলা কোলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের ঔদ্ধত্যের জবাব দিলেন। তাঁর সৈন্য-বাহিনীর বিজয়দৃপ্ত পদভারে ও মুহুর্মুহু গোলা বর্ষণে ইংরেজ নির্মিত বাঙলা-দেশের প্রথম বিদেশী রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলো চিরতরে নিভে গেলো। শেষে ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অন্ধকার নাট্যকক্ষটি সম্পর্কে বিলাত থেকে কোম্পানীর কর্মকর্তাদের কাছে নির্দেশ এলো : " 'We are told that the building formerly made use of as a Theatre may with a little expense be converted into a Church of Public place or worship. ......' কেন জানিনে কোম্পানীর ডাইরেকটারদের নির্দেশ প্রতিপালিত হয় নি। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলে নিলামঘর।"[১৭] এর আগেই পলাশীর যুদ্ধ শেষ হয়েছে। মীরজাফর মীরকাশিম প্রমুখের নবাবীর নেপথ্যে ইংরেজ প্রায় গোটা বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রের ওপর খবরদারীর অধিকার অর্জন করেছে। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের কালান্তক ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এদেশে কোম্পানীর শোষণের নগ্নতা ও শাসনের শৈথিল্য বিলাতের অধিকর্তাদের টনক নড়িয়ে দিয়েছে। এবং 'দ্বৈতশাসন প্রণালী'-র কুফল হৃদয়ঙ্গম করে, সরাসরিভাবে ইংরেজ কর্মচারীর হাতে দেশের শাসনাধিকার প্রদান কর্তব্য বিধায় ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস নামক একজন দক্ষ ব্যক্তিকে ঐ কাজে নিযুক্ত করে পাঠানো হয়। 'বাঙলায় ইংরেজী আমলের ইতিহাসে দুইটি কারণে হেস্টিংসের শাসনকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ এই সময়েই ইংরেজ কোম্পানি নিজের হাতে দেশের শাসন ভার গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ বাঙলার বাহিরে যে সমুদয় স্বাধীন রাজ্য ছিল তাহাদের সহিত মিত্রতা ও সংঘর্ষের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের অন্যতম প্রধান রাজশক্তিতে পরিণত হয়।'[১৮] এরই ফলে, ১. কোলকাতা হয়ে ওঠে একাধারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য পরিচালনার কেন্দ্রীয় ঘাঁটি। ২. সর্ব শরীরের মধ্যে মাথাকে রক্ষা ও পরিপাটি বা ঠাণ্ডা রাখার মতো কোলকাতারও সর্বাঙ্গীণ ও ব্যাপক উন্নতি, প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এবং ৩. হেস্টিংস বিলেতের ডিরেক্টরদের লিখলেন : 'Another good consequence will be the great

increase of inhabitants and of wealth in Calcutta, which will not only add to the consumption of our most valuable manufactures imported from home, but will be the means of conveying to the natives a more intimate knowledge of our customs and manners and of conciliation of them to our policy and government.'[১৯]

হেস্টিংসের এই দূরদৃষ্টি, বাস্তব জ্ঞান এবং কর্মদক্ষতার সুফল কোলকাতার জীবনে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলকর হয়েছিলো। যার হাতে-নাতে প্রমাণ মিললো হেস্টিংস আসার তিন বছরের মধ্যে [১৭৭৫ খ্রীঃ] বর্তমান কোলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসের পেছনে নির্মিত দ্বিতীয় রঙ্গালয় 'ক্যালকাটা থিয়েটার' বা 'দি নিউ প্লে হাউস' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। শেয়ার বিক্রির টাকায় নির্মিত এই বৃহদাকার নাট্যশালার অন্যতম শেয়ার হোল্ডার ছিলেন হেস্টিংস স্বয়ং।

আগের মতো এখানেও গ্যারিক তাঁর প্রিয় শিষ্য শিল্পী বানার্ড মেসিঙ্ককে প্রয়োজনীয় উপদেশ, তাঁর নির্দেশে আঁকা অনেকগুলি দৃশ্যপটসহ কোলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে এই নাট্যশালার প্রায় জন্মকাল থেকেই শেক্সপীয়রের নাটক অভিনীত হয়েছিলো। অবশ্য এই নাট্যশালা চালু হওয়ার পাঁচ বছর পরে কোলকাতায় প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'হিকিজ্ বেঙ্গল গেজেট অব্ ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার' প্রকাশিত হয় [১৭৮০ খ্রীস্টাব্দ]। এর সম্পাদক ছিলেন জেমস্ অগাস্টাস্ হিকি নামক জনৈক ইংরেজ। এই সংবাদপত্র তার জন্মলগ্ন থেকেই 'নিউ প্লে হাউসে'র বিভিন্ন রজনীর অভিনয়ের বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে এবং অভিনীত নাটকগুলির সমালোচনার দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন ও বিভিন্ন রজনীতে অভিনয়ের সম্পর্কে মতামত অনুসরণ করে দেখা যাচ্ছে যে, কোলকাতার ঐ একমাত্র নাট্যশালার পাদপ্রদীপের সামনে শেক্সপীয়রের নাটক—যেমন: 'রিচার্ড দি থার্ড', 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস্', 'হ্যামলেট', 'ওথেলো', 'ম্যাকবেথ', 'রোমিও জুলিয়েট', 'কিং লীয়র', 'হেনরী দি ফোর্থ' প্রভৃতি বারে বারে বিশেষ দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। মনে রাখতে হবে এইসব অভিনেতারা সকলেই প্রায় কোম্পানীর কর্মচারী অর্থাৎ 'এ্যামেচার' অভিনেতা। এবং মেয়েদের ভূমিকায় পুরুষেরাই অভিনয় করতো। ইংরেজ জাতির তাদের জাতীয় কবি-নাট্যকার সম্বন্ধে আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিলো

বলেই অন্যতর পেশায় নিযুক্ত থেকেও শেক্সপীয়রের নাটকগুলিকে অমন সার্থক ভাবে অভিনয় করতে পারতেন, চরিত্রগুলিও যথার্থভাবে প্রকটিত হতো, যাতে করে তারা রস ও ভাবসমৃদ্ধ হয়ে উঠতো'……… accurate and spirited', 'Elegant and interesting'.

যাই হোক, 'নিউ প্লে-হাউস'-নাট্যমঞ্চের আয়ুষ্কাল ছিলো যথেষ্ট দীর্ঘ অর্থাৎ তেত্রিশ বছর। ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দের ১ নভেম্বর-এর 'ক্যালকাটা গেজেটে' রঙ্গালয়টি বিক্রির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এই সময়ে আত্মরক্ষার সংগ্রামে রত থেকে ঐ নাট্যশালাকে অধিকাংশ রজনীতে হাল্‌কা বা প্রহসনাত্মক নাটক অভিনয়ের আয়োজন করতে হতো, তথাপি তাঁরা কখনই শেক্সপীয়রকে ভুলতে বা অবহেলা করতে পারেন নি। যখনই সুযোগ পেয়েছেন বা সুদক্ষ অভিনয় সংগ্রহ করতে পেরেছেন তখনই 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ', প্রভৃতি 'সিরিয়াস' নাটকের অভিনয় করে দর্শক ও সমালোচকদের অভিনন্দন কুড়িয়েছেন। এইসব ছাড়াও তখনকার দিনের কোলকাতার শেক্সপীয়র প্রীতির আরও উদাহরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে : ঐ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে চৌরঙ্গী এলাকার আশেপাশেই অধিকাংশ নাট্যশালাগুলি অবস্থিত ছিলো। এমন কি ঐ এলাকার একটা বাজারের নামকরণও করা হয়েছিলো 'শেক্সপীয়র বাজার'—এই নামে। এছাড়াও ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে মিঃ মরিস নামক জনৈক শিল্পী 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এর দেওয়ালগুলি যখন গ্যারিকের অনুকৃত দৃশ্যপটের দ্বারা সাজাচ্ছিলেন তখন তার মধ্যে একটা দৃশ্যপটে দেখানো হলো যে গ্যারিক স্বয়ং যেন শেক্সপীয়রের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।[২১]

এর মধ্যে মাত্র বছর খানেকের আয়ুষ্কাল নিয়ে [১৭৮৯-এর ১লা মে থেকে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী পর্যন্ত] কোলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে মিসেস্ এমা ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার আত্মপ্রকাশ করেছিলো। এই ভদ্রমহিলা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী, অনন্য সাধারণ নৃত্যপটীয়সী ও সেদিনের কোলকাতার নামজাদা এক ব্যবসাদার মি. ব্রিস্টোর সহধর্মিণী। ইনি নিজের বাড়ীতেই এই রঙ্গমঞ্চটি স্থাপন করেছিলেন এবং নিজে ও অন্যান্য মহিলাদের দ্বারা এখানে নানা রসের নাটক অভিনয় করাতেন—অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে এখানে মহিলারাই পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। এবং এই সব অভিনয়ের প্রযোজনায় এবং অপরাপর অনুষ্ঠানে ঐ মহিলাটির নিষ্ঠার কোনো অভাব ছিলো না। তথাপি

এই গৃহবধূর পক্ষে খুব বেশীদিন এখানে নাটক করা সম্ভব হয় নি। তবে এখানে যে দু-চারটি নাটক মঞ্চস্থ করা গিয়েছিলো তার মধ্যেই অন্তত একবার শেক্সপীয়ারের 'জুলিয়াস সিজার'-কে অভিনীত হতে দেখছি। এবং সেখানে মিসেস্ ব্রিস্টো লুসিয়াসের ভূমিকায় অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছিলেন ['Mrs. Bristow's triumph was in the male part of Lucius in Shakespeare's Julius Cæsar'][২২]

এরপর ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী যতদূর মনে হয় বর্তমান রাজভবনের কাছাকাছি কোনো জায়গায় হেস্টিংসের কাউন্সিলের নামজাদা সদস্য হোয়েলারের নামে যে রাস্তা, সেই রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন এক থিয়েটার। তার নাম ছিলো 'হোয়েলার প্লেস থিয়েটার।' খুব আড়ম্বরের সঙ্গে এর উদ্বোধন হলেও অল্পদিনের মধ্যেই এই রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলো নিভে যায়। মনে রাখতে হবে যে তখনও কোলকাতায় 'নিউ প্লে হাউস' চলছে। আসলে দুটো রঙ্গমঞ্চকে একসঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে দর্শক জুটিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সেদিনের কোলকাতার ছিলো না বলেই মনে হয় 'হোয়েলার প্লেস' থিয়েটারের অকালমৃত্যু ঘটেছিলো।

যাই হোক, পূর্ব কথিত 'ক্যালকাটা থিয়েটার' বা 'নিউ প্লে হাউস' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শেক্সপীয়রের দেশের হাঁপিয়ে-পড়া মানুষদের কাছে শুভ সংবাদ নিয়ে ১৮১২ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে মার্চ 'এথেনিয়াম থিয়েটার' হাজির হলো। সারকুলার রোডে প্রতিষ্ঠিত এই রঙ্গমঞ্চের মালিক হলেন মি. মরিস্। বারে বারে ব্যর্থ হলেও 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথে'র মতো বিয়োগান্ত নাটক অভিনয়ের দিকে এই রঙ্গমঞ্চের কর্তাদের ঝোঁক ছিলো বেশী। একেও বছর দুয়েকের মধ্যে [১৯শে নভেম্বর ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দ] মৃত্যুর অন্ধকার-কোলে আশ্রয় নিতে হলো।

'এথেনিয়াম থিয়েটার' চলার কালেই ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর বর্তমান শেক্সপীয়র সরণী [পূর্ববর্তী থিয়েটার রোড]-র পশ্চিম সংযোগস্থলে একটা কাঠের তৈরী বাড়ীতে 'চৌরঙ্গী থিয়েটারের' পত্তন হয়। হিন্দু কলেজের নাম করা অধ্যাপক ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন্, ব্রিটিশ সম্রাট চতুর্থ উইলিয়ামের পুত্র ক্যাপ্টেন জর্জ ফিজক্লেয়ারেন্স, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, 'ইংলিশম্যান' কাগজের সম্পাদক জে. এইচ. স্টোকলার, 'a poet, musician, an actor, and an ardent advocate of public liberty-র প্রবক্তা ও

'rare talents'-এর অধিকারী এইচ. এম. পার্কার প্রমুখ ছিলেন এই রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক সমিতির সদস্য। ফলে, কোলকাতার বিদেশী রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে ও স্থানীয় নাট্যরস-পিপাসুর রসচিত্তে স্থায়ী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির কাজে এই নাট্যশালাটি সেদিন এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলো। কিন্তু এত আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষণা সত্ত্বেও ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ থেকেই এই নাট্যশালাটির মৃত্যু-ঘণ্টা বাজতে থাকে। শেষে তিন-চার হাত বদল হওয়ার পর ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মে ছাব্বিশ বছরের পুরাতন নাট্যাগারটি আগুনে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যায়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর আগেই [১৫.৮.১৮৩৫] ঋণগ্রস্থ থিয়েটারটাকে নিলামে কিনেছিলেন ৩০, ১০০ টাকায়, এখন পোড়া জমিটি কিনলেন ১৫,০০০ টাকায়।

এই 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' চলাকালের মধ্যেই ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে মে ১৭৭, বৈঠকখানায় 'বৈঠকখানা থিয়েটার' নামে আরও একটি রঙ্গশালার উদ্বোধন হয়েছিলো। মিসেস্ ফ্র্যান্সিস, মিসেস্ কোহেন প্রমুখ বেশ কয়েকজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর আপ্রাণ ও সার্থক অভিনয় সত্ত্বেও এই থিয়েটার মঞ্চের আয়ু দীর্ঘতর হতে পারে নি। 'চৌরঙ্গী থিয়েটারে'র সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে ক-বছরের মধ্যেই এর পাদপ্রদীপের আলো নিভে গেলো। "ইহার অল্পকাল পরেই 'চৌরঙ্গী থিয়েটার'-এর খ্যাতনামা অভিনেত্রী মিসেস্ লীচ এবং অন্যান্য কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক[২৩] ও প্রসিদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীর উদ্যোগে ১৮৩৯ সনের ২১ আগষ্ট 'সাঁ সুসি' [Sans Souci] নামে লালদীঘির[২৪] কাছে নূতন এক রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রথম এটিও খুব জনপ্রিয় ছিল। পার্ক স্ট্রীটে এখন যেখানে St. Xavier's College, সেখানে ইহার নিজস্ব বাড়ী নির্মিত হইল। কেহ কেহ এই সুপরিসর ও সুরম্য গৃহকে 'উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়,' এবং 'রঙ্গালয়ের ইতিহাসে নব অভ্যুদয়' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ১৮৪১ সনের ৮ই মার্চ এই নূতন 'রঙ্গালয় গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে যে নাটক অভিনীত হয় তাহাতে বড়লাট সদলবলে উপস্থিত ছিলেন'। ......এই নূতন রঙ্গালয়েও বহু নূতন অভিনেতা ও অভিনেত্রী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন এবং Macbeth-প্রভৃতি নাটক খুব নৈপুণ্যের সহিত অভিনীত হয়। ১৮৪৩ সনের ২রা নভেম্বর খুব জাঁকজমকের সহিত Merchant of Venice নাটকের অভিনয় হয়। শাইলক ও পোর্শিয়ার অভিনয়ে দর্শকেরা বিমুগ্ধ হইয়াছিল। অবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতার মধ্যে যবনিকা-পতন হইলে একটি

প্রহসনের অভিনয়-মাত্র আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় মঞ্চের উপরের একটি বাতির শিখায় মিসেস লীচের পরিচ্ছদে আগুন লাগে এবং তিনি দারুণভাবে আহত হন। ১৮ই নভেম্বর মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে এই অপূর্ব প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর মৃত্যু হয়।

"মিসেস লীচের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'সাঁ সুসি'র সৌভাগ্যও যেন অস্তমিত হইল।······ক্রমশই আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু স্তিমিতপ্রায় এই রঙ্গালয়ের ১৮৪৮ সনের একটি ঘটনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"মহারাজা রাধাকান্ত দেব, মহারাজা বৈদ্যনাথ রায়, মহারাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি সেকালের কলিকাতার অভিজাত বাঙালী সম্প্রদায়ের কয়েকজনের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বিশিষ্ট অভিনয়ের আয়োজন হইল। ১০ই আগস্ট এই অনুষ্ঠানে ওথেলো নাটকের ভূমিকায় নায়িকা ডেসডিমোনা সাজিবেন মিসেস্ লীচের কন্যা, আর নায়ক ওথেলোর ভূমিকা গ্রহণ করিবেন একজন বাঙ্গালী······ কিন্তু রঙ্গালয়ের দরজা খুলিল না,······কিন্তু একসপ্তাহ পরে ওথেলো নাটক মঞ্চস্থ হইল [১৭ই আগষ্ট]। ওথেলোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। ইংরেজী ও বাংলা সম-সাময়িক পত্রিকার বিবরণে দেখা যায় যে, 'প্রেক্ষাগৃহে তিল-ধারণের স্থান ছিল না।' ওথেলো মঞ্চপ্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত দর্শকবৃন্দ করতালি ধ্বনি দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্ধনা করেন। বৈষ্ণবচরণও এই ভূমিকায় বিশেষ সাফল্য লাভ করেন।······কিন্তু প্রদীপ উচ্চশিখায় জ্বলিয়াই নিবিয়া গেল। ১৮৪৯ সনে ২১শে মে 'সাঁ সুসি'-র শেষ অভিনয় হইয়া চিরদিনের মত যবনিকা পতন হইল।"[২৫] এই শেষ অভিনয় রাত্রিতেও কিন্তু অভিনীত হয়েছিলো শেক্সপীয়রের 'দি মার্চেণ্ট অব ভেনিসে'র নির্বাচিত কিছু দৃশ্য।

'সাঁ সুসি'র পর গত শতাব্দীর শেষার্ধে কোলকাতায় 'সেণ্ট জেমস্ থিয়েটার', মিসেস লিউইস-এর থিয়েটার 'অপেরা হাউস' [বর্তমান গ্লোব সিনেমা], ফোর্ট উইলিয়মে 'থিয়েটার রয়্যাল' এবং 'গ্যারিসন' থিয়েটার ইত্যাদি অনেকগুলি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এই সব থিয়েটারে প্রতিভাবান অভিনেতা অভিনেত্রী, কিংবা উদ্যোগ আয়োজনের অভাব না থাকলেও কোনটিই দীর্ঘজীবী হয় নি। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোলকাতার উপকণ্ঠে দমদমে 'দমদম থিয়েটার' বা দূরবর্তী ব্যারাকপুর বা

বহরমপুরেও ইংরেজরা নিজেদের চিত্তবিনোদন এবং নাট্যরসপিপাসা নিবারণের জন্যে কয়েকটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

গ.

: প্রতিপাদ্য

ওপরে আমরা মোটামুটিভাবে প্রায় এক-শ বছরের [অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ] কোলকাতার ইতিহাসের অন্তর্গত ইংরেজ কর্তৃক, ইংরেজী নাটকের অভিনয়ের উদ্দেশ্যে, ইংরেজের নাট্যশালা নির্মাণ ও নাটক পরিবেষণার ধারাবাহিকতার সূত্রে ইংরেজ জাতির শেক্সপীয়র প্রীতির অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসটিকে দেখাবার চেষ্টা করলাম। এখন ওই আলোচনার শেষে পাঠক-মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ঐ ইংরেজীয় শেক্সপীয়র চর্চার ক্ষেত্রে বাঙালীর ভূমিকা কি? বঙ্গীয় সংস্কৃতির ভাল বা মন্দের ক্ষেত্রে ঐ সব নাট্যাভিনয়ের প্রভাব কি, বা কতদূর?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বক্তব্যকে এই ধারণার মধ্যে সংহত রাখতে হবে যে এক-শ বছরের ঐ সব নাট্যক্রিয়ায় অসংখ্য নাট্যকারের নানা ধরণের ও বিভিন্ন রসের নাটক অভিনীত হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে শেক্সপীয়রের নাটক এবং তাদের অভিনয়ের স্থান ছিলো সর্বোচ্চ, সে সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহই নেই। আমরা দেখেছি যে কোনো কোনো নাট্যশালা উঠে যাচ্ছে; প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতির মুখে তলিয়ে যাচ্ছে, তবুও শেক্সপীয়রের অমর নাটকগুলির অভিনয় করতে তাঁরা দ্বিধা করছেন না। আমরা জানি যে, সেই সময়ের কোলকাতার ইংরেজ অধিবাসীরা মূলত ছিলেন সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত অথবা সরাসরি সৈনিক। এ-ছাড়া নানা ধরণের ব্যবসায়ী ইংরেজের বাইরে সে সময়ের কোলকাতায় বে-সামরিক ইংরেজের বসবাস ছিলো অঙ্গুলিমেয়। কিন্তু তাঁদের শেক্সপীয়র প্রীতি ও ভক্তি এমন গভীর ও আত্যন্তিক ছিলো যে সৈনিক জীবনের রূঢ়তা ও এক ঘেঁয়েমির মধ্যেও হালকা তরল রসের আস্বাদনের আশে পাশে কোনো সময়েই শেক্সপীয়রকে তাঁরা ভোলেন নি। সেদিনের কোলকাতার দর্শক সমালোচকরাও নিজেদের ব্যক্তিগত পত্রাদিতে, বা যে সামান্য এক আধটা সংবাদ-সাময়িক পত্র ছিলো তার পাতায় স্বজাতীয়দের এই শেক্সপীয়র চর্চাকে আলোচনার বিষয়ীভূত করতে

কোন সময়েই কার্পণ্য করেন নি। ফলে স্বদেশীয়দের মধ্যে তো বটেই, দেশীয় যে সব শিক্ষিত বা ধনাঢ্য বাঙালী সেদিনের কোলকাতায় ইংরেজদের আশে পাশে ভীড় জমিয়েছিলেন তাঁদেরও ঐসব নাট্যপ্রচেষ্টার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিলো। অর্থাৎ আমাদের বক্তব্য এই যে, কোলকাতায় ইংরেজদের নাট্যপ্রচেষ্টা বা শেক্সপীয়র চর্চা একেবারেই প্রথম থেকে আগাগোড়া, 'অব দি ইংলিশ', 'বাই দি ইংলিশ', ও 'ফর দি ইংলিশ' ছিলো এমন কথা মনে করলে পারিপার্শ্বিকতা-বর্জিত ইতিহাসকেই আনুকূল্য প্রদর্শন করা হবে। কারণ, একথা মানতেই হবে যে ইংরেজ আধিপত্যের সূচনা থেকেই কোলকাতার দিকে যাঁরা 'flocking people', তাঁরা সূতানুটি-কোলকাতা-গোবিন্দপুর জুড়ে ইংরেজের সমস্ত রকম কাণ্ডকারখানাকে দূর থেকে শুধু ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে দেখেই যান নি, অচিরেই তার সঙ্গে সব রকমেই মিশে গেছেন। তা যদি না যেতেন তবে: ক. ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দের অগাষ্ট মাসে মহারাজা নবকৃষ্ণ আপন প্রাসাদে সেদিনের কোলকাতার উর্বশী মিসেস্ ব্রিস্টোর জন্মদিনে তাঁর সম্বর্দ্ধনা-অনুষ্ঠান করতে পারতেন না।[২৬] খ. ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে হেরাসিম লেবেডফ নামক রুশ ভদ্রলোক কোলকাতায় বাঙালী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করে বাঙালী নট-নটীদের দিয়ে দুখানি ইংরেজী নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়ে অভিনয় করাতেও সাহস পেতেন না এবং গোলকনাথ দাস নামক জনৈক পণ্ডিতও ঐ সাহেবকে সাহায্য করতেও এগিয়ে আসতেন না। গ. "ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ['অবশ্যই বাঙালী'—লেখক] যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মত 'শেয়ার' [share] গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। এইরূপে শ্রেণী-নির্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দবৃদ্ধি হইবে"।—'সমাচার চন্দ্রিকা': ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দ। কোলকাতাবাসী বাঙালীদের প্রতি এই যে উৎসাহ বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন তা নিশ্চয়ই এই শহরে ইংরেজ কর্তৃক ইংরেজী নাটকের অভিনয়ের ফল হিসেবেই গণ্য হতে পারে। ঘ. আরম্ভ থেকেই ইংরেজদের শেক্সপীয়র-চর্চা এদেশীয়রা গভীর তন্ময়তার সঙ্গে অনুধাবন করতে পেরেছিলো বলেই 'হিন্দু ওথেলো' বৈষ্ণবচরণ আঢ্য প্রথম দিনের প্রথম অভিনয়েই 'চতুর্দ্দিগ হইতে ধন্য ধন্য শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন।' দেশী-বিদেশী সমস্ত সংবাদ পত্র কর্তৃক বঙ্গ সন্তানের এই ইংরেজী নাটকে অভিনয় বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছিলো।

ফলে, সমগ্র ইতিহাসের পরিণতিটি হলো এই রকম: 'বাঙলাদেশের প্রথম

পর্যায়ের রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা ইংরেজ। দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিনেতা বাঙালী, কিন্তু ভাষা ইংরেজী। তৃতীয় পর্যায়ে অভিনেতা বাঙালী, ভাষা বাঙলা, কিন্তু অভিনয় হচ্ছে শেক্সপীয়ারের অনূদিত নাটকের'।[২৭] একটি ছকের সাহায্যে বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে এই রকম:

প্রযোজক	পরিচালক	অভিনেতা	ভাষা	নাটক
ক. ইংরেজ	ইংরেজ	ইংরেজ	ইংরেজী	শেক্সপীয়র ও অন্যান্য
খ. ইংরেজ ও দেশীয়	ঐ	ইংরেজ ও দেশীয়	ঐ	ঐ
গ. দেশীয়	দেশীয় ও ইংরেজ	দেশীয়	ঐ	ঐ
ঘ. দেশীয়	দেশীয়	ঐ	সরাসরি অনুবাদ ও ভাবানুবাদ	ঐ

দ্বিতীয় স্তরে আমরা মিশ্র প্রয়োজনার ক্ষেত্রে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখের এবং অভিনয় বিষয়ে বৈষ্ণবচন্দ্র আঢ্যের কথা মনে রেখেই এই মন্তব্য করেছি।

তৃতীয় স্তরে অভিনয়ের ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজের প্রচেষ্টাকে এবং সুর বা অভিনয়ের ঢঙে আবৃত্তিকেও যুক্ত করা প্রয়োজন মনে করেছি।

চতুর্থ স্তরে বাঙলা মৌলিক নাটকের ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রের প্রভাবের বিষয়টিও মনে রাখতে হবে।

এই অধ্যায়ে প্রথম তিনটি স্তরের আলোচনা হয়েছে। শেষ স্তরের আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে করার চেষ্টা হয়েছে।

এরপর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার [১৮১৭ খ্রীস্টাব্দ] ফলে ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগের মধ্যে দিয়ে শেক্সপীয়রের অমর নাটকাবলী বঙ্গ সন্তানগণের জীবনের দৈনন্দিনতায় এসে স্থান লাভ করলো। সে ইতিহাস আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

অতএব এই পরিচ্ছেদ থেকে আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করলাম যে সদ্য-সৃষ্ট সেদিনের কোলকাতায় ইংরেজ কর্তৃক শেক্সপীয়র চর্চা এবং থিয়েটার নামক নতুন প্রমোদমাধ্যম সম্পর্কে বাঙালীর কৌতূহলকে সেই প্রথম থেকেই বিশেষভাবে উদ্দীপিত করেছিলো; যার ফলে তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে একটি শক্তিশালী বেগ সঞ্চারিত এবং সুদূর প্রসারী অভিঘাত সৃষ্টি হয়।

১। মতিওর রহমান খান সঙ্কলিত : 'ঐতিহাসিক অভিধান' [ঢাকা : ১৯৬৭] : পৃ. ১৬৮।

২। Sri J. N. Sarkar ed. : *History of Bengal* : Vol. II. [Dacca 1948] p. 383. এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে উপরে উল্লিখিত ১নং পাদটীকা গ্রন্থের ১৭৭ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে : 'খ্রীস্টাব্দ ১৬৫১ হিজরী ১০৬১ ইংরাজ বণিকেরা ঢাকা ও কাসিম বাজারে বাণিজ্যের কুঠি স্থাপন করে।'

৩। দ্রষ্টব্য ২নং পাদটীকার গ্রন্থ।

৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার : 'বাংলা দেশের ইতিহাস' : দ্বিতীয় খণ্ড [১৩৭৩] : পৃ. ১৬৪-৫।

৫। বিনয় ঘোষ : 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' : পঞ্চম খণ্ড [১৯৬৮] : পৃ. ৬০। এর সঙ্গে তুলনীয় : 'At last in February 1690, peace was finally concluded between the Mughal Government and the English on the West Coast, and on 23rd. April the Emperor wrote to Ibrahim Khan to let the English trade

freely in Bengal as before. So, the Madras Council decided to send Job Charnock back to Bengal as Agent. He arrived at Sutanuti on 24th. August 1690. This was the foundation of Calcutta'. : J. N. Sarkar ed. : *History of Bengal*, Vol. II. [Dacca : 1948] p. 386.

৬। শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [১৯৫৭] : পৃ. ১০। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সাম্প্রতিক কোনো গবেষণায় এঁকে চার্ণকের 'মুসলমান উপপত্নী' বলা হচ্ছে। কিন্তু সে যাই হোক, এক [একাধিক ?] দেশীয় রমণী যে চার্ণকের সঙ্গে বসবাস করতেন তাতে কোন দ্বিমত নেই।

৭-৮। দ্রষ্টব্য বিনয় ঘোষ প্রণীত ৫নং পাদটীকা গ্রন্থ। পৃ. ৬২ ও ৬৩।

৯। Home department Miscellaneous Records, 31, December, 1706. [পূর্ববর্তী পাদটীকার গ্রন্থে উদ্ধৃত (পৃ. ৬৩)]।

১০। সুশীলকুমার গুপ্ত : 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর নবজাগরণ' [১৯৫৯] : পৃ. ১৬১।

১১। এই ধরণের ইংরেজী ভাষা-জ্ঞানের নমুনা রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর অনেকের লেখা থেকেই সংগ্রহ করা যায়। অধিকন্তু কৌতূহলী পাঠক ৬নং পাদটীকায় উল্লেখিত গ্রন্থের ১৪-১৫ পৃষ্ঠাগুলি পাঠ করে দেখতে পারেন।

১২। Home Department Miscellaneous Records 31st. December 1706. দ্রষ্টব্য ৭-৮নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৬৩।

১৩। দ্রষ্টব্য বিনয় ঘোষ : 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' : ৫ম খণ্ড [১৯৫৮] : পৃ. ৬৬।

১৪। অমল মিত্র : 'কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়' [১৩৬৬] পৃ. ৩।

১৫। ঐ।

১৬। Amalendu Bose ed : *Calcutta Essays on Shakespeare* [1960] : p. 196.

১৭। দ্রষ্টব্য ১৪নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৬।

১৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার : 'বাংলা দেশের ইতিহাস' [৩য় খণ্ড : ১৩৬১] : পৃ. ৫।

১৯। Firminger : Fifth Report, Introduction : cc. xxxi. দ্রষ্টব্য ৯নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৬৭।

২০। দ্র. ১৬নং পাদটীকার গ্রন্থ।

২১। ঐ। পৃ. ১৯৮।

২২। দ্র. ১৪নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ২৯।

২৩। রাধারমণ মিত্র তাঁর 'কলিকাতা দর্পণ' [১৯৮২. এপ্রিল] গ্রন্থে বলেছেন যে : "তারপর 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক স্টকেলার [Stocqueler]-এর সাহায্যে শ্রীমতী লিচ্‌ অনেক টাকা চাঁদা তুলে [লর্ড অকল্যাণ্ড ১ হাজার টাকা ও সাধারণে ১৬ হাজার টাকা দিয়েছিলেন] ৮০ হাজার টাকা খরচ করে ১০ নম্বর পার্ক স্ট্রিটে 'সাঁ সুসি' থিয়েটার তৈরি করেন। থিয়েটার-বাড়ি তৈরি শেষ হয় ১৮৪০.সালের মে মাসে ও তার উদ্বোধন হয় ৮-৩-১৮৪১ তারিখে" [পৃ. ৮৩]। এই তথ্য অসম্পূর্ণ। কারণ, ক. ঐ রঙ্গমঞ্চ তৈরীর সব টাকা এককেপে তো নয়ই, চাঁদা তুলেও সংগৃহীত হয় নি। চাঁদা তুলে মাত্র ১১ হাজার ৩০০ টাকা সংগৃহীত হয়েছিলো। বাকী টাকা পার্ক স্ট্রিটের জমি জমা সব কিছু বন্ধক রেখে সংগৃহীত হয় [দ্র. 'ইংলিশম্যান'-এর বিজ্ঞাপন ১৮৪০. ৯ই মে]। খ. শ্রীমিত্র 'সাঁ সুসি'র প্রাথমিক উদ্যোগ ও অবস্থানের কথা কিছুই বলেন নি। এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার জন্য ১৪নং পাদটীকার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ; পৃ. ১১০. ৪০।

২৪। দ্র. ১৪নং পাদটীকার গ্রন্থ। সেখানে লেখা আছে : 'শহরের অপর এক অংশে জমির চেষ্টাও চলতে লাগল। ইতিমধ্যে ডালহৌসী অঞ্চলে সাময়িক এক রঙ্গমঞ্চ খাড়া করে কাজ চালু করে দেওয়া হল—ওয়াটারলু স্ট্রিট ও গভর্নমেণ্ট হাউস ইস্টের কোণে আজ যেখানে দেখি এজরা ম্যানসন সেইখানে। ওপরে থ্যাকার কোম্পানীর বই-এর দোকান। সুপরিসর একতলাটিতে নির্মিত হল রঙ্গালয়' [পৃ. ১১০]।

২৫। দ্র. ১৮ নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৫৮০-২।

২৬। H. E. Busteed : *Echoes from Old Calcutta* : এ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনার জন্য ১৪নং পাদটীকা গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

২৭। সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত : 'শেক্সপীয়ার' [১৩৮১] পৃ. ৫২৫।

২.

শেক্সপীয়র ও বঙ্গীয় রঙ্গশালা

এক.

আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোচনা করে এসেছি যে কিভাবে কোলকাতা, তথা আধুনিক বঙ্গ-সংস্কৃতির সামগ্রিক প্রাণকেন্দ্র নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে শেক্সপীয়রের দেশের মানুষেরা নিজেদের জন্যে তৈরী রঙ্গমঞ্চে শেক্সপীয়রকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ; যেখানে নিজেরাই ছিলেন প্রয়োজক, পরিচালক ও অভিনেতা। এবং এও দেখেছি যে অর্থ, নিরাপত্তা এবং বৈচিত্র্যের লোভে সমবেত গৌড়জন কোলকাতার ইংরেজী নাট্যশালা ও তার শেক্সপীয়রের চর্চার প্রতি প্রায় প্রথম থেকেই তন্নিষ্টভাবে কৌতূহল পোষণ করে এসেছেন। এই অবস্থায় ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র বাঙলা দেশের মধ্যে কোলকাতায় প্রথম বাঙলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর সঙ্গে পরবর্তী কালের বাঙালীর বা বঙ্গভাষার নাট্যশালার কোনো যোগ নেই। 'কারণ, এই নাট্যশালায় বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দ্বারা বাঙলা নাটক অভিনীত হইলেও ইহার প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী নহেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হেরাসিম লেবেডফ [Herasim Lebedeff] নামে এক রুশ দেশবাসী নানা দেশ ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়েন এবং ২৫নং ডুমতলাতে [বর্তমান এজরা স্ট্রীটে] এক নাট্যশালা স্থাপন করেন'।[১] এই হেরাসিম তাঁর এই নাট্য-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে নিজেই যা বলেছেন তা হচ্ছে : 'আমি *The Disguise* ও *Love is the Best Doctor* নামে দুইখানা ইংরেজী নাটক বাঙলাতে অনুবাদ করি। · ···আমার অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে পর আমি কয়েকজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ডাকিয়া আনিলাম এবং তাঁহারা খুব মন দিয়া আমার নাটক দুইখানি পড়িলেন।······পণ্ডিতেরা অনুমোদন করিয়া গেলে পর আমার ভাষাশিক্ষক গোলোকনাথ দাস আমার নিকট এক প্রস্তাব করিলেন যে, যদি আমি এই নাটক সর্বসমক্ষে অভিনয় করিতে প্রস্তুত থাকি, তবে তিনি আমাকে এ দেশী অভিনেতা ও অভিনেত্রী আনিয়া দিতে পারেন।[২] তাঁহার এই প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত

হইলাম।······এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা আশ্বস্ত হইয়া এবং প্রদর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমি নিজে নক্‌শা করিয়া কলিকাতার কেন্দ্রস্থল ডোমটোলায় [ডোম-লেন] একটি বিস্তৃত নাট্যশালা নির্মাণ আরম্ভ করিলাম। ইত্যবসরে আমার ভাষাশিক্ষক গোলোককে আমি দেশীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করিবার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তিন মাসে *The Disguise* নাটকটির জন্য অভিনেতা সংগ্রহ ও নাট্যশালা প্রস্তুত হইয়া গেল। ১৭৯৫ সনের ২৭-এ নভেম্বর আমি বাঙলা ভাষার এই নাটক প্রকাশ্যে অভিনয় করাইলাম। পর বৎসর [১৭৯৬] ২১-এ মার্চ তারিখেও এই নাটকটি আবার অভিনীত হয়।'[৩]

বাঙালীর সঙ্গে মিলিত প্রচেষ্টায় নির্মিত এই প্রথম বঙ্গীয় রঙ্গশালায় অবশ্য শেক্সপীয়র অনুপস্থিত; তবুও কালানুক্রম বজায় রাখবার জন্যে এই নাট্য-প্রচেষ্টার উল্লেখ করা হলো। এরপর নতুন শতাব্দীর সূচনাতেই প্রতিষ্ঠিত হলো ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ [গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী কর্তৃক ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে]। একেবারে রুটি ও রুজির সম্পর্ক নিয়ে এদেশীয় টুলো পণ্ডিতদের সঙ্গে বিলাত থেকে সদ্য আগত ইংরেজদের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ ঘটতে থাকলো। এবং অবশ্যই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তারই প্রত্যক্ষ ফল ঐ কলেজের এক ইংরেজ ছাত্র সি. মংকটন কর্তৃক শেক্সপীয়রের 'দি টেম্পেষ্ট' নাটকের বঙ্গানুবাদ করা ও তাকে সর্বসমক্ষে [১৮০৯ খ্রীস্টাব্দ] প্রকাশ করা।[৪]

দেশে ইংরেজদের আধিপত্য সুনির্দিষ্ট হয়েছে এবং ইংরেজী ভাষা-সংস্কৃতি এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয়, এবং 'এ দেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার'[৫] যে ইচ্ছা তা থেকেই 'হিন্দু কলেজে'র পত্তন। [১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী]। এই ইংরেজী বিদ্যালয়ের ইংরেজী-বিষয়ক পাঠ্য-তালিকার মধ্যে শেক্সপীয়রের নাটক-পাঠ যে আবশ্যিক ছিলো তা মনে করি। অবশ্য এ-বিষয়ে অন্তত প্রথম ন-বছরের মধ্যেকার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন; তবুও কয়েকটি পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে বলা যায় যে, হিন্দু কলেজের প্রথম থেকেই শেক্সপীয়র পাঠ্য ছিলো। সাক্ষ্যগুলি এরূপ: ১। 'হিন্দু কলেজ'-এর ষোল বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শেক্সপীয়র পড়ানো হতো এবং সেখানকার এক ইংরেজ ছাত্র শেক্সপীয়রের নাটকের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। পৃথক

পরিবেশে হলেও একই পথ বেয়ে যখন আর একটি 'ইংরেজী পাঠশালা' তৈরীর প্রয়োজন দেখা দেয় তখন শেক্সপীয়র পাঠের বেলায় যে অন্যতর কিছু ঘটবে এমন মনে করি কি করে? ২। হিন্দু কলেজ তখনকার দিনে 'ইংরেজী পাঠশালা' [কলেজ কর্তৃপক্ষের ভাষায়: 'Anglo-Indian College'] নামেই প্রধানত পরিচিত ছিলো। অতএব ইংরেজী পাঠশালায় ইংরেজদের জাতীয় কবি-নাট্যকার শেক্সপীয়র যে থাকবেন, তা বলাই বাহুল্য। ৩। এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ন-বছর পরে শিক্ষকতার চাকুরী পেলেন [মে, ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দ] যে 'ডি রোজী সাহেব' তাঁকে পড়াতে হতো "Shakespeare's one of the tragedies'. তাই ডিরোজিও নিশ্চয়ই চাকুরী পাবার সময় কোন পাঠ্য-তালিকা তৈরী করে নিয়ে আসেন নি, তিনি ঐ কলেজেরই পূর্বাপর প্রচলিত পাঠ্যতালিকাই অনুসরণ করেছিলেন। ৪। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় ছ-মাস আগেই ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে অগাস্টের সাধারণ সভায় কলেজ পরিচালন সংক্রান্ত যে নিয়মাবলী প্রস্তুত হয় তার প্রথম ধারাই হলো: 'এই শিক্ষায়তনের মূল উদ্দেশ্য হলো সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানদের ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষা এবং ইওরোপ-এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া'।[৬] এ-অবস্থায় সেখানে শেক্সপীয়র ছিলো না ভাবতে কিছুটা কষ্ট-ই হয়। ফলে, এই বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার গণ্ডীর মধ্যে শেক্সপীয়র-চর্চা ও কোলকাতার বিদেশী রঙ্গমঞ্চে শেক্সপীয়রের অভিনয়ের অভিঘাত অচিরেই ঐ কলেজের ছাত্রদের কলেজেরই নিজস্ব অনুষ্ঠানাদিতে শেক্সপীয়রের নাট্যবিশেষের আংশিক আবৃত্তি ও অভিনয়ে অনুপ্রাণিত করে।

এখন আমরা এই ধরণের অনুষ্ঠানগুলিকে ক. স্কুল-কলেজে শেক্সপীয়রের অভিনয়-আবৃত্তি; এবং এর বাইরে খ. ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয়,—এই দু-ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করবো।

দুই.

ক: স্কুল-কলেজে শেক্সপীয়র

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কোলকাতার ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখা যাচ্ছে যে: 'কলকাতার ইংরেজ অধিবাসীদের

ছেলেমেয়েরা এবং বিশেষ করে ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মঞ্চাভিনয়ে অনেক আগেই যোগ দেওয়া শুরু করেছিল। অনেক বিদ্যালয় ভবনে সুগঠিত ও সুদৃশ্য মঞ্চও গড়ে উঠেছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই। যেমন, ধর্মতলায় বিখ্যাত ড্রামণ্ড'স অ্যাকাডেমিতে ছোট্ট কিন্তু সুন্দর একটি প্রেক্ষাগৃহ ছিল। প্রায়ই সেখানে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অভিনয় করত।'[৭] এবং বলা বাহুল্য যে এই সমস্ত অনুষ্ঠানে শেক্সপীয়রের নাটকগুলি একটি বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করতো। এর প্রমাণ ৩১শে ডিসেম্বর ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের 'ইণ্ডিয়া গেজেটের' পাতায় রয়েছে। সেখানে এইভাবে লেখা হয়েছে: 'The English recitations from different authors were extremely meritorious and reflect great credit upon the scholers and the teachers. A boy of the name Derogio[৮] gave a good conception of Shylock......' এমন কি এই ঘটনার দু-বছর পরে [১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ২০ জানুয়ারী] ঐ ডিরোজিওর বয়স যখন মাত্র পনের বছর তখন তিনি ঐ বিদ্যালয়ের আর একটি নাট্যানুষ্ঠানে স্ব-রচিত যে কবিতা পাঠ করেন তাতে তখনকার দিনের বিলাতের দুই বিখ্যাত 'শেক্সপীয়র-ওয়ালা'র Kembel ও Siddons-এর সপ্রশংস উল্লেখ আছে। এর কিছুদিন পরে যখন তিনি কোলকাতার হিন্দু কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন [১৮২৬-এর মে মাস] তখন তাঁকে শেক্সপীয়রের নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে এক জোড়া সনেট রচনা করতে দেখি। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের যেসব বিষয়গুলি পড়াতেন তার মধ্যে শেক্সপীয়রের যে কোন একটি বিয়োগান্ত নাটককেও দেখতে পাচ্ছি।[৯] এবং তাঁর বিশিষ্ট পঠন-প্রণালীর ফলে ছেলেরা শেক্সপীয়রের নাটক-আবৃত্তি ও অভিনয় করার দিকে বিশেষ কৌতূহল এবং আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে।

ফলে, ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী হিন্দু কলেজের বাৎসরিক উৎসবে 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের কিছু নির্বাচিত অংশ মঞ্চস্থ হয়।[১০] পরের বছর [১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী] হিন্দু কলেজের ছেলেরা 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকের বিচার দৃশ্যটি গভর্মেণ্ট হাউসে অভিনয় করে। এতে অংশগ্রহণকারী অভিনেতারা ছিলেন এইরূপ: ডিউক—কৃষ্ণহরি নন্দী, শাইলক—কাশীপ্রসাদ ঘোষ, এ্যানটনিও—অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, ব্যাসানিও—হরিশচন্দ্র দাশ, গ্রাসিয়ানো—রামচন্দ্র মিত্র, সালারিনো—কালীকুমার বসু,

পোর্শিয়া—কৃষ্ণধন মিত্র, নেরিসা—হরিহর মুখার্জি। এই অভিনয় সম্পর্কে সে-সময়ের একটি বিশিষ্ট সাময়িকপত্র মন্তব্য করছেন: 'Surely then this may be called a remarkable epoch in the history of India, seeing as we do, the native youth of Bengal cultivating the dramatic literature of the West and even encountering the difficulties of theatrical representations.'[১১] ঐ বছরেরই ২৭শে ফেব্রুয়ারী একই ধরণের অনুষ্ঠানে 'স্কুল সোসাইটি'র ছাত্রেরা শেক্সপীয়রের চতুর্থ হেনরী' [Henry IV] নাটকের কিয়দংশ অভিনয়ের ঢঙে আবৃত্তি করেন।

পরের বছর অর্থাৎ ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু কলেজের ছেলেদের দ্বারা শেক্সপীয়রের কয়েকটি বিশিষ্ট নাটকের [যেমন: 'জুলিয়াস সিজার', 'ম্যাকবেথ', 'সিম্বেলিন', 'ষষ্ঠ হেনরী', 'হ্যামলেট' প্রভৃতি] গভর্ণমেণ্ট হাউসে আবার অভিনীত হতে দেখি। সেদিন এগুলিতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

পরবর্তী ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে 'স্কুল সোসাইটি'র ছেলেরা ১৩ই মার্চ শোভাবাজারে গোপীমোহন দেবের বাড়ীতে 'জুলিয়াস সিজার' অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। এই অভিনয় বিগত বছরে হিন্দু কলেজের অভিনয়ের থেকে বহুলাংশে প্রশংসনীয় হয়েছিলো। পরের বছর ১২ই ফেব্রুয়ারী টাউন হলে হিন্দু কলেজের ছেলেদের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিসে'র তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের অভিনয় অবশ্য তাদের সম্মানকে পুনরুদ্ধার করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিলো। এই অনুষ্ঠানে স্বনামখ্যাত রামগোপাল ঘোষ টুবাল এবং কৈলাশচন্দ্র দত্ত শাইলকের ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

এই অভিনয় তথ্য কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। হিন্দু কলেজ থেকে আরম্ভ করে সমসাময়িক অন্য স্কুল-কলেজগুলিতে শেক্সপীয়রের নাটক সমূহের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অভিনীত বা নাটকীয় ঢঙে আবৃত্ত করা একটা নিয়মিত অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে গেলো। এখানে তার কিছু কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, ১। হিন্দু কলেজে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে 'টু জেণ্টেলমেন অব ভেরোনা' এবং 'ওথেলো'-র কিছু নির্বাচিত দৃশ্য অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণকারী অভিনেতাদের মধ্যে প্রখ্যাত রামতনু লাহিড়ী ছিলেন অন্যতম। ২। দশ বছরের বালক মধুসূদন হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসেবে 'হেনরী দি সিক্সথ' নাটকে

গ্লস্টার-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন [১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ]। ৩। ১৮৩৭ সালে 'মার্চেন্ট অব ভেনিসে'র বিচার দৃশ্য মঞ্চস্থ হয়। এই বছরেরই ২৯-এ মার্চ কোলকাতার 'গবর্ণমেণ্ট হাউসে হিন্দু কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ হয়। এই পুরস্কার বিতরণী সভায় ছাত্রেরা শেক্সপীয়র হইতে অনেকগুলি অংশ আবৃত্তি করে'।[১২] ৪। ঐ কলেজেরই শ্যামাচরণ বসু প্রমুখ কয়েকজন 'হ্যামলেট', 'রিচার্ড দি থার্ড', 'হেনরি দি ফিফ্থ' প্রভৃতি নাটকের বহু পঠিত ও সুপরিচিত স্বগতোক্তিগুলি অভিনয়ের ঢঙে আবৃত্তি করেছিলেন।

এরপর থেকে কলেজীয় শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে শেক্সপীয়রের নাটক বা নির্বাচিত অংশ বিশেষ অভিনয় বা অভিনয়ের ঢঙে আবৃত্তি করার রেওয়াজ যেন ক্রমশই উঠে যেতে থাকে। অবশ্য ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের সংবাদ সংগ্রহ করে দেখতে পাচ্ছি যে, 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' অভিনয়ের জন্যে তার ছেলেদের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে মহলা দিয়েও শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ করতে পারেন নি। কিন্তু এর বার বছর পরে [১৮৫২ খ্রীস্টাব্দ] কোলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ ক্লিঙ্গারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে উক্ত 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী'র ছাত্রদের কয়েকজন এবং 'মেট্রোপলিটান আকাদেমী'র কিছু ছাত্র 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের অভিনয় করেন।

"স্কুল কলেজে প্রকৃত অভিনয়ের উল্লেখ পাই, ইহার [১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দ] প্রায় ষোল বৎসর পরে।……১৮৫৩ সনে এই বিদ্যালয়ের [বটতলার ডেবিড হেয়ার-একাডেমীর] ছাত্রদের উদ্যোগে শেক্সপীয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' নামক নাটক অভিনীত হয়। ডেবিড হেয়ার একাডেমীর পূর্বে নাটকের এরূপ অভিনয় ছাত্রেরা আর কখনও করে নাই। · ১৬ই ফেব্রুয়ারী ডেবিড হেয়ার একাডেমীর ছাত্রদের দ্বারা এই নাটকের প্রথম অভিনয় ও সেই মাসেরই ২৪ এ তারিখে দ্বিতীয় অভিনয় হয়। …'গত গুরুবার সন্ধ্যার পরে হেয়ার একাডিমি নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পুনর্বার ইংলণ্ডীয় মহাকবি সেক্সপীয়ার সাহেব প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মারচেণ্ট অব ভিনিস নাটকের অনুরূপ দেখাইয়া বহুলোককে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, ঐ সময়ে বিদ্যালয়ের গৃহে প্রায় ৬০০।৭০০ এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগি, কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য লোক এবং সম্ভ্রান্ত সাহেব ও বিবিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত ছাত্রগণের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন…… বিচারাগারের অনুরূপ শোভা দর্শন ও তাহার প্রশ্ন বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া অনেকে হেয়ার একাডিমিকে আদালসি থিয়েটার বোধ করিয়াছিলেন ['সংবাদ

প্রভাকর' : শনিবার : ২৬।২।১৮৫৩]" ।[১৩] এখানেও নাট্যশিক্ষক ছিলেন কোলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ ক্লিঙ্গার।

এইভাবে, 'ডেবিড হেয়ার একাডেমীর দৃষ্টান্তে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় ওরিয়েন্টাল সেমিনারীও অভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে। এই স্কুলে পুরাদস্তুর নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাহার নাম দেওয়া হয়—ওরিয়েন্টাল থিয়েটার। ডেবিড হেয়ার একাডেমীর মত এই বিদ্যালয়েও শেক্সপীয়রের ইংরেজী নাটকই অভিনীত হইত।'[১৪] এখানে অভিনীত শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয়ের তথ্যগুলি এইরূপ : ১। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর সোমবার এবং ঐ বছরেরই ৫ই অক্টোবর শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয়ের স্থান ২৬৮ নং চিৎপুর রোড [গরাণহাটা], অভিনয় শিক্ষক মিঃ ক্লিঙ্গার সহ মিঃ রবার্ট, মিঃ পারকার, মিস্ ইলিস প্রমুখ। মুখ্য অভিনেতা : দীননাথ ঘোষ [ওথেলো] প্রিয়নাথ মিত্র [ইয়াগো], রাজেন্দ্রলাল মিত্র [ডেস্‌ডিমোনা] ইত্যাদি। এই অভিনয় সম্পর্কে 'বেঙ্গল হরকরা' তার ২৮এ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লিখেছেন : 'অভিনেতারা সকলেই কিশোর যুবক। ইহারা সকলেই পরলোকগত গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি।·····কেবল হিন্দু যুবকদের লইয়া সংগঠিত অভিনেতৃবর্গের দ্বারা একটি ইংরেজী নাটকের অভিনয় এই প্রথম।·····এই যুবকেরা যে ভাবে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহাতে এ দেশীয় জনগণের মানসিক উৎকর্ষাভিলাষী দর্শক মাত্রই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সন্দেহ নাই'।[১৫] ২। ঐ একই স্থানে ঐ একই অভিনেতৃবর্গের দ্বারা শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর অভিনয় হয় দুবার। এক. ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ২রা মার্চ। এবং দুই. তার দু-সপ্তাহ পরে ১৭ই মার্চ। এই দ্বিতীয় অভিনয়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো মিসেস গ্রীগ-নাম্নী একজন ইংরেজ মহিলার পোর্শিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। ৩। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে হেনরীর ভূমিকায় দেখি শেক্সপীয়রের 'হেনরী দি ফোর্থ' নাটকের অভিনয়ে। ৪। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ঐ একই দল কর্তৃক ঐ একই স্থানে শেক্সপীয়রের আরও একটি নাটকের অভিনয় হওয়ার খবর পাওয়া গেলেও, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি।[১৬]

এতদিন পর্যন্ত বাঙলা দেশের শেক্সপীয়রীয় অভিনয় প্রচেষ্টার প্রথম পর্যায়ে ইংরেজের রঙ্গমঞ্চে ইংরেজীতে ইংরেজ অভিনেতার দ্বারা অভিনয় হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইংরেজের পাশাপাশি বাঙালী কর্তৃক শেক্সপীয়র অভিনীত হলেও ভাষা ছিলো ইংরেজী। কিন্তু ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী 'হিন্দু পেট্রিয়টে'-র এক মন্তব্য থেকে তৃতীয় পর্যায়ের অভিনয় ধারার সূত্রপাত হলো বলে মনে করা যায়।[১৭] [এই প্রকার বিভিন্ন ধারাগুলিকে একটি ছকের সাহায্যে আগের অধ্যায়েই দেখিয়ে আসা হয়েছে]। সেই মন্তব্যের মর্মোদ্ধার করলে এই রকম দাঁড়ায় যে: "সেই সময়ে বোম্বাইয়ের গ্রাণ্ট থিয়েটারে দেশীয় ভাষায় [মারাঠী] অভিনয় হইতেছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক কলিকাতাতেও যাহাতে বাঙলা নাটকের অভিনয় হয় সে জন্য ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের কর্মকর্তাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।"[১৮]

এর সামান্য কিছু আগে থেকেই বঙ্গীয় নাট্যশালা, বাঙলা নাট্য-সাহিত্য ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সে এক স্বতন্ত্র ইতিহাস। আমরা পরে সেই ইতিহাসের সঙ্গে শেক্সপীয়র-ভাবনা যতটুকু জড়িত ছিলো তার আলোচনা করেছি। আমরা এখানে আরও কিছু স্কুল-কলেজের নাট্য-গৃহ বা স্কুল-কলেজের ছাত্রদের দ্বারা শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয় বা নাট্যাংশের অভিনয় ঢঙে যে-সব আবৃত্তি হয়েছিলো তার সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা করব: এক. ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী কোলকাতার 'ইউনিভার্সিটি 'ইন্‌স্টিটিউট'-এ কোলকাতার কয়েকটি কলেজের কিছু ছাত্র শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের অভিনয় করেন।[১৯] এই প্রতিষ্ঠানের উক্ত দলটি ক্রমে ক্রমে একটি সুন্দর 'শেক্সপীয়র [অভিনয়] কোম্পানী' গড়ে তোলে। এবং তাঁরা ঐখানে ১৯০০ সালে 'ম্যাকবেথ'[২০] ১৯০৫-এ 'টুয়েলভ্‌থ নাইট' এবং ১৯০৬ 'জুলিয়াস সিজার' অভিনয় করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রথম নাটকটিতে এক সভাসদের ভূমিকায় অভিনয় করেন। দুই. ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে 'জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ'-এর ছাত্রেরা 'জুলিয়াস সিজার' অভিনয় করেন। তখন ঐ কলেজের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র এবং পরবর্তী কালে প্রখ্যাত অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী ব্রুটাসের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিন. ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে ঐ একই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শিশিরকুমার [এ্যাণ্টনিও] এবং নরেশ মিত্র [শাইলক]-র অভিনয়ে সমৃদ্ধ হয়ে 'দি মার্চেণ্ট অব ভেনিস' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। চার. ঐ বছরের ২৭শে মার্চ শিশিরকুমার 'ইউনিভার্সিটি

ইন্‌স্টিটিউট'-এ 'হ্যামলেট' নাটকের অভিনয়ে ক্লডিয়স ও প্রেতাত্মার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

প্রায় শতাধিক বৎসর ধরে বাঙালী ছাত্রেরা যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় তাঁদের পঠন-পাঠন ও আবৃত্তির সূত্র ধরে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, সে বিষয়ে উদ্দীপনা সৃষ্টির পেছনে বাঙালীর নব-জাগরণের পীঠস্থান 'হিন্দু-কলেজে'-র কয়েকজন অধ্যাপকের অধ্যাপনা ও উৎসাহের কথা এ-প্রসঙ্গে অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন। তা না করলে উত্তমর্ণের ঋণ অস্বীকারের কৃতঘ্নতা জনিত পাপভোগ করতে হবে। এবং আশ্চর্য যে আমাদের এই মহান উত্তমর্ণেরা সকলেই ছিলেন বিদেশী। যেমন ডিরোজিও, রিচার্ডসন, উইলসন এবং পাওয়েল প্রমুখ হিন্দু কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপকেরা পরম আন্তরিকতার সঙ্গে শেক্সপীয়রকে তাঁদের বাঙালী ছাত্রদের কাছে পড়িয়েছিলেন, সেই বিষয়ে তাঁদের উৎসাহিতও করে তুলেছিলেন। ডিরোজিও এবং শেক্সপীয়র প্রসঙ্গ আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি। এখন রিচার্ডসন[২১] সম্পর্কে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র বলছেন: "কাপ্তেন সাহেব ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শেক্সপীয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাঁহার সেক্ষপিয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি ভারতবর্ষের সব কিছু ভুলিতে পারি, কিন্তু আপনার সেক্ষপিয়র-আবৃত্তি ভুলিতে পারি না।' তিনি আশ্চর্যরূপে সেক্ষপিয়র বুঝাইয়া দিতেন। হ্যামলেটে যেখানে আছে 'দ্যাট্ শোজ ইটস্ হোর লীভজ্ ইন দি গ্লাসী স্ট্রীম' সেই স্থান বুঝাইবার সময়ে তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে' গাছের পাতা সবুজ, 'হোর লীভজ' এই প্রয়োগ কবি কেন ব্যবহার করিলেন? ইহার উত্তর দিতে না পারাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পাতার নিম্নভাগই জলে প্রতিবিম্বিত হয়, সে ভাগ সাদা।"[২২]

পরবর্তী কালে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দু কলেজ এবং সেখানে রিচার্ডসন মহাশয়ের শেক্সপীয়র পড়ানো সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: 'একদিকে যুবক বয়স্যদিগের মধ্যে এইরূপে দেশীয় রীতিবিরুদ্ধ আচরণ ও কলেজ গৃহে ডি. এল. রিচার্ডসন সাহেবের শেক্সপীয়ার পাঠ। এরূপ শেক্সপীয়ার পড়িতে কাহাকেও শুনা যায় নাই। তিনি শেক্সপীয়ার পড়িতে পড়িতে নিজে উন্মত্ত হইয়া যাইতেন এবং ছাত্রগণকেও মাতাইয়া তুলিতেন। তিনি যে অনেক

পরিমাণে মধুসূদনের কবিত্ব শক্তি স্ফুরণের কারণ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মুখে শেক্সপীয়ার শুনিয়া ছাত্রগণ শেক্সপীয়ারের ন্যায় কবি নাই, ইংরাজী সাহিত্যের ন্যায় সাহিত্য নাই, এই জ্ঞানেই বর্ধিত হইত!'[২৩] বঙ্গীয় মননে, সংস্কৃতিতে, পাঠ্যগৃহে এবং নাট্যশালায় শেক্সপীয়রের সম্মান-সৃষ্টিতে এই পরোক্ষ আয়োজন উদ্যোগ ও উপচার সংগ্রহের প্রচেষ্টার কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাওয়ার উচিত নয়।

পরিশেষে, আমাদের মন্তব্য এই যে পরবর্তী কালে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে স্কুল-কলেজগুলিতে বা তার ছাত্রদের দ্বারা শেক্সপীয়রের নাট্য-আবৃত্তি বা অভিনয় [play, reading and performances] প্রায় বন্ধই হয়ে গেলো। এমন কি স্বাধীনতার পরবর্তী দশকগুলিতে এদেশীয় ছাত্রদের পূর্বতন শতাব্দীর মতো শেক্সপীয়র-অভিনয় সম্বন্ধে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আয়োজন ও উদ্যোগ গ্রহণের সংবাদ যাচ্ছে না।

খ : ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত উদ্যোগ ও শেক্সপীয়র

বাঙলা দেশে প্রথম নাট্যশালা[২৪] স্থাপন যে বিদেশীর কীর্তি সে-কথা আমরা আগেই বলে এসেছি। কিন্তু যেহেতু তার সঙ্গে দেশের লোকের রুচি, আগ্রহ এবং মৌলিক উদ্যমের কোনো যোগ ছিলো না তাই অচিরেই তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিলো। অভিজ্ঞতা বলে যে, অভাবই নতুন সৃষ্টির জননী। তাই ইংরেজের থিয়েটার প্রীতি এবং হিন্দু কলেজের ক্লাসরুমে ডিরোজিও প্রমুখের শেক্সপীয়র চর্চা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বাঙালীর মধ্যে নাট্যশালার এবং তার উপযোগী নাটকের অভাববোধের জন্ম দেয়। ফলে ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে বাঙালীদের জন্যে ইংরেজী ধরণের একটি নাট্যশালার একান্ত প্রয়োজন সম্পর্কে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সংবাদপত্রে একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়। এবং প্রয়োজন যে সেদিন ভীষণ গুরুতর ছিলো তা বুঝতে পারা গেলো, যখন দেখলাম যে ঐ বছরেরই অগাষ্ট মাসে বাঙালীর নিজস্ব নাট্যশালা সম্পর্কে 'চন্দ্রিকা'-র ঐ সম্পাদকীয় ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে 'এশিয়াটিক জার্ণাল'-এ প্রকাশিত হয়েছে।[২৫] অর্থাৎ ঐ পত্রিকার আগ্রহী মনোভাব "সে-যুগের সকল বাঙালীই অনুভব করিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অনেকেই কলিকাতার

ইংরেজদের নাট্যশালায় ইংরেজী অভিনয় দেখিতে যাইতেন এবং সকলেই ইংরেজী ধরণে বাঙলা নাটক অভিনয় করাইবার জন্য উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু এই উৎসাহের ফলে বাঙালী কর্তৃক একেবারেই বাঙলা নাটকের অভিনয় প্রদর্শন আরম্ভ হইল না। ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীরা নিজেদের বাড়ীতে ইংরেজী নাটকের অভিনয় করিয়া বাঙালীদের মধ্যে নাট্যকলার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন, বাঙালী প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার সূত্রপাত হইল শেক্সপীয়রের নাটক ও ভবভূতির ইংরেজী অনুবাদ লইয়া। এই সকল অভিনয়ের উপর হিন্দু কলেজের শিক্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট।··· এই ব্যাপারের উদ্যোক্তা প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তাঁহার 'হিন্দু থিয়েটার'ই ইংরেজী-শিক্ষিত নব্য-বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা।"[২৬] এই নাট্যশালা প্রসন্নকুমারের নারকেলডাঙ্গার বাগানবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার'-এর অংশ বিশেষের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তার দ্বারোদ্‌ঘাটিত হয়। এই সঙ্গে ভবভূতির 'উত্তরামচরিত'-এর ইংরেজী অনুবাদও অভিনীত হয়েছিলো। অর্থাৎ বাঙালীর প্রথম নাট্যশালাতেই [একে ঠিক নাট্যশালা না বলে অভিনয়স্থান বলাই ভালো] ঠাঁই পেলেন সম্মাননীয় শেক্সপীয়র। কেউ কেউ বলছেন যে, এর পরেও প্রসন্নকুমার নিজে উদ্যোগ নিয়ে এইখানে 'হিন্দু কলেজে'র ছেলেদের দিয়ে 'ওথেলো', 'জুলিয়াস সীজার' ও 'দি টু জেণ্টলমেন অব ভেরোনা'-র অভিনয় করিয়েছিলেন।[২৭]

সে-যাই হোক, "ইহার পর যে-নাট্যশালায় শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হয় সেটি জোড়াসাঁকো থিয়েটার। এই নাট্যশালাটি কোন স্কুল বা কলেজের সহিত সংযুক্ত ছিল না। ইহার আয়োজন-উদ্যোগও আরও একটু বড় হইয়াছিল। ······ প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এই নাট্যশালাটি অবস্থিত ছিল। ১৮৫৪ সনের ৩রা মে তারিখে এই নাট্যশালায় শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজর' অভিনীত হয়। ······ ঐ নাটক দর্শনার্থ প্রায় ৪০০ শত অতি সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হয়, ইংরাজ ও বিবি অনেক আসিয়াছিলেন, ······ ।"[২৮] যদিও অভিনয়ের রাত্তিরে দারুণ ঝড়বৃষ্টি হয়েছিলো।

এইভাবে শেক্সপীয়রকে অবলম্বন করে বাঙালীর চিত্তবিস্ফারের লক্ষণ কিছু আগে থেকেই দেখা দিয়েছিলো, তা কিন্তু এই সময় থেকেই প্রধানত দু-প্রকারে আত্মপ্রকাশ করলো: ১. ইংরেজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ ও দৈনন্দিনতার

সংঘর্ষে এসে বাঙালী তার আত্মশক্তির পরিচয়কে বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার সাহস অর্জন করলো। ফলে, ক। বাঙলা ভাষায় অনুবাদ ও মৌলিক নাটক রচনা আরম্ভ হয়ে গেলো। খ। নাটকের জন্যে নাট্যশালা বা নাট্যশালার জন্যে নাটক, উভয়ত উদ্বোধনের একটা দ্বিমুখী প্রবাহ চলতে থাকলো। অর্থাৎ বাঙলা নাটক ও বাঙলা নাট্যশালার ইতিহাস পরস্পরের পরিপূরক হয়ে গেলো। গ। এই সময় থেকেই বাঙালী প্রতিষ্ঠিত কোন বৃহৎ এবং নামকরা নাট্যাশালায় একান্তভাবে কোনো ইংরেজী বা মুখ্যত শেক্সপীয়রের নাটকের মূল ভাষায় বা অনুবাদের মাধ্যমে অভিনয় বহুলাংশেই গৌণ হয়ে গেলো। কারণ, ২. শেক্সপীয়র স্ব-ভাষায় বা অনুকরণের নাছ-দুয়ার ছেড়ে বাঙালীর নাট্যপ্রতিভার সঙ্গে সমীভূত হয়ে গেলো।

বাঙালীর নাট্যরচনার ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রকে এইভাবে স্বী-করণের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ঐ ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে মূল শেক্সপীয়রের অভিনয়ের পরেও আরো অনেকবার বাঙালীর কাছে ভাবানুসরণে বা মূলানুগ অনুবাদের মাধ্যমে শেক্সপীয়র মাঝে মাঝে মঞ্চস্থ হবার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু সেই সুযোগ প্রাপ্তির পরবর্তী অভিজ্ঞতা সকলেরই প্রায় এইরূপ: "এক শ্রেণীর সমালোচক কখন কখন দেখা দেন, তাঁহারা নাক সিঁটকাইয়া আছেন, 'বাঙলায় নাটক নাই, অভিনয় নাই, সকলই দোষ'। ...... তাঁহারা শেক্সপীয়ারের নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু বুঝেন না যে, যদি শেক্সপীয়র স্বয়ং বাঙলায় আসিয়া নাটক লেখেন, তাই বাঙালী দর্শকের বোধগম্য হইবে না। সমালোচক না হয় বুঝিয়া যাইবেন, কিন্তু অপর দর্শক তাহা পয়সা দিয়া দেখিতে আসিবে না। আমার এ-কথাটি আনুমানিক নয়। যখন মিনার্ভায় 'ম্যাকবেথ' অভিনীত হয়, দুই-চারি অভিনয়-রজনীর পর রঙ্গালয় প্রায় দর্শকশূন্য হইয়াছিল। প্রথম প্রথম যে দর্শক আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন আমাদের সাক্ষাতে বলেন, 'আমি প্রায় দশ বৎসর থিয়েটার দেখিতেছি, কিন্তু এমন ঠকন কখনও ঠকি নাই।' তাহার পর 'আবু হোসেন' হওয়ায় অনেকে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।"[২৯]

এর পর আরও আছে: 'কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও প্রভাবশালী অভিনেতাও কলিকাতায় আসিয়া শেক্সপীয়রের নাটক অভিনীত করিতে গিয়া ইংরাজটোলায়, পাঁচ টাকা মাত্র টিকিট বিক্রয় করিয়াছিলেন। শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনেতা, কলিকাতা আসিতে সাহস করেন না। Bandman ও

Brough শেক্সপীয়র ছাড়িয়া গীতিনাট্য ও রং তামাসা লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন'।[৩০]

এতদ্‌সত্বেও শেক্সপীয়রের নাটকের প্রধানত বাঙলা রূপ বিগত বা এ-শতাব্দীতে অনেকবার এদেশে মঞ্চস্থ হয়েছে। যেমন: ১। হরলাল রায়ের লেখা 'রুদ্রপাল' ['ম্যাকবেথে'র অনুসরণ] ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর 'গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে' অভিনীত হয়। ২। এই একই নাটক, একই মঞ্চে মাসখানেক বাদে [২৮ নভেম্বর] অভিনয়ের আয়োজন হয়। ৩। 'ওথেলো'র বাঙলা রূপান্তর 'ভীমসিংহ' [তারিণী পাল কৃত] ১৮৭৫-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী 'বেঙ্গল থিয়েটারে' অভিনীত হয়। ৪। ১৮৭৪-এর ২৫শে এপ্রিল চন্দ্রকালী ঘোষ কৃত 'কুসুমকুমারী' নাটক ['সিম্বেলিনে'র অনুসরণ] এই থিয়েটারেই অভিনীত হয়। ৫। এই নাটকটিই এর তিন মাস পূর্বে [১৭ জানুয়ারী] মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে অভিনীত হয়। ৬। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কোরিনথিয়ান থিয়েটারে 'কমেডি অব এররসে'র বাঙলা রূপান্তর মঞ্চস্থ হয়। ৭। গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনূদিত 'ম্যাকবেথ' নাটকটি ২৮শে জানুয়ারী ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করা হয়। এটি এখানে কয়েকদিন ধরে নিয়মিত ভাবে চলার পর আর্থিক ক্ষতি সহ্য না করতে পেরে বন্ধ হয়ে যায়। ৮। নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'হরিরাজ' ['হ্যামলেট'-এর অনুবাদ] ক্লাসিক থিয়েটারে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জুন মঞ্চস্থ হয়। ৯। ভিক্টোরিয়া ক্লাবের কিছু উদ্যোগী কর্মী এর কিছুদিন পূর্বে ঐ নাটকের কয়েকটি নিয়মিত 'শো' করার চেষ্টা করেছিলেন। ১০। এইভাবে শেক্সপীয়র নবরূপে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে কি সমাদর লাভ করেছিলেন তার তথ্য উপস্থিত করে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকার লিখেছেন: "শেক্সপীয়রের যে কয়টি অনুবাদ অর্থাৎ মর্মানুবাদ হইয়াছিল তাহার কয়েকখানি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে একাধিক বার অভিনীত হইয়া সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছিল। বেণীমাধব ঘোষ করিয়াছিলেন 'কমেডি অব এররস'-এর অনুবাদ 'ভ্রমকৌতুক' নামে [১৮৭৩]। হরলাল রায়ের 'রুদ্রপাল' [১৮৭৪] 'ম্যাকবেথ' অবলম্বনে লেখা। 'টেমপেস্ট' অনুবাদ করিয়াছিলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'নলিনী-বসন্ত নাটক' নামে [১৮৬৮]। ইনি 'রোমিও জুলিয়েট'-এরও অনুবাদ করিয়াছিলেন [১৮৯৫]। প্রথম তিনখানি বই নাট্যমঞ্চে জনপ্রিয় হইয়াছিল।"[৩১]

এইভাবে বাঙলা নাট্যমঞ্চে শেক্সপীয়র অভিনয় কেবলমাত্র নগর

কোলকাতার জনরুচিকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকতে চায় নি, মফঃস্বল বাঙলার কয়েকটি বিখ্যাত অঞ্চলেও তা ছড়িয়ে পড়ে। যেমন : ক। হুগলী জেলার গরিফায় কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে 'হ্যামলেট' নাটকের অভিনয় হয়েছিলো। খ। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে কৃষ্ণনগর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কৃষ্ণনগরে 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস'-এর অভিনয় হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে মহাকবি শেক্সপীয়রের অমর নাটকগুলির অভিনয় আধুনিক বাঙালীর জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে একদিকে যেমন সমীভূত হয়ে গেলো, তেমনি অন্য দিকে তার রস-সংস্কারে শেক্সপীয়র নিত্য নতুন মানস-ভোজ্য রচনা করতে থাকলেন। এবং প্রায় দেড়শো বছরেরও বেশী সময় ধরে শেক্সপীয়রের মাধ্যমে বাঙালী পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রসামৃত পান করেছিলো বলেই বিংশ শতাব্দীর বিচিত্র এবং উপপ্লুত ও অস্থির জীবনাচরণের মধ্যেও শেক্সপীয়র সাধনায় তারা প্রত্যবায় ঘটায় নি। তাই দেখি যে, স্বাধীনতার [১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ] প্রায় পরে পরেই বাঙলা রঙ্গমঞ্চে শেক্সপীয়রের অভিনয়ের যেন একটা জোয়ার এলো। অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই মাঝে মধ্যে এখানকার রঙ্গমঞ্চগুলিতে শেক্সপীয়র যে স্থান পেতেন না তা নয়। এর মধ্যে এই শতাব্দীর তিনের দশক থেকেই 'সিনেমা' নামে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং দ্রুত প্রমোদ বিতরণের এক মাধ্যম দেখা দিলো। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অপেশাদার এবং নব-নিরীক্ষানুসন্ধানী কিছু কিছু নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের নাট্য-প্রয়োজনার সময় শেক্সপীয়রকে অবশ্যই ভুললেন না। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী পি. এল. টি. নামক দলটি ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের অগাষ্টে 'রোমিও এণ্ড জুলিয়েট' নাটকের কিছু নির্বাচিত অংশ অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নাট্য-সমাজে আত্মপ্রকাশ করলেন। এরপর এই দল 'রিচার্ড দি থার্ড', 'মেরী ওয়াইভস অব উইণ্ডসোর', 'ওথেলো' [বাঙলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায়] প্রভৃতি নাটকগুলিকে মঞ্চস্থ করেন। এখানে বাঙলায় অনূদিত হয়ে 'দি মার্চেণ্ট অব ভেনিস' 'জুলিয়াস সীজার', 'চৈতালি রাতের স্বপ্ন' ['এ মিডসামার-নাইট্'স্ ড্রিম'] ইত্যাদি নাটক সমূহ অভিনীত হয়।[৩২]

চারের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তীব্র স্বাধীনতা সংগ্রামকে পটভূমিতে রেখে বাঙলাদেশে 'নব-নাট্য আন্দোলনে'র সূচনা হয়। এই আন্দোলন বাঙলা নাট্যরচনা ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক মোড় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেক্সপীয়র প্রীতিকে আরও সার্থকতার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে। এবং প্রায় সকলেই সুন্দর ও

ঝরঝরে বাঙলায় অনুবাদের মাধ্যমে উচ্চস্তরের ও সর্বাধুনিক প্রয়োগ-রীতি-সহযোগে শেক্সপীয়র মঞ্চস্থ করতে থাকেন। যেমন: 'বঙ্গীয় শেক্সপীয়র পরিষদ'-দ্বারা 'ম্যাকবেথ; 'উদয়াচল' কর্তৃক 'হ্যামলেট' ও 'ওথেলো'; 'ঐকতান গোষ্ঠী'র দ্বারা 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস' এবং 'কিং লীয়ার'; 'থিয়েটার ইউনিট' কর্তৃক 'জুলিয়াস সীজার'; 'শৌভনিক গোষ্ঠী'র দ্বারা 'ওথেলো' এবং 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' প্রভৃতি নাটক অসংখ্যবার একান্ত সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হয়। এবং কি আশ্চর্য, সম্প্রতি শেক্সপীয়র ভাষান্তরিত হয়ে বা ভাবানুবাদের মাধ্যমে বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে [কোলকাতার বিজন থিয়েটারে 'দি টেমিং অব দি শ্রু'-র ভাবানুবাদ 'শ্রীমতী ভয়ঙ্করী'-র কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য]।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সিনেমা রঙ্গমঞ্চের প্রতিদ্বন্দ্বী একথা ঠিকই, কিন্তু পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকে শেক্সপীয়রের অমর নাটকগুলি যখন সিনেমায়িত হয়ে এখানে এসেছে তখন এখানকার জনসাধারণ [বিশেষত শিক্ষিতজনেরা] তাঁদের শেক্সপীয়র প্রীতির সুদীর্ঘ ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই সিনেমাগৃহগুলিতে ভীড় করেছেন। মাধ্যম ভিন্নতর হলেও শেক্সপীয়র বাঙালীর রসিক হৃদয়ের চির-আদরের সামগ্রী। সব শেষে, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শেক্সপীয়রের স্থান সম্পর্কে আরও একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ উপস্থিত করা যেতে পারে, তা হচ্ছে এই যে, মাত্র কয়েক বছর আগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনূদিত শেক্সপীয়রের 'কমেডি অফ এররস' নাটকের বাঙলা অনুবাদ 'ভ্রান্তিবিলাস' সিনেমায়িত হয়ে বিপুল সুখ্যাতি ও প্রচুর অর্থার্জন ঘটিয়েছে। বর্তমানেও এটি নাটকাকারে নিয়মিত সার্বজনীন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। অতএব এখানে আমরা এই মন্তব্য করতে পারি যে বাঙালীর রস-রঙ্গশালায় মহাকবি শেক্সপীয়র চির-বরেণ্য।

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' [১৩৬৮]: পৃ. ৩।

২। এখানে লক্ষণীয় যে গোলোকনাথ দাসের মত একজন সাধারণ টুলো পণ্ডিত লেবেডফকে থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতে ও রীতিমতো বাঙলা নাটক অভিনয় করাতে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন। এই মনোভাবের পশ্চাৎ-ভূমিকে এ-প্রসঙ্গে পাঠকগণকে বিশেষভাবে স্মরণ করতে অনুরোধ করি।

৩। দ্রষ্টব্য ১নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৩-৪।

৪। 'তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠারও পূর্বে শেক্সপীয়ারের দু-একটি নাটক বাঙলায় অনূদিত হয়েছিল। পরম বিস্ময়ের বিষয়—বাঙলা নাটকের প্রথম অনুবাদ করেছিলেন একজন ইংরেজ। নাম তাঁর মস্কটন।...ছাত্র ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের। কাজ করতেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে। বাঙলা ভাষায় বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।'—সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত : 'শেক্সপীয়ার' [১৩০১] : পৃ. ৪৭৮।

৫। শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [১৯৫৭] : পৃ ৮০। এই প্রসঙ্গে ঐ গ্রন্থের ঐ পৃষ্ঠাতেই আরও যা লেখা হয়েছে, সেটিও উল্লেখযোগ্য : '১৮১৪ সালে কাশীধামে জয়নারায়ণ ঘোষাল নামক একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক মৃত্যুকালে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটীর হস্তে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা দিয়া যান। গবর্ণমেণ্টকে ইংরাজী শিক্ষাদান বিষয়ে উদাসীন দেখিয়াই তিনি ঐ প্রকার করিয়া থাকিবেন।'—শাস্ত্রী মশায়ের এই গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ কাল ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দ।

৬। প্যারীচাঁদ মিত্র : 'ডেভিড হেয়ার' [অনুবাদ : 'সম্বোধি পাবলিকেশনস্ : ১৯৬০] : পৃ. ১৭৫।

৭। অমল মিত্র : 'কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়' [১৩৭৪] : পৃ. ২১৩।

৮। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র [১৮ই এপ্রিল ১৮০৯—২৬শে ডিসেম্বর ১৮৩১] জন্ম কোলকাতায়। ইনি জাতিতে পর্তুগীজ বংশোদ্ভব ফিরিঙ্গী। ভারতবর্ষ তথা বঙ্গভূমিকেই ইনি আপন মাতৃভূমি হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ইনি হিন্দু কলেজের ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। তাঁর কাব্য-প্রতিভা, যুক্তিবাদী বক্তৃতা, আধুনিক জীবনমুখী প্রাগ্রসর চিন্তা সেদিনের হিন্দু কলেজের তরুণদের বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করেছিলো। তাঁর শিক্ষার ফলে হিন্দু কলেজের হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিক্যবুদ্ধি এবং স্বাধীন মননশীলতার জন্ম দিচ্ছে, এই অজুহাতে তাঁকে ১৮৩১-এর ২৫শে এপ্রিল কলেজের কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়। ইনি *Fakir of Jhungeera* নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা এবং 'হেসপেরাস,' 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' নামে দুটি সংবাদ পত্রেরও সম্পাদনা করেন। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর মাত্র বাইশ বছর বয়সে দুরন্ত কলেরা রোগে ইনি মৃত্যু বরণ করেন।

৯। T. Edwards : *Henry Derozio, The Eurasian Poet, Teacher & Journalist* [1884] : p. 66.

১০। Amalendu Bose ed. : *Calcutta Essays on Shekespeare* [C. U. 1964] : p. 200.

১১। *The Calcutta Gazette* : 17th. January 1828.

১২। দ্রষ্টব্য ১নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ১৮।

১৩। ঐ ঐ : পৃ. ১৮-১৯।

১৪। ঐ।

১৫। ঐ ঐ : পৃ. ২০।

১৬। দ্রষ্টব্য ১০নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ২০৩।

১৭। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে এর দু-বছর আগে থেকেই বাঙলাতে রীতিমত ভাবে শেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদ বা অপরাপর মৌলিক বাঙলা নাটকে লেখা হতে থাকে—যার ইতিহাস পরেব অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৮। দ্রষ্টব্য ১নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ২১।

১৯। মণি বাগ্‌চী : 'শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার' [১৯৬০] : পৃ. ৮৩।

২০। অজিতকুমার ঘোষ : 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শেক্সপীয়র' [প্রবন্ধ] : এই প্রবন্ধটি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সম্পাদিত 'শেক্সপীয়র চতুর্থ জন্মশতাব্দী স্মারক গ্রন্থ' [১৯৬৪]-এ সংকলিত আছে।

২১। ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন [১৮০১-১৭ই নভেম্বর ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দ] বাঙলাদেশের সৈন্যবিভাগের কর্ণেল ডি. টি. রিচার্ডসনের পুত্র। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে সৈন্যবিভাগে চাকুরী পেয়ে ১৮২৩-তে লেফ্‌টেনান্ট হন। পরের বছর শারীরিক কারণে ঐ চাকুরী থেকে ছুটি নিয়ে [১৮২৪] দেশে চলে যান। ১৮৩৫-এ হিন্দু কলেজের ইংরেজী সাহিত্য-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ডিরোজিওর পর হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ওপর তাঁর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল তিনি মাসিক ছ-শ টাকা বেতনে ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত ঐ পদে থাকেন ও পরে দেশে চলে যান। ফিরে এসে [১৮৪৫] তিনি কৃষ্ণনগর, হুগলী ইত্যাদি কলেজ হয়ে আবার হিন্দু কলেজে ফিরে আসেন। পরে

সরকারের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করেন। এবং দেশীয় হিন্দুগণের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আজীবন ছাত্র-প্রীতিকে অক্ষুন্ন রাখেন। তিনি ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে শেষবারের মতো ভারত ত্যাগ করেন এবং ঐ বছরেরই নভেম্বর মাসে তিনি স্বদেশের মাটিতে অন্তিম আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে রিচার্ডসন ছিলেন টোরী দলভুক্ত। এ-প্রসঙ্গে এখানে এ-কথা উল্লেখ করা বোধহয় অন্যায় হবে না যে সুশীলকুমার গুপ্ত এর লেখা 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ' গ্রন্থে রিচার্ডসন-এর জন্ম-চাকুরী-গ্রহণ ইত্যাদির তারিখে কিছু অন্যথা লক্ষ্য করা গেছে।

২২। রাজনারায়ণ বসু : 'আত্মচরিত'

২৩। দ্রষ্টব্য ৫নং পাদটিকার গ্রন্থ : পৃ. ১৫৭।

২৪। রুশ দেশীয় ভদ্রলোক হেরাসিম লেবেডফ কর্তৃক ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত Bengaly Theatre-এর কথা এখানে বলা হয়েছে।

২৫। দ্রষ্টব্য ১নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৭।

২৬। ঐ ঐ : পৃ. ৮ এবং ১১।

২৭। দ্রষ্টব্য ৪নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৫২৪।

২৮। দ্রষ্টব্য ১নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ২১-২২।

২৯। দ্রষ্টব্য ৪নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৫২৬।

৩০। 'গিরিশ রচনাবলী' : ১ম খণ্ড
পৃ ৭৩৮।

৩১। সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'
পৃ. ৩৫।

৩২। দ্রষ্টব্য ১০নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ২০৬-৭।

৩.

শেক্সপীয়র : বাঙলা অনুবাদ-নাটক

ক.

পূর্বের অধ্যায়ে রেখে আসা আলোচনার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর ইতিহাস-গ্রাহ্য পরিচয়-তারিখের প্রায় অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই শেক্সপীয়র ও বাঙালীর সাক্ষাৎকার ঘটে গেলো। ইংরেজ পরিপূর্ণ পাটোয়ারী বুদ্ধি নিয়ে এদেশে এসেছে এবং তাদের মধ্যেকার যে সব ইংরেজ যে স্থূল উদ্দেশ্য নিয়ে বাঙালীর সঙ্গে মিশেছে তাদের কাছে শেক্সপীয়র চর্চার মতো সূক্ষ্ম সরসতার আশা করা আর মরুভূমিতে জল চাওয়া, একই কথা ; তথাপি ইংরেজ, ইংরেজ, এবং এই ইংরেজ সম্বন্ধেই কার্লাইল একদা বলেছিলেন : 'যদি ইংরেজ জাতিকে প্রশ্ন করা হয়, তোমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মণিহার ভারতবর্ষকে ছাড়তে চাও, না শেক্সপীয়রকে ছাড়তে চাও, তাহলে আমলাতন্ত্রীরা যাই বলুন না কেন, ইংরেজ জনসাধারণ এক বাক্যে বলে উঠবেন, ভারত আমাদের থাকুক আর না থাকুক, আমরা শেক্সপীয়র সাহিত্য থেকে কোন কারণেই বঞ্চিত হতে প্রস্তুত নই।' তাই মানদণ্ডধারী ইংরেজ রাজদণ্ড ধারণ করার সোজা বা বাঁকা পথের সুলুক-সন্ধান করার ফাঁকেই কোলকাতায় রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে ফেললেন এবং সেখানে শেক্সপীয়র অচিরেই স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন।

তারপর দিন গেছে, গঙ্গায় অনেক জল গড়িয়েছে ; একদিকে যেমন ইংরেজ বাঙলার মাটিকে আশ্রয় করে সারা ভারতবর্ষে তার সাম্রাজ্য-সৌধ নির্মাণ করতে থেকেছে, অন্যদিকে তার প্রাণসত্তারূপী শেক্সপীয়রীয় সাহিত্য বাঙালীর রস-রাজ্যে একেবারে নিলীন হতে আরম্ভ করেছে। ফলে, ইংরেজের সংস্পর্শে বাঙলায় যে নব-চেতনার, নতুন ইতিহাসের জন্ম হয়, সেখানে শেক্সপীরীয় সাহিত্য তার অন্যতম শুশ্রূষাকারী সঙ্গী হিসেবে সম্মাননীয় স্থান লাভ করেন। এতে ক. বাঙালীরা ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে শেক্সপীয়র দর্শন করতে থাকে। খ. শেক্সপীয়রের নাটকে অভিনয় করতে থাকেন। এবং

গ. শেক্সপীয়রের নাটক বাঙলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম দু-ধরণের কাজের পরিচয় আমরা আগে নিয়েছি। এখন আমরা তৃতীয় প্রচেষ্টার কথা এখানে আলোচনা করবো।

এ দেশীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী সংস্পর্শের ঊষা লগ্নেই শেক্সপীয়র বাঙালীর মজ্জায় প্রবেশ করেছিলো। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীটা ইংরেজ কাটিয়েছে নানা ভাবে সাম্রাজ্য প্রসারের কাছে। এ দেশবাসীকে তাদের শাসন ও শোষণের 'একক' [unit] হিসেবে দেখেছে। অধিকন্তু প্রথম দিকে তারা এদের শিক্ষা-সংস্কার-ধর্ম বা জীবনাচরণে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করে আদৌ কোনো ঝামেলায় পড়তে চায় নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। ইংরেজ সম্পূর্ণ রূপে নিজের প্রয়োজনে নিজেদের জন্যে এখানে বিদ্যায়তন তৈরী করলো।[১] এবং কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রগতিশীল চিন্তাধারা সম্পন্ন কিছু স্বদেশীয় ও কিছু সহৃদয় ইংরেজ অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক ভাবে অনুধাবন করতে পারলেন যে ইংরেজী ভাষা-সাহিত্য শিক্ষা ও সার্বিক পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ ব্যতীত এদেশের আগামী নাগরিকগণের আত্মসম্মান, সমাজচেতনা, দেশপ্রীতি, ব্যক্তিচেতনা এবং সর্বোপরি বিস্ফারবোধের উন্মেষ ঘটবে না। তাই শতাব্দীর সূচনা দশকেই এদেশে প্রথাবদ্ধ ইংরেজী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হলো। এবং কিছু আগে থেকেই 'কল্লোলে কোলাহলে' ইংরেজীনবীশ হওয়ার যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিলো তা একটা শৃঙ্খলাগত শিক্ষাদান প্রণালীর মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে স্থিতরূপ গ্রহণ করতে থাকলো। এই ইংরেজী শিক্ষা ও তজ্জনিত নব্য-মানসিকতার সে এক বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস।

নতুন জিনিষের প্রতি শিশুসুলভ মাত্রাধিক আকর্ষণের মতো ইংরেজী শিক্ষিত সহরবাসী ভদ্র বাঙালী সব কিছুতেই ইংরেজ ও ইংরেজীর অনুকরণ করতে লাগলো। ফলে, অন্য সবকিছুর মতোই ঐ শতাব্দীর প্রায় প্রথম অর্ধেক-কাল শেক্সপীয়র নিজ মাতৃভাষাতেই আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে রইলেন। আমাদের 'বিলিতি ধরণে হাসি', 'সাহেবি রকমে হাঁটা' ও 'খাঁটি ইংরেজি স্পীচ'-এর মোহ কাটিয়ে 'মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে' এই সত্যটি যথার্থ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করে, এবং তারপর 'ভাষা পথ' খননি স্ববলে শেক্সপীয়র-রসের স্রোতকে এনে গৌড়জনের তৃষ্ণা মেটাবার চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগে আর হয়ে ওঠে নি।

এই কাজ যখন আরম্ভ হলো তখন থেকেই বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসের সূচনা। অন্যদিক থেকে যদি বলি যে শেক্সপীয়রের অনুসরণের বা অনুবাদের মধ্যে দিয়েই বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের শুভারম্ভ, তাহলে বোধহয় খুব একটা ভুল হবে না। এখানে শেক্সপীয়রকে অনুসরণের ঐ ইতিহাসকে অনুধাবন করে তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা তিনটি পথ দেখতে পাচ্ছি: ১. ভাবানুবাদ, ২. মূলানুবাদ এবং ৩. রূপান্তর। এবং ঐ পথে চলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এই পথগুলি বিপরীত মুখে অগ্রসর না হয়ে, পরস্পরের সাপেক্ষ-সঙ্গী হয়ে গেছে বহু ক্ষেত্রেই। অর্থাৎ ভাবানুবাদ, মূলানুবাদ বা রূপান্তরকে আমরা পৃথক ভাবে আলোচনা করতে চাই না। তার কারণ আমাদের অনুবাদকেরা বহুক্ষেত্রেই শেক্সপীয়রের নাটকের সারানুবাদ করেছেন, পাত্র-পাত্রী এমন কি নাটকের মূল নামটি পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অনেকে তাঁদের অনুবাদকর্মে যতখানি সম্ভব মূলানুসরণ করেও নাটকের কুশীলবের নাম ও পরিবেশের বঙ্গীয়-করণ ঘটিয়েছেন। ফলে এখানেও মূলানুগ অনুবাদের ব্যত্যয় ঘটেছে। এখানকার শেক্সপীয়রের অনুবাদকগণের ধারণাই এই যে: 'মনে করা যাক, ধুতি-পাঞ্জাবী পরে নায়ক রঙ্গমঞ্চে ওথেলো বা করিওলেনাসের মতো আস্ফালন করছে। তখন এই ধারণাই হবে, বাঙালী নায়ক যাত্রাদলের অভিনয় করে আসর মাতাচ্ছে। তাই .... বাঙলা নাটকে যেন বাঙলা দেশের আকাশের নীলিমা, বাঙলার মাটির সরসতা, বাঙালী জীবনের চিরন্তন রূপটুকু বিধৃত হয়'।[২]

এছাড়াও আর এক ভাবে শেক্সপীয়রের অমর নাটকগুলি অনূদিত হয়েছে; তা হচ্ছে নাটকগুলিকে নাট্যরূপে অনুবাদ না করে তাদের কাহিনীর সূত্র অনুসরণ করে সরল গদ্যে রূপান্তরিত করা। এই অনুবাদেও কেউ কেউ শেক্সপীয়রের নাটকের নাম, কুশীলবের নাম, স্থান-কাল ইত্যাদিকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন কেউ বা শেক্সপীয়রীয় কাহিনী-সারকে দেশীয় পোষাকে উপস্থিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে যেমন উল্লেখ করা যায় গুরুদাস হাজরা-কৃত 'রোমিও জুলিয়েতের মনোহর উপাখ্যান' [১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দ] এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'ভ্রান্তিবিলাস' [১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ]—'কমেডি অব এররস' অবলম্বনে অনুবাদ। আমরা এখানকার আলোচনায় এই ধরণের গল্পাকারে বা উপন্যাসাকারে অনুবাদের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে শেক্সপীয়রের নাটকগুলির যে সব নাটকাকারে অনুবাদ বা রূপান্তর ঘটানো হয়েছিলো তাদেরও

যথাসম্ভব পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করবো। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, আমাদের আলোচনার সব শেষে, পরিশিষ্টে, ইংরেজী ১৮০৯ সাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে ও রূপে শেক্সপীয়রের যে সমস্ত নাটক বাঙলায় অনূদিত হয়েছে তাদের সাধ্যমতো একটি পূর্ণ তালিকা করে দেওয়ারও চেষ্টা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেটি দেখে নিতে পারেন।

খ.

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ইতিহাস অনুসরণে বলা যায় যে বাঙলায় শেক্সপীয়র প্রথম অনূদিত হয়েছিলেন একজন ইংরেজের হাত দিয়ে। ইনি ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্মচারী এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র। তাঁর নাম মঙ্কটন। ইনি ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে শেক্সপীয়রের 'টেম্পেষ্ট' নাটকটিকে অনুবাদ করেন।[৩] রোবাকের 'এ্যানালস্ অব্ দি কলেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম' [১৮১১ খ্রীস্টাব্দ] গ্রন্থে এই অনুবাদ ও অনুবাদকের উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়,—তা ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

এর পর গুরুদাস হাজরা নামক একজন বঙ্গ সন্তান 'লেম্বসকৃত ইতিহাসের গ্রন্থ' অবলম্বনে শেক্সপীয়রের 'রোমিও এবং জুলিয়েটের মনোহর উপাখ্যান' নাম দিয়ে শেক্সপীয়রের ঐ নামীয় বিখ্যাত নাটকটিকে গদ্য ভাষায় এবং গল্পাকারে অনুবাদ করেন [১২৫৫ সাল বা ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দ]। এর আরও চার বছর পরে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ নামক জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ল্যাম্বস্ টেলস্ অনুসরণে 'অপূর্বোপাখ্যান' নাম দিয়ে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে [?] 'শেক্সপীয়রের নাটকের সারাংশ মাত্র রচনা করেছিলেন'।[৪] পরবর্তী বছরে [১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দ] বঙ্গীয় 'ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি'র পক্ষে এডওয়ার্ড রোয়ার [Edward Roer] 'মহাকবি সেক্সপীয়র প্রণীত নাটকের মর্মানুরূপ কতিপয় আখ্যায়িকা' বাঙলা গদ্যে রূপায়িত করেন।

এই সব অকিঞ্চিৎকর গল্প বা উপন্যাসসদৃশ শেক্সপীয়রের সারানুবাদ অতিক্রম করে বাঙলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে তন্নিষ্ঠ পূর্ণতা নিয়ে শেক্সপীয়রের অমর নাটক 'মার্চেন্ট অব্ ভেনিস্'-এর অনুবাদ করেন হরচন্দ্র ঘোষ [১৮১৭-৮৪]।[৫] তিনি তাঁর নাটকের বাঙলা নাম দিয়েছিলেন 'ভানুমতি চিত্তবিলাস'। এই অনুবাদকে মূলানুগ বলা যায় না; কারণ তিনি শেক্সপীয়র-অতিরিক্ত যেমন কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন,

তেমনি 'অঙ্গ' নামে নাটকের শেষে একটি নতুন দৃশ্য যোগ করে দিয়েছেন। গদ্যে-পদ্যে লেখা এই নাটকের পাত্র-পাত্রীর নামগুলি যেমন ভারতীয়' করেছেন, রচনা-সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্যে ভাব এবং ভাষাতেও বেশ কিছু পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। এত করেও কিন্তু 'নাটক হিসাবে বইটি একেবারে ব্যর্থ এবং পাঠ্য হিসাবেও সম্পূর্ণ অসার্থক। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে হরচন্দ্র বইটিকে অভিনেতব্য নাটক করিয়া লেখেন নাই, পাঠ্যপুস্তক করিয়া লিখিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, রচনা-সৌষ্ঠব ও কাহিনী-গৌরবের জন্য বইটি পাঠ্যপুস্তকরূপে সমাদৃত হইবে'।[৬] এই নাটকটি সম্পর্কে রেভারেণ্ড লং লিখেছিলেন যে: '··· Shakespeare's ideas, but given in a Bengali dress , well and ably done'.

এই নাটকের প্রারম্ভে নাট্যকার হরচন্দ্র ইংরেজীতে এবং বাঙলায় একটি করে মোট দুটি ভূমিকা লিখেছিলেন এবং তাতে অসঙ্কোচে তিনি বলেছিলেন যে এদেশীয়গণের স্বাদের উপযুক্ত করে কিছু স্বাধীনভাবেই শেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদ করেছেন। যেমন: 'I ·····undertook to write in the shape of a Bengali *Natuck* or drama taking only the plot and under-plots of *The Merchant of Venice* with considerable additions and alterations to suit the native test ; · · ·' একইভাবে তিনি বাঙলা ভূমিকাতেও তাঁর শেক্সপীয়র অনুবাদের উদ্দেশ্যটিকে ব্যক্ত করলেন: "এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থে ইংলণ্ডীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনের পরামর্শ ক্রমে আমি 'সেক্সপীয়র' নামক ইংলণ্ডীয় মহাকবির স্বনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক হইতে 'মার্চেণ্ট অফ ভিনিস' ইত্যভিধেয় অপূর্ব কাব্যের আনুপূর্বিক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম,·· ···যদ্যাপিও ইহাতে উল্লিখিত ইংরেজী কাব্যের আনুপূর্বিক অনুবাদ না হউক, তথাপি বর্ণিত মহাকবি সেক্সপীয়রের সদ্ভাবের বহুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্মগ্রহণ করিয়াছি; তবে বহুস্থানে মূল কাব্যের সহিত মিলন করিলে নিবর্তন পরিবর্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্তু তাহা সুহৃদ মহাশয়দিগের অবকাশ কালে গ্রন্থপাঠামোদের আনুকূল্য বিবেচনায় করা হইল।" এই সঙ্গে হরচন্দ্র তাঁর অনূদিত নাটকে পদ্যের স্থলে কেন গদ্য ব্যবহার করেছেন তারও কৈফিয়ৎ দিয়েছেন এই ভাবে: 'আধুনিক অধ্যাপক ও অধ্যাপিতদের পদ্য রচিত গ্রন্থে বিশিষ্ট রূপ অনুরাগ দৃষ্ট হয় না।···পদ্য-রচিত গ্রন্থে সম্প্রতি বিদ্যালয় সমূহের অনুরাগ মাত্র নাই।'

হরচন্দ্র তাঁর অনুবাদে শাইলকের ভারতীয় নামকরণ করেছিলেন 'লক্ষপতি', আর পোর্শিয়ার 'ভানুমতী'। এখানে কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য শাস্ত্রীবেশী 'ভানুমতী'-র সংলাপের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করি : 'হাঁ স্বচ্ছন্দে ছেদন কর, কিন্তু ছেদন করিবার পূর্বে এই দুই কথা মনে করিবা। প্রথম এই যে, তোমার খতপত্রে এই মাত্র নিয়ম আছে যে, নিয়মিতকালে ঋণ পরিশোধ না হইলে খাতকের বক্ষস্থলের নিকট হইতে অর্ধসের মাংস কাটিয়া লইবা, কিন্তু সরক্ত মাংস কাটিয়া লইবা এমত নিয়ম নাই।'

এর মধ্যে হরচন্দ্র একবার মহাভারতের কাহিনী-লোকে নাট্য-বিষয়বস্তুর সন্ধানে ঘুরে এলে পর তাঁর দ্বিতীয়-শেক্সপীয়র-অনুবাদ নাটকটি প্রকাশিত হলো। নাটকটির নাম 'চারুমুখচিত্তহরা নাটক', এবং এটি 'রোমিও জুলিয়েট'-এর দেশীয় সংস্করণ। এই নাটকের অনুবাদে লেখকের ভাষা অনেক সরল হয়ে এলেও তিনি সংস্কৃত নাটকের রীতি অর্থাৎ নান্দী, সূত্রধার, নর্তকী, নটী ইত্যাদির ব্যবহারকে ত্যাগ করতে পারেন নি। এবং আগের অনুবাদখানির সময় সেটি যাতে পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে গৃহীত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। কিন্তু তখন সেদিক থেকে ব্যর্থকাম হওয়ায় এবারের অনুবাদের সময়ে তার অভিনয়-যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখলেন। এ সম্পর্কে হরচন্দ্রের মন্তব্য : "Some time ago, I was desired by a learned friend of mine, ... to 'show *Romeo and Juliet* in an oriental dress'—'rich not gaudy.' It was also suggested that it should be rendered in the simplicity and elegance of colloquial language with the view to adopt the same more to the stage than to the study". কিন্তু নাট্যকারের এবারের চেষ্টাও ফললাভ করলো না। কারণ, ইতিমধ্যে রামনারায়ণ-দীনবন্ধু মধুসূদনের নাটক-প্রহসনের দ্বারা বাঙলা নাটকের-রূপ ও ভাষার আদর্শ প্রায় সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে এবং 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র মধ্যে দিয়ে বাঙলা কথ্য ভাষার শক্তি নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে, হরচন্দ্র একদিকে যেমন তাঁর নাট্য-সংলাপে কথ্য ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তেমনি আগের থেকে এ-নাটকে অনেকখানি মূলানুগ হওয়ারও চেষ্টা করেছেন। তথাপি লেখকের যশোভাগ্য অপরিবর্তিত রইলো।' 'হরচন্দ্রের রচনায় লালিত্য বা রস কোনটিই ছিল না'।[৭] এই অনুবাদে হরচন্দ্রের হাতে শেক্সপীয়রের রোমিও হয়েছেন ভোজবংশের

রাজা মহীশূরের পুত্র 'চারুমুখ' এবং জুলিয়েট হয়েছেন সিন্ধু বংশের রাজা অংশুমানের কন্যা 'চিত্তহরা'। এই চিত্তহরার মুখের ভাষা এ-রূপ :

> 'পিতঃ। আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে আমার যে পাপ হয়েছে, তারিজন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে গেছলেম। তপোধন বল্লেন যে, পিতার চরণে পড়ে ক্ষমা যাজ্ঞা কর। অতএব পিতঃ! আমি গলায় বস্ত্র দিয়ে বিনয় করে বল্‌চি, আমার সকল দোষ মার্জনা কর। আমি বুদ্ধিহীনা অবলা।'

এরপর শেক্সপীয়রের নাটকের যে উল্লেখযোগ্য অনুবাদকের নাম পাওয়া যাচ্ছে তিনি হচ্ছেন কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি শেক্সপীয়রের 'সিম্বেলিন' নাটকটি অবলম্বন করে তাঁর 'সুশীলা-বীরসিংহ নাটক' রচনা করেন। এটি ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের ২রা মার্চ প্রকাশিত হয়।[৮] কোনো রঙ্গমঞ্চে এটি অভিনীত হয়েছিলো বলে সংবাদ পাওয়া যায় না। নাটকটি মোট ১৬৮ পৃষ্ঠার এবং সব শেষে পৃথক পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করে তিন পৃষ্ঠায় নয়টি স্তবকের 'মনুষ্য-জীবন' নামে একটি কবিতা মুদ্রিত করা হয়েছে। পদ্যভাষা এবং প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটকটি লিখিত। নাটকটিতে একটি গান এবং কিছু ছোট ছোট কবিতা মুদ্রিত আছে। নাটক শেষ করে নাট্যকার সত্যেন্দ্রনাথ কবিতাকারে ভরতবাক্য উচ্চারণ করেছেন :

> 'হোন রাজা প্রকৃতি রঞ্জন
> প্রজা রাজভক্তিপরায়ণ
> আনন্দে মিলুক সর্বজন।……
> দ্বেষ হিংসা করি পরিহার,
> বিকশিয়ে প্রণয় উদার
> সুখ শান্তি করুক বিস্তার।'

এই একই বছরের ১৯শে জুন তারিখে জনৈক চন্দ্রকালী ঘোষ শেক্সপীয়রের ঐ একই নাটক অনুবাদ করেন 'কুসুমকুমারী নাটক' নাম পরিচয়ে। নাট্যকার কালীকৃষ্ণ দেবের অনুরোধে 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী'র জন্যে নাটকটি অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদ যে বিশ্বস্তভাবে মূলকে অনুসরণ করেছিলো তেমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তবে লেখকের অনুবাদ যে সরস ও আকর্ষণীয় হয়েছিলো তা মধুসূদন সান্যালের বাটীস্থ 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র [১৮৭৪-এর ১৭ই জানুয়ারী] এবং 'গ্রেট ন্যাশনাল

থিয়েটারে' [১৮৭৪-এর ২৫ই এপ্রিল] কয়েকবার অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে।

এর কিছুদিন পরে শেক্সপীয়রের আর একটি বিখ্যাত নাটক 'ম্যাকবেথ' বাঙলায় অনুবাদ করেন সেদিনের অন্যতম প্রখ্যাত নাট্যকার হরলাল রায়। তিনি তাঁর ঐ অনূদিত নাটকের নাম দেন 'রুদ্রপাল নাটক' [১৫ অক্টোবর ১৮৭৪]। হরলাল যে পাঁচখানি নাটক লিখেছিলেন তাদের অনেকবার করে সেদিনের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে দেখা যায়; এর মধ্যে 'রুদ্রপাল' এক মাসের মধ্যে দু-বার [৩১শে অক্টোবর এবং ২৮শে নভেম্বর ১৮৭৪] 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' অভিনীত হয়েছে। এক অনুবাদ নাটকের এই সৌভাগ্য দেখে মনে হয় যে, প্রথমত, শেক্সপীয়র সেদিনের বাঙালী-রুচিতে কতখানি প্রীতিপ্রদই না ছিলো এবং দ্বিতীয়তঃ হরলালের অনুবাদে মৌলিকতা ও সরসতা অবশ্যই ছিলো। অধিকন্তু হরলাল তাঁর নাটকের নামকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে যে কেবল বঙ্গীয়-করণ করেছেন তাই নয়, অন্তঃকরণেও বাঙালীত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। যেমন, ম্যাকবেথের বিখ্যাত 'টু-মরো এণ্ড টু-মরো' .... স্বগতোক্তিকে হরলাল এইভাবে অনুবাদ করেছেন: 'যম যে মানুষের চুল ধরে টেনে নে যাচ্ছে, এ কেউ ভাবে না। মানুষ সজীব ছায়া মাত্র। দুদিনের জন্য কেবল লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে মরছে। জীবন অসার, অপদার্থ, শীঘ্র নির্বাণ হোক।'

এরই সঙ্গে আমাদের স্মরণে আসছে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [১৮২০-১৮৯১]-কৃত শেক্সপীয়রের অমর নাটক 'কমেডি অব এররস্' অবলম্বনে রচিত 'ভ্রান্তিবিলাস' [১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দ] নামক গ্রন্থটির কথা। একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকেও শেক্সপীয়রের অমর প্রতিভা সেদিন কি ভাবে আকর্ষণ করেছিলো তা তাঁর অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকাতেই তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন [আমরা এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট'-এ সেই ভূমিকাটি আদ্যন্ত উদ্ধৃত করেছি]। কিন্তু কেবল এই অনুবাদই নয়, শেক্সপীয়র সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ ছিলো আরো আন্তরিক ও গভীর। কেন না চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী নাম্নী প্রথম দুই বাঙালী মহিলা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করলে তিনি উৎফুল্ল হয়ে তাঁদের শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়েছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ করে তাঁর কাছে দেখাতে নিয়ে গেলে তিনি তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন সে সংবাদও রবীন্দ্র-জীবনীর পাঠক মাত্রেই জানেন।

১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দেই চৌদ্দ বছর বয়স পূর্ণ হয়নি এমন যে কিশোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১-১৯৪১] 'ম্যাকবেথ' নাটক বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন: "আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের যুবকপুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য.. গৃহশিক্ষক হইলেন।......জ্ঞানচন্দ্র আসিয়া..... ইংরেজিতে শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটক পড়ানো শুরু করিলেন। বলাবাহুল্য বালকের সম্মুখে নতুন জগৎ উদ্‌ঘাটিত করিল......কিন্তু জ্ঞানচন্দ্র কেবল পড়াইয়া ক্ষান্ত হইতেন না, যাহা পড়াইতেন তাহা বালককে দিয়া লিখাইয়া লইতেন। ম্যাকবেথ নাটকখানিও এইভাবে সম্পূর্ণরূপে তর্জমা হইয়া যায়। কবি লিখিয়াছেন, 'তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাঙলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাঙলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল।......সেই অনুবাদের [ম্যাকবেথের] আর সকল অংশই হারাইয়া গিয়াছিল কেবল ডাকিনীদের অংশটা অনেকদিন পরে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল'।"[৯]

কিশোর রবীন্দ্রনাথের শেক্সপীয়রের এই অনুবাদ রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সেদিনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভালো লেগেছিলো, তাঁরা তাঁকে উৎসাহিত ও প্রশংসিত করেছিলেন এবং অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দ প্রয়োগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মার্জনার উপদেশ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে উপদেশ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি।[১০]

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৩৮-১৯০৩]-কৃত শেক্সপীয়রের দুটি বিখ্যাত নাটক 'টেম্পেষ্ট' এবং 'রোমিও জুলিয়েট'-এর অনুসরণে বাঙলা অনুবাদের কথা এবারে আমরা উল্লেখ করতে পারি। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'টেম্পেষ্ট' নাটকটির বাঙলা নামকরণ করেন 'নলিনী-বসন্ত নাটক' [১৮৬৮, ১৪ই সেপ্টেম্বর]। এবং 'রোমিও জুলিয়েট'-এর [১৮৯৫, ২০ জুলাই] আর কোনো বাঙলা নামকরণ করা হয় নি।

প্রথমেই হেমচন্দ্রের 'নলিনী-বসন্ত নাটকে'র আখ্যাপত্রে শেক্সপীয়র বন্দনা ইংরেজী এবং বাঙলাতে এই ভাবে পাচ্ছি: 'Sweetest Shakespeare, Fancy's child. / Warbling his native wood-notes wild' এবং 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।' কবি নাটকীয়

ঘটনা-সংস্থান এবং কুশীলবের নামকরণে ভারতীয়ত্ব সৃষ্টি করে প্রস্তাবনায় লিখেছেন :

'বৈজয়ন্ত নামে রাজা কঙ্কন ভূপতি
নিরবধি যাদুবিদ্যা করি আলোচনা।
হারাইল রাজ্য দেশ ভ্রাতার কপটে,
ভাসিয়া সাগরনীরে, অরণ্য পুলিনে,
বালিকা কন্যার সহ দ্বাদশ বৎসর,
করিল অজ্ঞাত বাস, পড়িয়া বিপাকে,
পরে কুহকের শক্তি প্রকাশি অসীম
বিপক্ষ দমন করি ফিরিল স্বদেশে
এ আখ্যান চমৎকার শুন মন দিয়া
শুনিলে কৌতুক হবে চিত্ত বিনোদিয়া ॥'

অথচ শেক্সপীয়রে 'এপিলোগ' আছে, প্রথমে কোনো প্রস্তাবনা নেই। অপর পক্ষে, মিরান্দা হয়েছে নলিনী, পিতা প্রস্পারো বৈজয়ন্ত, এবং এরিয়েল সুমালী। তিনি সংস্কৃত নাট্যাঙ্গিকের প্রভাবকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। এইভাবে স্বাধীন পাদচারণার সঙ্গে যথাসম্ভব মূলানুগত্য কোথাও কোথাও বজায় রাখলেও "অনুবাদ হিসাবে 'নলিনী বসন্ত'-কে ব্যর্থ বলিতে হয়,"—কারণ, ক. এতে উনিশ শতকের জনজীবনের প্রতিচ্ছবি অহেতুক ভাবে প্রবেশ করে রসবিপর্যয় ঘটিয়েছে, খ. সংলাপ রচনায় নাট্যকারের মাত্রাজ্ঞানের অভাব সূচিত হওয়ায় শেক্সপীয়রীয় ক্ল্যাসিকের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে, গ. গান রচনাতেও রয়েছে অসঙ্গতি, এবং ঘ. সংলাপে ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর না গদ্য, না পদ্য মাঝ-চেহারায় হাস্যকর রূপ ধারণ করেছে।

হেমচন্দ্রের পরবর্তী অনুবাদ 'রোমিও জুলিয়েত'। এই অনুবাদগ্রন্থের আখ্যা-পত্রে দেখতে পাচ্ছি :

রোমিও জুলিয়েত [ছায়া]
'বাণী বর-পুত্র তুমি, দেব-অবতার।
ক্ষম অপরাধ, পদ পরশি তোমার ॥'

এরপরে ভূমিকায় গ্রন্থকার হেমচন্দ্র লিখেছেন : "এই পুস্তকখানি শেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েত' নামক নাটকের ছায়া মাত্র, তাহার অনুবাদ নহে।...... কোন কোন স্থান পরিত্যাগ বা পরিবর্তন করিয়াছি, কোথাও দু-একটি নূতন

গর্ভাঙ্কও সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষদিগের নাম ও কথাবার্তা দেশীয় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু প্রধান প্রধান নায়ক, নায়িকাগণ ও তাহাদের চিত্ত বা চরিত্রগত ভাব, মূলে যেখানে যেরূপ আছে সেই রূপ রাখিতেই যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ফলতঃ শেক্সপীয়রের নাটকের গল্পের ও তাহার প্রধান প্রধান নায়ক-নায়িকাদিগের চরিত্রের সারাংশ লইয়া তাহা দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া স্বদেশী পাঠকের রুচিসঙ্গত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

"আমার ধারণা এই যে, এইরূপ কোনও প্রণালী অবলম্বন না করিলে কোন বিদেশীয় নাটক বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারিবে না; এবং তাহা না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুষ্টিলাভ ও প্রকৃতিগত উন্নতি হইবে না।"

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি শেক্সপীয়রের নাটকে কোলকাতার গড়ের মাঠেরও উল্লেখ করেছেন নির্বিচারে। ফলে গ্রন্থকারের এতবড় সাধু উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গেছে। কারণ, 'চরিত্রের মধ্যে বাঙালীচরিত্রের আমদানিতেই নাটকের নাটকত্ব বুঝা যায়। অনুবাদ মানে হত্যা নহে। রোমিওর সহিত ভূতোর বাপকে একাসনে বসাইয়া হেমচন্দ্র শেক্সপীয়রকে হত্যা করিয়াছেন। নাট্যকার অবশ্য পাশ্চাত্ত্য বস্তু প্রাচ্য ঢঙে সাজাইয়া দেশবাসীর হৃদয়ঙ্গম করাইতে চাহিয়াছিলেন।'[১১] কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুই হয়ে ওঠেনি; বা এ বিষয়ে কিছু একটা করে তোলার ক্ষমতাও বোধহয় হেমচন্দ্রের ছিলো না।

এইবার উল্লেখ করতে হয় শতাব্দীর একেবারে শেষে [৬ই মে, ১৮৯৬] অন্যতম বিশিষ্ট শেক্সপীয়রের অনুবাদ নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর [অথবা, নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী (?)] 'হরিরাজ' ['হ্যামলেট']-এর। কোনো কোনো নাট্য-গবেষক এই অনুবাদটিকে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত [১৮৭৬-১৯১৬]-কৃত বলে উল্লেখ করেছেন।[১২] কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ, প্রথমত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে [১৯২ পৃষ্ঠা] বলেছেন: "'হরিরাজ' নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর রচনা, ইহা 'অমর গ্রন্থাবলীর'-র অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হয় নাই।" দ্বিতীয়ত, 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থের [১৩৪৮] লেখক শ্রীরমাপতি দত্ত লিখেছেন: 'স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী শেক্সপীয়ারের হ্যামলেটের অনুসরণে হরিরাজ নামে এক পঞ্চাঙ্ক নাটক প্রণয়ন করেন। শোনা যায়, প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রথমে এই নাটকের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ সেই নাটকের সমস্ত ও সর্বপ্রকার স্বত্ব কিনিয়া লইয়া, রঙ্গমঞ্চোপ-যোগী করিবার জন্য তাহার যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করিয়া, নিজের থিয়েটারে উহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন' [পৃষ্ঠা ১৫০]।[১৩] তৃতীয়ত, "নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'হরিরাজ' নাটক শেক্সপীয়রের হ্যামলেট অবলম্বনে লেখা। কাহিনী সম্ভবত নগেন্দ্রনাথ বসুর পরিকল্পনা। [কারণ] নগেন্দ্রনাথ বসু ম্যাকবেথ অবলম্বনে 'কর্ণবীর' [১৮৮৫] লিখিয়াছিলেন।"[১৪]

যাই হোক, সাক্ষ্য-প্রমাণ কোনো সংশয় রাখে না যে, 'হরিরাজ' নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক শেক্সপীয়রের বিখ্যাত 'হ্যামলেট'-এর অনুবাদ না হলেও ভাবানুবাদ অবশ্যই। যদিও চরিত্র সৃষ্টিতে, দৃশ্য সংস্থানে, কাহিনী রূপান্তরে নাট্যকার অনেক নতুনত্ব এনেছেন। যেমন, হরিরাজের ভগিনী সুরমা, জয়াকর অর্থাৎ ক্লডিয়াসের স্ত্রী মলিনা, হরিরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী এক বিদূষক ব্রাহ্মণ দধিমুখ প্রভৃতি নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি। 'হ্যামলেট'-এর অঙ্ক ও দৃশ্যগুলিকে ভেঙে নাট্যকার নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন। হ্যামলেটের পিতার হত্যাকারী তার কাকা। এখানে হরিরাজের পিতার হত্যাকারী ডেনমার্কের রাজার স্থানে কাশ্মীরের প্রধান সেনাপতি জয়াকর। হ্যামলেটের পিতার মৃত্যুর জন্য তার মা সক্রিয়ভাবে দায়ী ছিলেন না; এখানে কিন্তু জয়াকর ও শ্রীলেখা [হরিরাজের মা] দুজনেই কাশ্মীররাজের মৃত্যু ঘটিয়েছেন। শেক্সপীয়রের হ্যামলেটের একটি গানের জায়গায় 'হরিরাজ'-এ গান যোগ হয়েছে মোট এগারটি। সংলাপ রচনায় নাট্যকার বিশেষ ভাবে ভাঙা গৈরিশছন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এরই সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 'জনা' [১৮৯৪] নাটকের প্রভাব নানা দিক থেকে এর ওপর এসে পড়েছে।[১৫] এখানে 'হ্যামলেট' নাটকের ৩য় অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্যে হ্যামলেট যেখানে পিতার আলেখ্য মা-এর সামনে ধরে তাঁকে তিরস্কার করছে সেই অংশের অনুবাদ থেকে কিছু উদ্ধৃতি নেওয়া যেতে পারে। এখানে হরিরাজ বলছে :

> 'কোথাও যাও! দেখ চিত্র অতীব সুন্দর!
> কি বিশাল ঠাট, প্রশস্ত ললাট,
> ভ্রূযুগল বাসবের চাপ সম।
> পূর্ণজ্যোতি আকর্ণ নয়ন,
> নাসিকা গঠন—খগরাজে দিয়ে লাজ।
> আজানুলম্বিত বাহু সুললিত,
> শরাসন-করে-কার্তিকেয় পরাজয়।

সুবিশাল হের বক্ষঃস্থল,
হেরি রিপুদল কাঁপিত সভয়ে,
ভীতমনে মানিত শাসন!
এই জন ছিল তব স্বামী!
জ্ঞানচক্ষু কর উন্মীলন,
হের অন্য জন ভিক্ষা-অন্নে পালিত কুক্কুরে।
হিংসাভরে কুঞ্চিত ললাট
ভ্রূভঙ্গেতে কুৎসিত আচার ভাষে,
আঁখি পাশে নরকের ছায়া,
দয়া মায়া ভয়ে করে পলায়ন!
হেন জন বিলাসের কীট তব!
মাতা! গজমতি দলি পদতলে
কাচখণ্ডে কৈলে আকিঞ্চন!'

এই অনুবাদ কোন কোন জায়গায় মূলানুগ এবং সরস হয়েছে। অনুবাদকের কৃতিত্ব বোঝাবার জন্যে আমরা আরো একটু উদাহরণ দেবো; তাই 'হ্যামলেট'-এর তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের বিখ্যাত স্বগতোক্তিটির প্রথমে মূল এবং তার পরে অনুবাদের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হলো:

Ham. To be, or not to be—that is the questions ;
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them ? To die, to sleep—
No more ; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to. 'Tis a consummation
Devoutly to be wish'd To die, to sleep ;
To sleep, perchance to dream. Ay, there's the rub ;
For in that sleep of death what dreams may come.

এর বাঙলা করা হয়েছে এইভাবে:

'হরিরাজ। জীবনধারণ কিম্বা প্রাণবিসর্জন
কিবা প্রয়োজন, চাহে মন জানিবারে।
আবরি হৃদয় নিজ চির অন্ধকারে।
পন্থাহারা হয়ে রব অলক্ষ্য প্রদেশে ;
অথবা সংগ্রাম করি ঝঞ্ঝাবায়ু সনে
ফুৎকারেতে উড়াইব নিবিড় তামসী ;
সুষুপ্তি নিবৃত্তি সম শক্তি ধরে দোঁহে
বিস্মৃতি বিস্মৃতি নিয়ে আসে।
ধুয়ে দেয় হৃদয়ের কালি
সুখের চরম সীমা দুঃখের জীবনে।
চাহে প্রাণ নিদ্রা বা মরণ।
কিন্তু এক ভাবনা বিষম
শয়নে স্বপনে নিয়ে আসে
ত্রাসে প্রাণ শিহরি চমকে।
কেবা জানে,
কোন স্বপ্ন দেখা দিবে অনন্ত নিদ্রায়।'

এখানে অর্থ বা ভাবানুগত্য অনেকখানি যথার্থ। এভাবে কিছু নিষ্ঠার সঙ্গে মূল নাটক অনুসরণ ও কিছু মৌলিকতার সাহায্যে রচিত 'হরিরাজ' মূলত অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিনয়-প্রতিভার মাধ্যমে সেদিনের বঙ্গরঙ্গমঞ্চে বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলো।

পরে, একেবারে নতুন শতাব্দীর সূচনায় অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২ অগাষ্ট শেক্সপীয়রের যে নাটকটি বিশেষ নিষ্ঠা ও মূলানুগভাবে, অনূদিত হয়েছিলো তা হচ্ছে 'ম্যাকবেথ'। এতে মূলের রস ও ভাব-গাম্ভীর্যও বজায় ছিলো যথেষ্ট পরিমাণেই। 'ম্যাকবেথ' নামেই এটি অনুবাদ করেছিলেন প্রখ্যাত নট-নাট্যকার ও নাট্যপ্রযোজক গিরিশচন্দ্র ঘোষ [১৮৪৪-১৯১২]। গিরিশচন্দ্র এই অনুবাদ-কর্মে মূলকে একান্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে অনুসরণ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো কোনো নাট্য-সমালোচক মন্তব্য করেছেন : "'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ বাঙলা অনুবাদ নাটকের আদর্শ স্থানীয়। ইহাতে আগাগোড়া গিরিশচন্দ্র ম্যাকবেথের সংলাপের যথাযথ অনুবাদ করিয়াছেন। এমন কি মূলের যে অঙ্কের যে যে দৃশ্যে যে সকল চরিত্র প্রবেশ ও প্রস্থান করিয়াছে, এবং

যে সকল কথা বলিয়াছে, অনুবাদে গিরিশচন্দ্র তাহাই হুবহু অনুসরণ করিয়াছেন কোথাও অন্যথা নাই।"[১৬] যেমন, লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যুর পর ম্যাকবেথের সেই বিখ্যাত স্বগতোক্তি :

'To morrow, and to-morrow, and to-morrow
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time,
And all our yesterdays have lighted fools.
The way to dusty death. Out, Out, brief candle !
Life's but a walking shadow .....' [5. V.]

এর অনুবাদে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

'কল্য-কল্য-কল্য
চলে ধীর পদে দিন দিন
হয় লয় নির্ণীত সময়ে
প্রারব্ধ লিপির শেষাক্ষরে
গতকল্য একত্র হইয়ে
ল'য়ে যায় পথ দেখাইয়ে ;
মিশাইতে শ্মশান ধূলায়।
নিভে যা, নিভে যা ওরে ক্ষণস্থায়ী দীপ।
চলচ্ছায়া মাত্র এ জীবন ; ....'

কিন্তু এত সব আয়োজন ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র সেদিনের দর্শকদের রুচিসুখকরতার জন্যে তাঁর অনুবাদে শেক্সপীয়রীয় ট্রাজিডির পক্ষে গাম্ভীর্যহানিকর 'সখীদের গান' ব্যবহার করেছেন ; তাও আবার এক আধখানা নয়, পাঁচ পাঁচখানা। এই সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছেন 'অপরাপর ডাকিনীগণের প্রবেশ ও গীত'-এর মধ্যে দিয়ে। এই ত্রুটি ছাড়া গিরিশচন্দ্রের 'ম্যাকবেথ' আজও শেক্সপীয়র অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী-রহিত।

রবীন্দ্রাগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্য-রচনার ক্ষেত্রে যেমন শেক্সপীয়রের দ্বারা নানা ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনি শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকটিকে ঐ নামে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এই অনুবাদটি সে সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিলো। এবং ১৮৭২ সাল থেকে তাঁর নাট্য-রচনা প্রচেষ্টার যে সূত্রপাত হয়েছিলো এই নাটকটির

মধ্যে দিয়ে তাকে অবসিত হয়ে দেখছি। সে কারণে এই অনুবাদটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী। এখানে তাঁর সেই অনুবাদের কিছু অংশ উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত হতে পারে। যেমন, সীজারের হত্যার পর অ্যাণ্টনির উক্তি :

'Friends, Romans, countrymen, lend me your ears ;
I come to bury Caesar, not to praise him.
The evil that men do lives after them ;
The good is oft interred with their bones ;
So let it be with Caesar.' [3. II.]

এর অনুবাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ করেছেন এই ভাবে :

'বন্ধুগণ ! ভ্রাতৃগণ ! কৃপা করি কর অবধান।
আসিয়াছি আমি হেথা সীজারের অন্ত্যেষ্টির তরে ;
নহে স্মৃতির উদ্দেশ্যে ; মানুষের যা কিছু দুষ্কৃতি
থাকি যায় পরে ; কিন্তু যাহা কিছু সুকৃতি তাহার
বিলীন হইয়া যায় চিতাভস্মে তার সাথে সাথে।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় কাব্যধারার অন্যতম উল্লেখ্য কবি নবীনচন্দ্র সেন [১৮৪৭-১৯০৯] শেক্সপীয়রের 'এ মিড্-সামার নাইট'স্ ড্রিম'-এর অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ সম্পর্কে নবীনচন্দ্র এক পত্রে [১৮।৪।১৮৮৯] ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লিখছেন : "আমার কাছে, বহুদিনের রোগ শয্যায় অনুবাদিত *Midsummer Night's Dream* আছে। তুমি যদি চাহ, বরং তাহা পাঠাইয়া দি। ইহা 'মালঞ্চে'র উপযোগী হইতে পারে। অনুবাদ শেষ হয় নাই। তবে যাহা হইয়াছে, তাহা ছাপিতে ছাপিতে অবশিষ্ট শেষ করিয়া দিতে পারিব। তবে সবটা তোমাকে revise করিতে হইবে। সে সময় কি প্রবৃত্তি আমার নাই।" এর দিন বারো বাদে এই অনুবাদ সম্পর্কে আর এক পত্রে আবার ঐ ঠাকুরদাসবাবুকে লেখেন [১।৫।১৮৮৯] : "আজ *Midsummer Night's Dream* যতদূর অনুবাদিত আছে, পাঠালাম। নাম 'অপূর্ব স্বপ্ন' কি 'নৈদাঘ নিশীথ স্বপ্ন' যাহা ভাল বুঝেন দেবেন। আর প্রত্যেকবার proof দেখিবার সময় বেশ করিয়া সব সংশোধন করিয়া দিতে হইবে ; বড় তাড়াতাড়ি লেখা। যখন চাকরী যায়-যায় হইয়াছে, মাথার উপর ঝড় বজ্র গর্জন করিতেছে—রোগে শয্যাশায়ী সেই গভীর মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা ভুলিবার জন্য শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া

এই অনুবাদ করি। এরূপ একটী সূচনা দিয়া ছাপিতে আরম্ভ করিবেন। আমার নাম দিবেন না।"

এই অনুবাদ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: "শেক্সপীয়রের *A Midsummer Night's Dream*-এর মর্মানুবাদ। ইহার ১ম অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্ক পর্যন্ত, প্রথমে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মালঞ্চের' ২য় বর্ষ, ১ম-২য় যুগ্ম সংখ্যায় [পৌষ-মাঘ ১২৯৬] প্রকাশিত হয়। ১৩০১ সালের পাক্ষিক 'অনুসন্ধানে'ও [সম্পাদক : দুর্গাদাস লাহিড়ী] ইহার কিয়দংশ প্রকাশিত হয়।"[১৭] এর প্রায় ষোল বছর পরে 'মানসী' পত্রিকার ১৩১৭-১৯ সালের ২য়-৪র্থ বর্ষের কয়েকটি সংখ্যায় ছাড়া ছাড়া ভাবে 'নৈদাঘ-নিশীথ স্বপ্ন' নাম দিয়ে নাটকটির টুকরা টুকরা অংশ মাত্র অনুবাদ হয়। অসমাপ্ত বলেই এটি কোন পুস্তকে সংবদ্ধ হতে পারে নি। তবে 'নবীনচন্দ্র রচনাবলী' [কলিকাতা ১৩৮২] নামক সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডে জনৈক মোহিতলাল লাহিড়ী কর্তৃক বাকী অংশ অনূদিত হয়ে গ্রন্থটিকে মুদ্রিত হতে দেখছি। কিন্তু সে যাই হোক, নবীনচন্দ্র যতটুকু অনুবাদ করেছেন তাতে তিনি শেক্সপীয়রের নাট্য-কাহিনী ও পরিবেশকে বঙ্গীয়-করণে যথেষ্ট স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন। এখন ভালো-মন্দ বিচারের জন্যে নবীনচন্দ্রের অনুবাদের কিছু অংশ মূলের পাশাপাশি উদ্ধৃত করে কবির অনুবাদ-শক্তি সম্বন্ধে কি ধারণা করা যায় দেখি :

ACT ONE

SCENE 1. *Athens. The Palace of Theseus.*

Enter Theseus, Hippolyta, Philostrate *and* Attendants

The. Now, fair Hippolyta, our nuptial hour
Draws on apace ; four happy days bring in
Another moon ; but, O, methinks, how slow
This old moon wanes ! She lingers my desires,
Like to a step-dame or a dowager,
Long withering out a young man's revenue.
Hip. Four days will quickly steep themselves in night ;
Four nights will quickly dream away the time ;

And then the moon, like to a silver bow
New-bent in heaven, shall behold the night
of our solemnities.

The. Go, Philostrate,
Stir up the Athenian youth to merriments ;
Awake the pert and nimble spirit of mirth ;
Turn melancholy forth to funerals ;
The pale companion is not for our pomp.

[*Exit Philostrate.*

Hippolyta, I woo'd thee with my sword,
And won thy love doing thee injuries ;
But I will wed thee in another key,
With pomp, with triumph, and with revelling.

অনুবাদক নবীনচন্দ্রের লেখনীতে এটি এই রকম হয়েছে :

প্রথম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৈজয়ন্তীনগর-রাজবাটী

[সুরেশ্বর, হেমলতা, ফুলেশ্বর এবং পরিচারকবর্গের প্রবেশ]

সুরেশ্বর। দেখ প্রিয়ে হেমলতে! শুভ বিভাবরী
আসিয়াছে বিজলীবেগে ; চারি দিন আর,
উদিবে নবীনচন্দ্র, চারি দিন আর,
তবু মনে হয় কত ধীরে ধীরে যেন
হইতেছে কলাহীন ওই ক্ষীণ শশী।
বিলম্বে বাসনা প্রিয়ে, বাড়িছে কেবল।

হেমলতা। চারিদিন, প্রিয়তমে, নিবিবে সহসা
নিশিকোলে ; চারি নিশি পোহাবে স্বপনে,
তখন দেখিবে শশী-রজতের ধনু
নব-নব, আমাদের বিবাহ-বিলাসে।

সুরেশ্বর। যাও ফুলেশ্বর!
ভাসাও গে রাজধানী আমোদ-সাগরে;
জাগাও গে আনন্দের মৃদুল লহরী,
বিষাদে পাঠাও বনে, অথবা শ্মশানে,
যেন কালছায়া তার না দেখি নয়নে!

[ফুলেশ্বরের প্রস্থান।

হেমলতে, বীরবেগে সক্লপাণ করে,
লভিয়াছিলাম আমি তোমার প্রণয়,
কিন্তু তব পরিণয়, বিলাসীর বেশে
লভিব, কুসুম দামে, আনন্দ উৎসবে'।

এই মূলানুগ পদ্য-সংলাপ ব্যবহারের পর ঐ একই নাটকের অন্যত্র নবীনচন্দ্র কথ্য ভাষারও ব্যবহার করেছেন। তিনি বটম, কুইন্‌স, ফ্লুট প্রভৃতির নামকরণ করেছেন কানাই, ভূতো, ছিরে, রামা, তিনু ও পাঁচু। এদের সংলাপের কিছু উদাহরণ:

'কানাই। বা! বা! কি মজার মুজরার স্থান হয়েছে। এই খোলা জায়গাটা হবে আমাদের 'এছটেজ্' আর এই জঙ্গলটি হবে 'গ্রীণ রুম'। রাজার কাছে যে রকম করে দেখাতে হবে, আজ এখানেও সেইরূপ পূরা মুজরা করতে হবে।······

ছিরে। [আওড়ানো] বীরবর ইন্দ্রজিৎ দূর্বাদলশ্যাম,
প্রেমের পোলাও তুমি রস-ঘৃতে মাখা,
ক্লান্তিহীন প্রেম তব, হায় মরি যেন
ভাড়াটে গাড়ীর যুগ্ম অশ্বিনীকুমার।
মিলিব দুজনে শালা মন্দির-সমীপে।'

কানাই হলো মূল নাটকের কুইন্স, আর ছিরে হচ্ছে ফ্লুট। তারা এই রকম ভাবেই মূল-এ কথা বলেছিলো:

Quin. Pat Pat; and here's a marvellous convenient place for our rehearsal. This green plot shall be our stage, this hawthorn brake our tiring-house; and we will do it in action, as we will do it before the Duke.·········

Flu. [*Thisby*] *Most radiant Pyramus, most lilywhite of hue,*
Of colour like the red rose on triumphant brier,
Most brisky juvenal, and eke most lovely Jew,
As true as truest horse, that yet would never tire,
I'll meet thee, Pyramus, at Ninny's tomb. [*3. i.*]

এইসব অনুবাদ এবং অনুসরণাদির আলোচনা ও তথ্য-সংগ্রহ প্রসঙ্গে শেক্সপীয়রের অনুবাদকর্মের সঙ্গে যুক্ত আরো তিনজনের পরিচয় এখানে গ্রহণ করা প্রয়োজন। এঁদের মধ্যে প্রথমজন উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ-ক্ষণে শেক্সপীয়রের নাটকগুলির অনুবাদ করেন এবং অন্য দু-জন এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সেই কাজে শক্তিনিয়োগ করেছিলেন। প্রথমজনের নাম হারাণচন্দ্র রক্ষিত [১৮৬৪-১৯২৬]। তিনি তাঁর শেক্সপীয়র অনুবাদ বারো খণ্ডে শেষ করেন [১৮৯৬-১৯০৩]। এর মধ্যে 'রোমিও এণ্ড জুলিয়েট' এবং 'ওথেলো'-র অনুবাদ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলো। হারাণচন্দ্র কেবল 'ওথেলো'-র অনুবাদই করেন নি, ভূমিকায় শেক্সপীয়রের নাট্য-কৃতির সমালোচনাও করেছেন। যেমন : "মহাকবি শেক্সপীয়রের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইউরোপীয় সাহিত্য-সমাজে পর্যাপ্ত পরিমাণে শেক্সপীয়রের আদর ও প্রতিপত্তি হইয়াছে। শেক্সপীয়র ইংলণ্ডের কবি হইলেও সমগ্র ইউরোপ তাঁহাকে 'আপনার জন' মনে করেন। শুধু ইউরোপই বা কেন, আমেরিকায়ও শেক্সপীয়রের প্রসার ও প্রতিপত্তি কম নহে। ঐ দুই মহাদেশে, মহাকবি শেক্সপীয়র দেবতার ন্যায় পূজিত হন। আধুনিক সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান সমুন্নত সভ্য দেশে প্রায় অর্ধ পৃথিবী ব্যাপিয়া যিনি দেবরূপে পূজা পান, তিনি যে 'জগতের কবি, রূপে সর্বজন-বন্দনীয় হইবেন তাহার আর কথা কি ?"

এছাড়াও তিনি তাঁর শেক্সপীয়র অনুবাদ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে : 'মহাকবির সেই অপূর্ব নাটকাবলীর মর্মানুবাদ আমি উপন্যাসাকারে গ্রথিত করিয়াছি'। এখানে আমরা তাঁর অনূদিত 'হ্যামলেট'-এর ৩য় অঙ্ক ১ম দৃশ্যের মূল ইংরেজীকে পাশে রেখে বঙ্গানুবাদ থেকে কিছু উদাহরণ দেবো :

Oph. Good my lord,
How does your honour for this many a day ?
Ham. I humbly thank you ; well, well, well.
Oph. My lord, I have remembrances of yours

That I have longed long to re-deliver.
I pray you now receive them.

Ham. No, not I;
I never gave you aught.

Oph. My honour'd lord, you know right well you did,
And with them words of so sweet breath compos'd
As made the things more rich; their perhume lost,
Take these again; for to the noble mind
Rich gifts wax poor when givers prove unkind.
There, my lord.

Ham. Ha, ha! Are you honest?

Oph. My lord?

Ham. Are you fair?

Oph. What means your lordship?

Ham. That if you be honest and fair, your honesty should admit no discourse to your beauty.

Oph. Could beauty, my lord, have better commerce than with honesty?

হারাণচন্দ্র উক্ত অংশটিকে বাঙলায় এইভাবে রূপান্তরিত করেছেন:

'ওফিলিয়া। [স্বগত] হায় কি বিষাদ মলিন মূর্তি! [প্রকাশ্যে] আপনি এতদিন কেমন ছিলেন?

হ্যামলেট। এই প্রশ্নে আমি তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি; —আমি বেশ ছিলাম।

ওফিলিয়া। আপনি আমাকে অনেক প্রণয়োপহার দিয়াছেন। সেগুলি অনেক দিন হইতে ফিরাইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছি;—এক্ষণে তাহা গ্রহণ করুন।

হ্যামলেট। কৈ, না—আমি ত তোমায় কিছুই দিই নাই।

ওফিলিয়া। আপনি স্মরণ করিয়া দেখুন,—আপনি দিয়াছিলেন। সেই উপহারের সঙ্গে সঙ্গে এমন মধুর প্রণয়-কাহিনী ছিল যে,

তাহাতে সেই দ্রব্যগুলির মূল্য আরও বাড়িয়াছিল। কিন্তু হায়, এখন আর সেদিন নাই,—সেদিন গিয়াছে! কাজেই তাহা ফিরিয়া লউন। দান করিবার সময় যে হৃদয় ও মন থাকে, দুইদিন পরে যদি সেই হৃদয় ও মন অন্যরূপ হয়, তবে সে দ্রব্যের আর গৌরব কি—এই গ্রহণ করুন।

হ্যাম্‌লেট। হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি কি ধার্মিকা!

ওফিলিয়া। কি বলিলেন?

হ্যাম্‌লেট। তুমি কি সুন্দরী?

ওফিলিয়া। আপনি কি বলিতেছেন?

হ্যাম্‌লেট। যদি তুমি ধার্মিকা ও সুন্দরী দুই-ই হও, তবে ধর্ম ও সৌন্দর্য একত্রে মিশিতে দিও না।

ওফিলিয়া। ধর্ম ছাড়া সৌন্দর্য কি আর কিছুর সঙ্গে মিশিতে পারে?'

ইংরেজী সাহিত্যের কৃতি অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় শেক্সপীয়র পঠন-পাঠনে বিদ্বৎমহলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শেক্সপীয়রের অমর নাট্য-কৃতিত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় আধুনিক কালে খুব কম ব্যক্তিই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। শেক্সপীয়রের মূল্যায়নে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন।[১৮] এখানে ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর করা 'ম্যাকবেথ'-এর অনুবাদের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। অনুবাদাংশটি 'ম্যাকবেথ' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের বিখ্যাত স্বগতোক্তি 'To-morrow, and to-morrow, and to-morrow' থেকে নেওয়া হয়েছে।

'সীটন। মহারাজ, মহারাণী মৃত।

ম্যাকবেথ। একদিন তাঁকে মরতেই হোত;

একথার হইত সময় কোন একদিন।

আজিকার পরে কাল, তারপরে কাল, আর কাল,

শম্বুকগতিতে চলে অনুদিন,

লিপিবদ্ধ সময়ের শেষ অক্ষরাবধি,

মোদের বিগত কাল আলো জ্বালি

মূঢ় আমাদের

দেখায়েছে মৃত্যুমুখে পথ ধূলিময়।

নিভে যাক, নিভে যাক ক্ষণস্থায়ী দীপ!
জীবন ত শুধু চলমান ছায়া, তুচ্ছ অভিনেতা
রঙ্গ মঞ্চপরে যে বা করে অভিনয়
আপনার নগণ্য ভূমিকা সদম্ভ গর্জনে,
পরে আর শোনা নাহি যায়; এ এক কাহিনী
যার কথক নির্বোধ, শব্দ আড়ম্বরে, পূর্ণ,
যার অর্থ মাত্র নাই।'

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত [১৮৮৭-১৯৫৪] আধুনিক বাঙলা কাব্য-সংসারে একটি বিশিষ্ট নাম। "শেষ জীবনে যতীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা যখন স্তিমিত হয়ে এল, কবি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরই এই মানস-দৈন্যের অবস্থা।... তাই তিনি শেষ জীবনে মহাকবি শেক্সপীয়রকে অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়েছিলেন। এই মহৎ প্রচেষ্টায় উদ্দীপ্ত হয়ে [১৯৫-১৫২ সালে] যতীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে 'জুলিয়াস সীজার', 'ওথেলো', 'ম্যাকবেথ' প্রভৃতি মহাকবির শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি যোগ্যতার সঙ্গে আক্ষরিক ও কাব্যময় বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদগুলি যতীন্দ্রনাথের অমর কীর্তি।"[১৯] এখানে আমরা তাঁর অনূদিত 'হ্যামলেট : ডেনমার্কের কুমার' নাটকের পঞ্চম অঙ্ক / প্রথম দৃশ্যের 'এলসিনোর, গির্জার প্রাঙ্গণ' অংশ থেকে কিছু উদাহরণ উপস্থিত করবো :

'হ্যাম। আচ্ছা হোরেসিয়ো, একটা কথা বলতে পার?

হোরে। বলুন কুমার।

হ্যাম। তোমার কি মনে হয় মাটির তলায় আলেকজান্দারের পরিণামটাও এই ধরণের হয়েছিল?

হোরে। তাই তো হবার কথা।

হ্যাম। আর এই রকম গন্ধ? ছিঃ! [মাথাটা ফেলিয়া দিলেন]

হোরে। তাই সম্ভব কুমার।

হ্যাম। হোরেসিয়ো, আমাদের কত হীন পরিণতিই না হতে পারে? আলেকজান্দারের মহান দেহাবশেষ দিয়ে মদের পিপের ফুটো বন্ধ করা হচ্ছে—কল্পনায় এটা অনুমান করা যায় না?

হোরে। সেটা একটু কষ্ট কল্পনা হয় না কি?

হ্যাম। মোটেই না। বেশ সহজ পথেই এর অনুসরণ চলে।

আলেকজান্দার দেহত্যাগ করলেন; আলেকজান্দার কবরস্থ হলেন, ধুলোয় আলেকজান্দার ধুলোয় মিশিয়ে গেলেন; ধুলোই মাটি, মাটি থেকেই কাদা আর ঠিক সেই কাদা দিয়ে মদের পিপের ফুটো বন্ধ হয়নি কে বললে?'

ওপরে দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা যথাসাধ্য দেখাবার চেষ্টা করেছি যে প্রায় পৌনে দু-শো বছর ধরে সাহিত্য-রসিক বাঙালী কি ভাবে শেক্সপীয়র-জাহ্নবীর অমৃতধারাকে আপন সাহিত্য-ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করে দেবার চেষ্টা করেছে। কেবল বিদ্যায়তনের পাঠ্য তালিকার মধ্যে দিয়ে বা মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে নয়, শেক্সপীয়র-সাহিত্যের দানকে দেশীয় ভাষা-ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য বাড়াবার কাজেও ব্যবহার করেছে বাঙালী মনীষা, অনুবাদের মাধ্যমে। ওপরের আলোচনার পরিপূরক হিসেবে আমরা বিভিন্ন ভাবে বাঙলায় শেক্সপীয়রের যে অনুবাদ হয়েছে তার একটি তালিকা প্রণয়ন করেছি।[২০] বলা বাহুল্য যে এই তালিকা চূড়ান্ত নয়—এর বাইরেও কিছু কিছু শেক্সপীয়র-অনুবাদ থেকে যেতে পারে। তবে প্রধান প্রধান অনুবাদকদের প্রচেষ্টাকে তালিকাবদ্ধ করার দিক থেকে বোধহয় এটি অনেকদূর পর্যন্ত ত্রুটিশূন্য।

১। ইংরেজ সিবিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে।

২। সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত : 'শেক্সপীয়ার'

৩। দ্রষ্টব্য ২নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ ৪৭৮ এবং 'শেক্সপীয়র চতুর্থ জন্ম শতাব্দী স্মারক গ্রন্থ'

৪। ঐ ঐ

৫। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "হরচন্দ্রের সর্বপ্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে রচিত হইয়া পরের বৎসর, অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়; মনে হয়, ইহা তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকেরও পূর্ববর্তী রচনা। সেইজন্য হরচন্দ্র তাঁহার পূর্ববর্তী কোন বাঙলা নাটকের আদর্শ হইতে সহায়তা লাভ করিতে পারেন নাই,…।" আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' :

৬। সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' :
পৃ. ৩২।

৭। ঐ : পৃ. ৩৩।

৮। সুকুমার সেন এর প্রকাশ তারিখ দিয়েছেন ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ। দ্রষ্টব্য ৬নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৩৪।

৯। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রজীবনী: ১ম খণ্ড [১৩৬০]: পৃ. ৪২।

১০। গিরিশচন্দ্রও একজন প্রখ্যাত শেক্সপীয়র অনুবাদক। আমরা পরিশিষ্টে শেক্সপীয়রের ডাইনির সংলাপ-এর মূল ইংরেজী এবং রবীন্দ্রনাথের ও গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ পাশাপাশি তুলে দিয়েছি। পাঠকগণ দক্ষতা বিচারের অবকাশ পাবেন।

১১। দ্রষ্টব্য ৫নং পাদটীকার গ্রন্থ: পৃ. ৪১৬।

১২। দ্রষ্টব্য আশুতোষ ভট্টাচার্য: 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস': ১ম খণ্ড [১৯৬০]: পৃ. ৪০৮। এবং ২নং পাদটীকার গ্রন্থ: পৃ. ৪৮৫।

১৩। ঐ পৃষ্ঠারই পাদটীকায় লেখা আছে: 'অমরেন্দ্রনাথ হরিরাজের সমস্ত স্বত্ব কিনিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি নিজের রচিত অন্যান্য গ্রন্থের সহিত হরিরাজের প্রকাশ স্বত্বও বসুমতীকে বিক্রয় করেন। বসুমতী হরিরাজকে 'অমর গ্রন্থাবলী' ভুক্ত করিয়া প্রকাশ করেন।···কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ জীবিত কালে হরিরাজকে কখনও তাঁহার নিজের লেখা বলিয়া চালান নাই; স্বপ্রকাশিত কোন অমর গ্রন্থাবলীতে হরিরাজ স্থান পায় নাই; বরঞ্চ বহুবার বহু হ্যাণ্ডবিলে, বহু বিজ্ঞাপনে তিনি 'নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত সেই যুগান্তকারী ঐতিহাসিক নাটক হরিরাজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া, কে গ্রন্থকার তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।"

১৪। দ্রষ্টব্য ৬নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৩২৯।

১৫। এই বিষয়টি আলোচনার জন্য ৫নং পাদটীকা গ্রন্থের ৪১১-১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৬। দ্রষ্টব্য ৫নং পাদটীকা। ৪০২-০৩ পৃষ্ঠা।

১৭। 'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা': ৪১ সংখ্যক গ্রন্থ [১৩০০]: পৃ. ১৮।

১৮। দ্রষ্টব্য 'পরিচয়' মাসিক পত্র: চৈত্র-বৈশাখ ১৩৫৭-৫৮: পৃ. ১-৩১।

১৯। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদক: 'বারোমাস' মাসিক পত্র: 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও আধুনিক বাংলা কাব্য পরিক্রমা': কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬০: পৃ. ৪৮৩। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়: "১৩৫৮-৫৯ সনের মধ্যে তিনি মহাকবি সেক্সপীয়রের তিনখানি প্রসিদ্ধ ট্র্যাজেডির অনুবাদ করেন। মূলের অনুরূপে এই অনুবাদগুলিও গদ্য-পদ্যে লিখিত। 'ম্যাকবেথ' 'মাসিক

বসুমতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে—'হ্যামলেট' 'শনিবারের চিঠি'তে।" —শশিভূষণ দাশগুপ্ত : 'কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায়' [১৩৬২] : পৃ. ১৯২।

২০। এই তালিকা রচনায় ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সম্পাদিত 'শেক্সপীয়র চতুর্থ জন্ম শতাব্দী স্মারক গ্রন্থ' [১৯৬০] এর সাহায্য বিশেষভাবে স্মরণ করি। 'পরিশিষ্টে' এই তালিকা মুদ্রিত করা হয়েছে।

৪
শেক্সপীয়র ও বাঙলা নাটক

ক.

: সূচনা কাল

"তারাচরণ শিকদার প্রণীত 'ভদ্রার্জুন' নামক নাটকখানিই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে"।[১] এবং এ-প্রসঙ্গে যে বিষয়টি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষণীয় তা এই যে, আদি মৌলিক বাঙলা নাটক রচনার সূত্রপাত থেকেই আমাদের নাট্যসাহিত্যের ওপর য়ুরোপীয় নাট্যকলার রীতি, আঙ্গিক ও ভাবগত প্রভাব পড়তে থাকে। তারাচরণের নাটক 'ভদ্রার্জুনে'র [১৮৫২ খ্রীস্টাব্দ] ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি; বা কথাটাকে ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায় এই যে তারাচরণকে দিয়েই বাঙলা মৌলিক নাটকে য়ুরোপীয় নাট্যরীতির বহুমাত্রিক প্রভাবের সূচনা হয়।

এমন মন্তব্য করার মানে কি? - প্রশ্নের উত্তরে তারাচরণ তাঁর নাটকের ভূমিকায় বলেছেন: 'এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনা-স্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটকসম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা—প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় [Act] এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক [Act] এক্ট যেরূপ [Scene] সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত Scene শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যেস্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটক ব্যক্ত হয়, তাহাকেই [Scene] সিন্ কহে। .... নাটক নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায়

ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইওরোপীয়দিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।'

নাট্যকারের নিজস্ব এই বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে যে প্রত্যক্ষভাবে শেক্সপীয়রীয় না হলেও পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি ও তার রস পান করেই বাঙলা মৌলিক নাটক ভূমিষ্ঠ হলো।[২] বিষয়টি তাৎপর্য-ব্যঞ্জক বলেই ওপরে তারাচরণের লিখিত ভূমিকাটি কিছু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

প্রথম মৌলিক বাঙলা নাটকে য়ুরোপীয় প্রভাবের অনুষঙ্গে একটি তুলনার উল্লেখ করা, মনে হয় এ-প্রসঙ্গে অযৌক্তিক হবে না। তা-হচ্ছে এই যে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাঙলার 'ইয়ং বেঙ্গল' [প্যারীচাঁদ মিত্র-এর ভাষায় 'ইয়ং ক্যালকাটা'] গোষ্ঠীর অগ্রনায়কদের অন্যতম কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮১৩-১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ][৩] রচিত [যদিও ইংরেজী ভাষায়] 'দি পার্সিকিউটেড' [*The Persecuted*][৪] নাটকের [১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ] পাত্র-পাত্রীর সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একাধিকবার শেক্সপীয়রের নাম ও প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। অতএব বাঙালী, তা সে ইংরেজীই হোক বা বাঙলাই হোক, মৌলিক নাট্যরচনার সময় কোন অবস্থাতেই য়ুরোপীয় নাট্যকলা তথা শেক্সপীয়রকে বর্জন করতে পারে নি।

ঐ একই বছরে [১৮৫২ খ্রীস্টাব্দ] এবং বোধ হয় 'ভদ্রার্জুনে'র দু-এক মাস আগে প্রকাশিত[৫], জি. সি. গুপ্ত রচিত 'কীর্তিবিলাস' নাটক য়ুরোপীয় নাট্যকলা অনুসরণে আরও সাহসী হলো। প্রথমত, তিনি বাঙলা ভাষায় সর্বপ্রথম মৌলিক বিষাদান্তক নাটক রচনা করলেন এবং দ্বিতীয়ত, অঙ্ক-প্রকরণের দিক থেকে সামগ্রিক ভাবে য়ুরোপীয় নাট্যকলার অনুসরণ ছাড়াও শেক্সপীয়রের প্রভাবে নাট্য-চরিত্র নির্মাণ করতে থাকলেন। প্রথমে নাট্যকার গুপ্ত তাঁর 'কীর্তিবিলাস' নাটকের ভূমিকায় বিষাদান্ত নাট্য-রচনার কৈফিয়ৎ হিসাবে লিখতে গিয়ে শেক্সপীয়রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লিখলেন: 'অনেকের এইরূপে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে। অত্যন্ন বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, শোক-

জনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণ শেক্সপীয়র নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন—

আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোক প্রয়াসী।......' অতএব দেখা যাচ্ছে বাঙলা নাটকের সূচনা লগ্নেই শেক্সপীয়র বাঙালী নাট্যকারের কাছে আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছেন।

জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস'-এর কাহিনীটি যদিও বাঙালীর কাছে সুপরিচিত 'বিজয়-বসন্ত' বা 'শীত-বসন্ত'-র বিয়োগাত্মক গল্পের রূপান্তর মাত্র, তথাপি নাম-চরিত্র কীর্তিবিলাস-এর চরিত্র রচনায় বা কাহিনী বিন্যাসে শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেটে'র কিছু কিছু প্রভাবকে সহজেই চিনে নিতে পারা যায়।[৬] যেমন: মহারাজ চন্দ্রকান্তের দুই পুত্র—কীর্তিবিলাস ও মুরারি। তাঁদের বিমাতা যুবতী নলিনী কীর্তিবিলাসের প্রতি অনুরক্ত। হ্যামলেটের মা ছিলেন যেমন তাঁর কাকার প্রতি অনুরক্ত। কীর্তিবিলাস এই অবৈধ-প্রণয় প্রত্যাখ্যান করলে নলিনী কীর্তিবিলাসের নামে রাজার কাছে মিথ্যা অভিযোগ করে তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন। আত্মরক্ষার জন্য কীর্তিবিলাস উন্মত্ততার ভান করেছেন। এই উন্মাদগ্রস্ততা হ্যামলেটেরই অনুরূপ। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয় নি। আবার হ্যামলেট যেমন নাটকের মধ্যে বলছেন: 'Frailty thy name is woman'—তেমনি কীর্তিবিলাসও বলছেন: 'হায় হায়, রমণীগণের কি খল স্বভাব' ইত্যাদি।'

প্রায় সমসময়েই বাস্তব সমাজ-সমস্যামূলক মৌলিক নাটক নিয়ে [১৮৫৪: 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক'] আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বনামখ্যাত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন [১৮২২-১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ]। ইনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও পরে অধ্যাপক হন। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে তাঁর তেমন কোন পরিচয় ছিলো না। নাট্যসাহিত্য সম্পর্কিত তাঁর পাঠ গৃহীত হয়েছিলো সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের মাধ্যমে। তাই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের আঙ্গিক ও ভাবকে অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সুতরাং একদিকে যেমন 'সংস্কৃত নাট্যরচনার বিশিষ্ট রীতি সম্পর্কে তাঁর কোন গোঁড়ামি' ছিলো না, অন্যদিকে তেমনি 'ইংরেজি নাটকের সঙ্গে কোন পরিচয়'[৭] স্থাপন করারও তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নি। ফলে, তিনি যে কয়খানি অনুবাদ বা মৌলিক নাটক রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে সংস্কৃত নাটক বা দেশীয় যাত্রার প্রভাব অনুভূত হলেও, ইংরেজী নাট্যরীতির বা নাটকের, বিশেষ করে শেক্সপীয়রের নাটকের কোন

অনুভাব লক্ষ্য করা যায় না। যদিচ, 'সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও তিনি একখানি ট্র্যাজেডি লিখে মোহমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন'।[৮]

এই সময়েই সেকালের সমাজের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত, সমাজ-আলোড়নকারী ঘটনা বিধবা-বিবাহের প্রশ্নকে নিয়ে ইংরেজী নবীশ লেখক উমেশচন্দ্র মিত্র [?—?] বাঙলা নাটক রচনার আসরে নামলেন। রচনা করলেন 'বিধবা-বিবাহ নাটক' [১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দ]। এই নাটকটি একটু নিষ্ঠাভরে এবং সমসাময়িক বাঙলা নাট্যধারার ইতিহাস-সম্মত ও প্রকৃত অবস্থাকে সশ্রদ্ধভাবে মনে রেখে পাঠ করলে একথা বলতে পারা যায় যে এই 'বিধবা-বিবাহ নাটক'-ই সর্বপ্রথম মৌলিক বাঙলা নাটক যা বহুলাংশে ইংরেজী তথা শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি-রসের দ্বারা অভিসিঞ্চিত। এই মন্তব্যের সমর্থনে বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসকার জানাচ্ছেন : " · ··· 'বিধবা-বিবাহ'-ই বাঙলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মৌলিক বিয়োগান্তক নাটক। ইতিপূর্বে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' নাটকে যে বিয়োগান্তক কাহিনী নিতান্ত শিথিলভাবে অনুসরণ করিয়া নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার কাহিনী যেমন মৌলিক নহে—জনশ্রুতি জাত মাত্র, তেমনিই তাহাতে দৃঢ়বদ্ধ কোন নাটকীয় কাহিনীও নাই। ······ কিন্তু 'বিধবা-বিবাহ' নাটক তেমন নহে। ইহার প্রথম হইতেই অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাবে একটি বিয়োগান্তক পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কাহিনী রচিত হইয়াছে। বরং ইহার পরিণামে এমন একটি দুরতিক্রম্য অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহাতে ইহা কেবলমাত্র বিয়োগান্তক নাটক বলিয়াই গৃহীত হইবার যোগ্য নহে, ইহাকে বাঙলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ট্র্যাজিডি বলিয়াও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ······ ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব স্বীকার করিয়াই ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে নাটক রচনার সূত্রপাত হইলেও প্রত্যক্ষভাবে শেক্সপীয়রের নাটকের কোন চিত্র বা চরিত্র অবলম্বন করিয়া ইহাই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক। ইহার মধ্যে যে একটি উন্মাদ চরিত্র আছে, তাহা শেক্সপীয়রের উন্মাদ চরিত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত সৃষ্টি। ইতিপূর্বে শেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদ হইলেও শেক্সপীয়রের চরিত্র অবলম্বন করিয়া বাঙালীর জীবন হইতে নাটকীয় উপকরণ সন্ধান করিবার প্রয়াস দেখা যায় নাই, ইহাতেই তাহার প্রথম সার্থক প্রয়াস দেখা যায়।"[৯] অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষিত উমেশচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত সামাজিক আন্দোলনকে প্রচারধর্মী বক্তৃতায় রূপান্তরিত না করে সাহিত্যগুণোপেত একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকরূপেই উপস্থিত করলেন।[১০]

এতক্ষণ ধরে আমরা বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের যে ইতিহাস আলোচনা করে এলাম তাতে দেখতে পেয়েছি যে সেখানে বাঙালীর বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভা ব্যয়িত হয়েছে সংস্কৃত, য়ুরোপীয় এবং মূলত ইংরেজ শেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদে। এই অনুবাদ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে, বিশেষত এই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একেবারে প্রথমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজী বা শেক্সপীয়রের নাটকের অক্ষমতম অনুকরণও লক্ষ্য করা গেছে। তথাপি, আমাদের একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে কোথাও পাশ্চাত্ত্য বা শেক্সপীয়রীয় নাট্য-কৌশলের রস সুপাচ্য হয়ে বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্য-ধমনীতে সুস্থ ও প্রাণপুষ্ট রক্তধারা প্রবাহিত করতে পারে নি। তা পারার অথবা করার ক্ষমতা, হয়তো বা প্রতিভা এ-পর্যন্ত কারোরই ছিলো না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত [১৮২৪-১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ]-ই হচ্ছেন সেই অপূর্ব নির্মাণক্ষম অদ্বিতীয়পূর্ব প্রতিভাধর ব্যক্তি যিনি প্রথাবদ্ধ গতানুগতিক আদর্শের অনুকরণ নয় স্বী-করণের সামর্থ্য নিয়ে বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যুগ-প্রভাবে লব্ধ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং সংস্কৃতই হোক, গ্রীকই হোক, ইংরেজীই হোক সর্ববিশ্বের অতুলন ভাবরাশিকে নিজের মানস-পাত্রে সংগ্রহ করে তাকে আবার নব-নতুন রূপে পরিবেশন করার ক্ষমতা বা প্রতিভা,—বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, তাঁর আগে আর কারোরই ছিলো না। এইভাবে সমস্ত দিক বিচার করে যথার্থরূপে বলা হয়ে থাকে যে মধুসূদনই বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের নতুন দিঙ্‌নির্দেশক। মধুসূদন থেকেই বাঙলা নাটক অনুবাদ বা অনুকরণের বদ্ধ জলাকে অতিক্রম করে স্ব-রূপে আত্মপ্রকাশ করলো;—'a foreign air' বাঙলা নাটকের পরিবেশ মণ্ডলকে আবৃত করে ফেললো।

খ.

: শেক্সপীয়র ও মধুসূদনের নাটক

মধুসূদন তাঁর সমগ্র সাহিত্য-জীবনে চারটি নাটক এবং দুটি প্রহসন লিখেছিলেন। এর মধ্যে সব শেষ নাটক 'মায়াকানন' [১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দ]-এর মুদ্রিত রূপ তিনি দেখে যেতে পারেন নি ; এমন কি মুদ্রিত রূপ দেবার আগে কোনরকম পরিমার্জনাও করতে পারেন নি।

আমরা সকলেই জানি যে মধুসূদন অনেকটা বাজি ধরে চ্যালেঞ্জ রক্ষার মনোভাব নিয়ে বাঙলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং তাঁর

প্রথম ফসল মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'শর্মিষ্ঠা নাটক' [১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দ]। অভাবনীয় এবং উচ্চ-কণ্ঠ প্রতিজ্ঞায়, জয়লাভের বাসনা নিয়ে এই নাটক রচিত হলেও এখানে মধুসূদনের কবি-আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করে নি ; ফলে যে শেক্সপীয়র তাঁর নাট্য-জীবনের ধ্রুবতারা সেই শেক্সপীয়রের জগৎ, কিংবা পাশ্চাত্ত্য নাট্য-চেতনা অপেক্ষা সংস্কৃত না'কের রাজ্যেই পরিভ্রমণ করতে হয়েছে তাঁকে সবচেয়ে বেশী। ফলে, 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা করে জয়ের আনন্দ, অথবা আত্মবিশ্বাসের শক্ত মাটি পায়ের তলায় পেলেও, সেই কাহিনীবস্তু বা সংলাপ বা আন্তর উপকরণের ব্যবহার,—কোন দিক থেকেই নতুন সৃষ্টিজনিত কোনো তৃপ্তি তিনি লাভ করতে পারলেন না। যদিও ক. ইংরেজী নাটকের গঠনরীতি অনুসারে 'শর্মিষ্ঠা' অঙ্ক-গর্ভাঙ্কে বিভক্ত হয়েছে। খ. "কেহ কেহ মনে করেন 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে শেক্সপীয়রের প্রণীত 'হ্যামলেট' নাটকের প্রথম দৃশ্যের ভাবগত সামঞ্জস্য আছে। তবে শেক্সপীয়র রচিত *As you like it* নাটকের দুই সখীর ছদ্মবেশে ভ্রমণ ব্যাপারের সঙ্গে যে 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের দেবযানী ও তাঁহার সখী পূর্ণিমার ছদ্মবেশে ভ্রমণ-বৃত্তান্তের যোগ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাতে শেক্সপীয়রের সংলাপের ভাষার অনুকরণ করা হয় নাই সত্য, তথাপি চিত্রটির জন্য যে মধুসূদন শেক্সপীয়রের নিকট ঋণী, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।"[১১]

তবুও, মধুসূদন প্রথম নাটকখানি হাতে নিয়ে বাঙলা সাহিত্যের আসরে প্রবেশের মুখে যতই বিদেশী সৌরভের কথা বলুন না কেন, এখানে শেক্সপীয়র বা পাশ্চাত্ত্য নাটকের তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। 'কারণ, প্রধানত ইহা তাঁহার পরমুখাপেক্ষী প্রথম রচনা, সেইজন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ইহাতে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে।'[১২]

এর পরে 'পদ্মাবতী নাটক' [১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ]। এখানে তিনি তাঁর প্রিয় গ্রীক সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখলেন : 'I am sure, I need not tell you that in the First Act you have the Greek story of the golden apple India-nised' এবং তাঁর প্রিয় সাহিত্যকে নিয়ে নাটক লেখার কারণে দারুণ উল্লসিত হয়ে উঠলেন এবং ঐ চিঠিতেই আবার লিখলেন : 'All that I can tell you, is that there are few prettier plots in any drama that you have

read.' এমন দ্বিতীয়-রহিত কাহিনী নিয়ে রচিত তাঁর 'পদ্মাবতী নাটক'— এতেও কিন্তু তিনি শেক্সপীয়র থেকে দূরেই রইলেন। এই নাটক হলো মূলত গ্রীক স্বর্ণ আপেল ও কালিদাসের শকুন্তলার কাহিনী ও বিন্যাসরীতির বিমিশ্র ফল। এবং সেই ফলের স্বাদ-আকার-রঙ সবই সংস্কৃত রীতির অনুগামী—গ্রীক নাট্যভঙ্গীর কিছুই প্রায় নেই। অর্থাৎ এখানেও মধুসূদনের নাট্যচিন্তার পূর্ণ ও স্বাধীন প্রকাশ দেখা গেলো না। অধিকন্তু এই নাটকটি লোকপ্রীতি অর্জন করতেও পারে নি। কারণ, "মধুসূদন তাঁহার 'পদ্মাবতী নাটকে'র কাহিনীটি গ্রীক্ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কেবলমাত্র চরিত্রগুলিতে ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি, ইহার কাহিনীই যে কেবলমাত্র পৌরাণিক নহে, তাহা নহে, ইহা ভারতীয় জীবনাদর্শের বিরোধী রচনা। ইহার বিষয় তিনটি দেবীর মধ্যে সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতা। ভারতীয় নারীত্বের আদর্শে ইহার কোন স্থান নাই, দৈহিক সৌন্দর্য লইয়া নারীচরিত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার কোন কল্পনা ভারতীয় সমাজে স্থান পাইতে পারে না।······পাশ্চাত্ত্য একটি কাহিনীকে আনুপূর্বিক ভারতীয় পৌরাণিক পরিবেশের মধ্যে প্রকাশ করিবার প্রয়াস ইহাতে ব্যর্থতা লাভ করিয়াছে, ইহার সমন্বয় সাধন সার্থক হইতে পারে নাই।"[১৩]

এতখানি ব্যর্থতার মধ্যেও কোনো কোনো সমালোচক কিন্তু দেখতে পেয়েছেন যে: 'পদ্মাবতী নাটক'-এর 'শচী সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় পরাজিত ও অপমানিত হইয়া বিচারককে শাস্তি দিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, এবং নানাভাবে নাটকের মধ্যে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীকে দুঃখ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শেক্সপীয়রের গনেরিল [*King Lear*] ও লেডী ম্যাকবেথের [*Mecbeth*] ন্যায় শচীর দৃঢ় সংকল্প, প্রখর বুদ্ধি, সুচতুর উপায় উদ্ভাবনী শক্তি, নিষ্করুণ কাঠিন্য লক্ষ্য করিবার বিষয়।'[১৪] কেউ কেউ আবার এই সামর্থ্যকে স্বীকার করতে চান না। তারা বলেন: 'লেডী ম্যাকবেথের যে সক্রিয় প্রচেষ্টা ম্যাকবেথকে উত্তেজিত ও কর্ম-প্রণোদিত করাইয়া নাটকের পরিণতি ঘটাইয়াছিল শচীর মধ্যে সেই সক্রিয়তার প্রতিজ্ঞা আছে মাত্র, তদনুগ কর্ম নাই।···এবং এই নিষ্ক্রিয়তার জন্যই চরিত্রটি শেক্সপীয়ারের নাটকের নায়িকার মর্যাদা দাবী করিতে পারে না'।[১৫]

এ-ছাড়াও 'পদ্মাবতী নাটক'-এর চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে বিদূষক মানবক-এর কাপড়ে ও তরোয়ালে আলতা লাগিয়ে নকল বীরত্ব প্রকাশ শেক্সপীয়রের অমর

চরিত্র ফল্‌স্টাফ [*King Henry the Fourth—Part One*] যে আচরণ করেছে ঠিক তার অনুরূপ [৫ অঙ্ক। ৪ দৃশ্য] অবশ্য এই সাদৃশ্য প্রসঙ্গে একথা ঠিকই বলা হয়েছে যে: 'ফল্‌স্টাফ্‌ পৃথিবীর সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র। পদ্মাবতী নাটকের বিদূষকের চরিত্রে সেই জাতীয় জটিলতা বা বৈচিত্র্য নাই। ফল্‌স্টাফের সঙ্গে পদ্মাবতী নাটকের মানবকের তুলনামূলক সমালোচনা করিলে সাহিত্য বিচারে মাত্রাবোধের অভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তবু এখানে মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার স্ফুরণের সন্ধান পাওয়া যায়'[১৬] এবং সেই স্ফূর্তি শতদলে বিকশিত হলো মধুসূদনের পরবর্তী নাট্যরচনার মধ্যে দিয়ে।

এই অনুষঙ্গে আমরা মধু-জীবনে শেক্সপীয়র বিষয়ে আকর্ষণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা জেনে নিতে পারি। অর্থাৎ কেবল নিজের নাটকাদি সৃষ্টির ক্ষেত্রেই নয়, আপন-জীবনেও ঐ মহান নাট্যকার ও তাঁর সাহিত্যকে কিভাবে আশ্লিষ্ট করে নিয়েছিলেন তা জানলেও কিছু লাভ হতে পারে বলে মনে করি।

১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর বন্ধু গৌরদাস বসাককে এক পত্রে মধুসূদন লিখছেন: 'Please send me that volume of your Shakespeare which contains his Othello and Hamlet.' নিজের নাটকীয় প্রস্তুতির জন্যে তিনি বারে বারেই শেক্সপীয়রের অমর নাটকগুলি পাঠ করেছেন। প্রসঙ্গত শেক্সপীয়র-প্রীতি সম্পর্কে তাঁর বাল্যের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দু কলেজের শিক্ষক রিচার্ডসন তাঁর মনে যে সুতীব্র শেক্সপীয়র-অনুরাগ জাগিয়েছিলেন তারই ফলে, অঙ্ক করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তিনি, উদ্দেশ্য সহপাঠীদের কাছে প্রমাণ রাখা যে, শেক্সপীয়র নিউটনের চেয়ে বড়, আর ইচ্ছে করলেই তিনি নিউটন হতে পারতেন, কিন্তু নিউটন কিছুতেই শেক্সপীয়র হতে পারতেন না।[১৭] এই আত্মবিশ্বাসের অবিচ্ছিন্নতায় তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনাচরণে পর্যন্ত শেক্সপীয়রের চিরস্মরণীয় সংলাপগুলিকে উদ্ধৃত করতেন। এমন কি জীবনের অন্তিমকালেও তিনি শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ'-নাটকের বিখ্যাত স্বগতোক্তি: 'To-morrow, and to-morrow, and to-morrow' [5. v.]—এর অংশ সুস্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারতেন।[১৮] এ-ছাড়াও মধুসূদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাঁর কাব্যের জন্যে উদ্ভাবন করেছিলেন তাঁর প্রেরণা যতখানি মিল্টন থেকে এসেছিলো, ঠিক ততখানিই এসেছিলো শেক্সপীয়রের নাটকের কাব্য-সংলাপ থেকে। এর সঙ্গে যোগ করে নেওয়া যেতে

পারে যে : 'মধুসূদন তাঁহার নাটক রচনায়, বিভিন্ন সংলাপে শেক্সপীয়রের ভাষা এবং তাহার চিত্র ও চরিত্রের যে পরিমাণ অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাও উপেক্ষণীয় নহে।'[১৯]

শেক্সপীয়র সম্বন্ধে এইসব ধারণা—প্রভাব—অনুসরণের মধ্যেই কিন্তু মধুসূদন তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন : 'Some of my friends—and I fancy you are among them as soon as they see a drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been givenforth by the master-pieces if William Shakespeare. They perhaps forget that I write under different circumstances. Our social and moral developments are of a different character'. অর্থাৎ গভীর রসোপভোগে চরিতার্থ না হলে নিজের নাট্যবুদ্ধির এমন যথার্থ সমালোচনা অসম্ভব। ঠিক এই ভাবেই 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'-র রস-পরিণামের বিচার উপলক্ষে সেদিনের প্রখ্যাত অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : 'We Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European neighbours. Look at the splendid Shakespearean drama. If you leave out the Midsummer-Nights' Dream, Romeo and Juliet and perhaps one or two more, what play would deserve the name of Romantic ? Romantic in the sense in which Sacoontala is Romantic ? In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. ·· Ours are dramatic poems,'

এই কাব্যধর্মী রোমান্টিকতা, যা মধুসূদন তাঁর নাট্যকার তথা সাহিত্য-জীবনের ঊষা লগ্নে অনুসরণ করেছিলেন, তাকে বাতিল করে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাট্য-সৃষ্টি 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' [১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ]-এ য়ুরোপীয় নাট্যাদর্শ, তথা তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি শেক্সপীয়রের নাটকের 'stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiment'-কে আমন্ত্রণ জানালেন। এবং আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি যে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' সম্পর্কিত আলোচনায়, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চিঠি পত্রাদিতে বারে বারেই কবি শেক্সপীয়র বা তাঁর নাটক অথবা নাটকীয় চরিত্রগুলির প্রসঙ্গ আনছেন।[২০] যেমন : 'I wish you

had not thought of Shakespeare so much, as you appear to have done, when you sat down to persue poor Kissen Kumari. Some of the defects you point out, are defects indeed, but it does not fall to the lot of every one to rise superior to them and even Shakespeare himself does not do so often.'.

আমরা একথা অবশ্যই স্বীকার করবো যে মধুসূদন কাব্যে উত্তমর্ণ হিসেবে মেনেছেন মিল্টনকে এবং নাটকের বেলায় শেক্সপীয়রকে। এখন আমরা চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনা-নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি তাঁর ঐ ঋণকে কতখানি ধনে পরিণত করতে পেরেছেন তা দেখবো। প্রথমে, ধনদাস-চরিত্র সম্বন্ধে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন: As for Dhanadas, I never dreamt of making him the counterpart of Iago. The plot does not admit of such a character, even I could invent it—which I gravely doubt!' 'ওথেলো' নাটকের ইয়াগো-কে অনুসরণ না করে যদি ধনদাস রচিত হয়ে থাকে, তবে সে কি একেবারেই কোন প্রভাব বর্জিত মৌলিক চরিত্র? এ-বিষয়ে প্রায় সকল সমালোচকই নীরব থাকলেও কিন্তু শেক্সপীয়রের *King Henry the Forth—Part One*-নাটকের Sir John Falstaff চরিত্রটিকে মনে করতে অসুবিধা হয় না। ধনদাসের ধনলোভ, অসৎ পথ ও চাতুরীর আশ্রয়-গ্রহণ, তার বিকারহীন বিবেক, ভণ্ডামি, নিজের কুকীর্তিকে ঢাকা দেওয়ার জন্যে হাস্যকর সাফাই গাওয়া, বারে বারেই ফলস্টাফকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে আমরা এমনও বলতে পরি যে 'পদ্মাবতী নাটকে'র রাজ-বিদূষক মানবক যেন পুরাণের জগৎ ছেড়ে ইতিহাসের জগতে রাজা জগৎসিংহের সহচর হয়েছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ধনদাস রাজা জগৎসিংহকে ঠকিয়ে যেমন সানন্দে নির্বোধের মতো, আত্মসুখে স্বগতোক্তি করেছে, ফলস্টাফও তেমনি বার বার যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজের কাপুরুষতাকে ঢাকবার জন্যে ভণ্ডের মতো হাস্যকর ভাবে স্বগতোক্তি করেছে [৫ অ। ২দৃ; ৫ অ। ৩ দৃ; ৫ অ। ৪ দৃ]। ঘটনা-পারিপার্শ্বিকতা উভয় ক্ষেত্রে এক না হলেও চরিত্র ও আচরণ-সাদৃশ্য এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

দ্বিতীয়ত, আমরা কৃষ্ণকুমারীর কাকা বলেন্দ্রসিংহের প্রসঙ্গে শেক্সপীয়রীয় ঋণের কথা উল্লেখ করতে পারি। মধুসূদন এই চরিত্র-অঙ্কনের ইচ্ছায় অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের এক

পত্রে লিখেছেন : "I wish *Ballender* to be serious and light, like the 'Bastard' in King John." এই মন্তব্য কিন্তু প্রামাণ্য ও ভ্রান্তিহীন নয়; বরঞ্চ একে কিছুটা বিভ্রান্তিকর বলতে পারি। কারণ, শেক্সপীয়রের *King John* নাটকের এই ব্যাস্টার্ডের পুরো নাম হচ্ছে 'Philip the Bastard'. ইনি ইংলণ্ডের প্রাক্তন রাজা রিচার্ডের অবৈধ সন্তান। এই জন্ম-ক্রটি সত্ত্বেও শেক্সপীয়র একে অতুলনীয় গুণের অধিকারী ও কাব্যরসে মণ্ডিত করে রচনা করেছেন। এঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, নির্লিপ্ত দার্শনিকতা, সরস কৌতুকপ্রিয়তা, স্পষ্ট ও উচিত কথাকে অকপটে প্রকাশ করার গুণ এবং সমস্ত প্রকার কৃত্রিমতাকে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করার ক্ষমতা সমস্ত নাটকটির মধ্যে এঁকে বিশেষ স্থান করে দিয়েছে। কিন্তু 'মাইকেলের বলেন্দ্রসিংহের ব্যক্তিত্ব, জীবনদৃষ্টি ও ভাবোক্তির মধ্যে এই কৌতুকোজ্জ্বল বিদ্রূপাত্মক সরসতার চিহ্নমাত্র নেই। বলেন্দ্রসিংহ কারও অবৈধ সন্তান নয়। সে দেশভক্ত ও রাজভক্ত। ভ্রাতুষ্পুত্রী কৃষ্ণাকে সে সন্তানস্নেহে ভালোবাসে। দেশ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিপন্মুক্তির জন্য বলেন্দ্র পাঠ্যপুস্তকের বীরের মতো প্রাণোৎসর্গে সদা প্রস্তুত। কিং জনের ব্যাস্টার্ডের সঙ্গে এই চরিত্রের মিল কোথায়?'[২১] অতএব বলেন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করবার আগে ব্যাস্টার্ডের কথা মধুসূদনের মনে হলেও কৃষ্ণকুমারীর মতো এই রকম বিষাদ-গম্ভীর নাটকের অন্তিম অঙ্কে ঐ ব্যাস্টার্ডের অনুরূপ চরিত্র হিসেবে বলেন্দ্রকে মঞ্চে প্রবেশ করানোর বিপদ সম্পর্কে শিল্পী মধুসূদন সচেতন না হয়ে পারেন নি [এর আগে বলেন্দ্র ৩ অ। ৩ গর্ভাঙ্কে একবার মাত্র প্রবেশ করে দশ পংক্তির মতো সংলাপ ব্যবহার করেছে]।

তৃতীয়ত, আমাদের আলোচ্য উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহ বা কৃষ্ণকুমারী-র পিতার চরিত্র বা তাঁর আচরণচেষ্টাদিতে মধুসূদন মূলত শেক্সপীয়র থেকে কি ঋণ নিয়েছেন তা অনুধাবন করা যেতে পারে। প্রায় সব নাট্যসমালোচকই বলেছেন যে, কৃষ্ণকুমারীর পিতা ভীমসিংহের সঙ্গে শেক্সপীয়র রচিত *King Lear* নাটকের নাম-চরিত্র ব্রিটেনের রাজা লীয়রের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উভয়ের বেদনার্ত হৃদয়ের হাহাকার, সন্তান-বাৎসল্য বিশেষভাবে তুলনীয়। মেঘের গর্জন ও ঝড়ের মৃত্যুস্থষ্টির তাণ্ডবে সমগ্র পৃথিবী ভীত ও কম্পমান। প্রিয়তম, একমাত্র ও নিরপরাধ কন্যার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে মনে করেছেন যে তিনি নিজ হাতে আপন সন্তানকে বধ করছেন। এই চিন্তা তাঁর হৃদয়কে যেন

উৎপাটিত করে ফেলেছে। তিনি আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারছেন না। উন্মাদের মতো চীৎকার করছেন। ব্যথা-দীর্ণ হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণায় যেমন ছটফট করেছেন [৫ অঙ্ক। ২ গর্ভাঙ্ক]; ঠিক তেমনি, প্রায় একইভাবে ও ভাষায় কন্যা গনেরিল এবং রেগানের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে রাজা লীয়র আর্তনাদ করে উঠেছেন [3. II.]। এখানে আমরা পাশাপাশি উভয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে উভয়ের মধ্যেকার সাদৃশ্যটুকুকে' দেখাতে পারি। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে ভীমসিংহ:

'রাজা। [আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া] রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম দেখে, এই প্রচণ্ডকোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে চামুণ্ডা-রূপে গর্জন কচ্চোন। উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালস্বরূপ অন্ধকার! হে তমঃ, তুমি কি আমাকে গ্রাস কত্তো উদ্যত হয়েছো? উঃ মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান্ কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণক্রোধান্বিত কচ্চোন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ! এ কি প্রলয়কাল! তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না? [ঊর্ধ্বে অবলোকন করিয়া] হে কাল, আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে নিশাদেবী! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ। বিনাশ কর।'

এর পাশে 'কিং লীয়র' নাটকের:

'*Lear.* Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!
You cataracts and hurricanoes, spout
Till you have drench'd our steeples, drown'd the cocks!
You sulphurous and thought-executing fires,
Vaunt-couriers of oak-cleaving thunderbolts,
Singe my white head! And thou, all-shaking thunder,
Strike flat the thick rotundity o'the world!
Crack nature's moulds, all germens spill at once,
That makes ingrateful man.'

এর পর শেক্সপীয়রের ঐ একই নাটকের শেষ দৃশ্যে [৫ অঙ্ক। ৩ দৃশ্য] রাজা লীয়র তাঁর প্রিয় কন্যা কর্ডেলিয়ার মৃত্যুতে যে ভাবে হাহাকার করেছেন, 'Cordelia, Cordelia! stay a little.'

বিদীর্ণ হৃদয়ে অবশেষে মৃত্যু বরণ করেছেন, রাজা ভীমসিংহও তেমনি

প্রিয়তমা কন্যা কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুতে, 'হা কৃষ্ণা!—হা কৃষ্ণা! আমি যাই মা, আমি যাই।' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করে অবিরত কেঁদেছেন ও উন্মাদ হয়ে গেছেন। উভয় পিতার মর্মবেদনার সাদৃশ্যটি বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এ-ছাড়াও কৃষ্ণকুমারী স্বপ্নে যে পদ্মিনী-মূর্তিকে দেখেছে [৩ অ। ২ গর্ভাঙ্ক] কোনো কোনো সমালোচকের মতে তা 'হ্যামলেট' নাটকে হ্যামলেটের পিতার প্রেত, রাণী অহল্যাদেবী কৃষ্ণা প্রসঙ্গে যে অলৌকিক স্বপ্ন দর্শনের প্রসঙ্গ তপস্বিনীর কাছে ব্যক্ত করেছেন [৫ অ। ৩ গর্ভাঙ্ক] তা 'ম্যাকবেথ' নাটকের ভোজসভায় ব্যাঙ্কোর প্রেত দর্শনেরই অনুরূপ। অর্থাৎ 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এ যে অতি অলৌকিকতার অবতারণা করা হয়েছে তা শেক্সপীয়রীয় নাট্যকলারই প্রত্যক্ষ প্রভাবের প্রতিফলন।

'নাটকীয় জটিলতা ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টির নিমিত্ত চরিত্র বিশেষের ছদ্মবেশ ধারণ, শেক্সপীয়র এই কারিগরীর বাদশাহ। বিয়োগান্ত নাটকে সব সময়ে না হলেও তাঁর একাধিক মিলনান্ত নাটকে শেক্সপীয়র এই কৌশল অতি চমৎকারিত্বের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন; কখনও কখনও জীবনোপলব্ধির একটা সূক্ষ্মতর দ্যোতনায় একে ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন। যেন বলতে চেয়েছেন, মানুষ মাত্রেই জীবনাভিনয় করে ছদ্মবেশে।... এ্যাজ ইউ লাইক ইট; মাচ এ্যাডু এবাউট নাথিং, দি মেরী ওয়াইভস অফ উইণ্ডসর, টুয়েলফ্‌থ্‌ নাইট ইত্যাদি নাটকে বিভিন্ন চরিত্র কর্তৃক মুখোস পরিধান, মঞ্চান্তরালে আত্মগোপন এবং ছদ্মবেশ ধারণের ফলেই কাহিনীগত সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে এবং তা দ্রুত সমাধানের দিকেও এগিয়ে গেছে।'[২২] 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এও উক্ত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে; যদিও তা ঘটনানিয়ন্ত্রণে এত শক্তিশালী নয়, এরূপ বিপত্তি এবং মধুর মিলনাত্মকও নয়; তথাপি কৃষ্ণকুমারী নাটকের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ দৃশ্যে বিশেষত মদনিকার পুরুষবেশ ধারণের কারসাজি কিছু নাটকীয় জটিলতা সৃষ্টি করেছে। এই বিষয়টির সম্পর্কে উদাহরণ দিয়ে সমালোচক বলছেন: "মদনিকার চরিত্রে শেক্সপীয়রের কোন কোন নায়িকার প্রভাব লক্ষণীয়।...'দি মার্চেণ্ট অব ভেনিস্'—এর পোর্শিয়া এবং নেরিশা, 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'-এর রোজালিণ্ড, 'দি টু জেণ্টলমেন অব ভেরোনা'-র জুলিয়া, 'অল্‌স ওয়েল ছাট্‌ এণ্ড্‌স্ ওয়েল'-এর হেলেনা, 'টুয়েলফ্‌থ নাইট'-এর ভায়োলার মতই মদনিকা পুরুষের ছদ্মবেশে উদয়পুরে এসে ধনদাসের চক্ষে ধুলো দিয়েছিল। মদনিকা শেক্সপীয়রের কমেডির কয়েকজন নায়িকার মতোই হাস্যোজ্জ্বল, তাদের মতই সরস তার

সংলাপ।"[২৩] এ-ছাড়াও এই 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কথ্যরীতি, দ্রুত চাল ও দ্বন্দ্বগর্ভ তীব্রতর নাটকীয় বেগ সৃষ্টিকে শেক্সপীয়রীয় আদর্শের অনুসরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এমন কি কৃষ্ণকুমারী নাটকের মূল কাহিনীর পাশে পাশে জয়পুর-কেন্দ্রিক ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকার উপকাহিনী রচনা করে মধুসূদন শেক্সপীয়র প্রযুক্ত ডবলপ্লট বা জোড়াকাহিনী ব্যবহারের কৌশলকে অনুসরণ করেছেন।

কিন্তু এই সব বাইরের আঙ্গিকগত সাদৃশ্যের সঙ্গে অনেকে শেক্সপীয়রের রোমান্টিক ট্র্যাজিডি অর্থাৎ 'অ্যান্টনী এণ্ড ক্লিওপ্যাট্র্যা' বা 'রোমিও এ্যণ্ড জুলিয়েট'-এর সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর বিয়োগান্ত পরিণতির মিল লক্ষ্য করতে চান। এই বিষয়ে দু-ধরণের ধারণা প্রচলিত আছে: ১। মধুসূদনের কাছে শেক্সপীয়রের ট্রাজিডির আদর্শ চূড়ান্ত বলে মনে হয়নি। নিয়তি-নির্ভর প্রাচীন গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের আদর্শ, কৃষ্ণকুমারীর ক্ষেত্রে, তাঁর ওপর সক্রিয় ছিলো। তাঁর নাটকে বিষাদাত্মক পরিণতির ধারণায় ঐ বিষয়ক শেক্সপীয়রীয় প্রভাবের অবিমিশ্র ফল অপেক্ষা গ্রীক-ট্রাজিডিকে অনুসরণের ফল বলেই গ্রহণ করা যেতে পারে। ২। উক্ত মন্তব্য থেকে যদি ধরে নেওয়া যায় যে শেক্সপীয়রের ট্রাজিডিতে নায়কদের চরিত্রই তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করছে ['character is destiny'] -অমোঘ নিয়তি সেখানে গৌণ, তা-হলে শেক্সপীয়রের ট্রাজিডি বিচার নির্ভেজাল হবে না। কারণ, "শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডির নায়কেরা ভাগ্যকে সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন নি। ওথেলোর কাছে নগ্ন সত্য যখন উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, 'Who can control his fate ?'... . হ্যামলেট বলেছিলেন, 'It is Divinity that shapes our ends rough-hew them how we will'. এর উত্তরে আবার 'জুলিয়াস সিজার'-এর ক্যাসিয়াসের কথা উদ্ধৃত করে বলা যায়: 'The fault, dear Brutus, is not in our stars,/ But in ourselves that we are underlings.' [1. II]। আসলে শেক্সপীয়ারের চরিত্ররা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের কথা বলে থাকেন। তাই শেক্সপীয়ারের যথার্থ মনোভাব আমরা সব সময়ে ধরতে পারি না। তা-হলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, নায়কেরা পুরুষকারের প্রতিমূর্তি, কিন্তু ভাগ্যের ক্রুর পরিহাস অনেক সময়ই দেখতে পাওয়া যায়।"[২৪] অতএব মধুসূদন কি কৃষ্ণকুমারীর ক্ষেত্রে ওথেলোর fate বা হ্যামলেটের divinity-কে ভুলে যেতে পেরেছিলেন?

পরিশেষে আমাদের বক্তব্যকে গুছিয়ে এনে সূত্রাকারে বলতে পারি যে, কৃষ্ণকুমারীতে টডের কাছে যে ঋণ তা কাহিনী-রেখা গ্রহণে মাত্র, গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদিসের প্রভাবও ক্ষীণতর, ফরাসী নাট্যকার রাসিনের 'ইফিজেনি'র প্রভাবও গৌণ, কিন্তু শেক্সপীয়র,—শেক্সপীয়রই এই নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর প্রেরণার মূল উৎস।

এর পর প্রায় তের বছর বাদে মধুসূদনের 'মায়াকানন' নাটকটি প্রকাশিত হয় [১৪ই মার্চ ১৮৭৪]। কিন্তু এর প্রায় নয়-দশ মাস পূর্বেই নাট্যকার গতায়ু হয়েছেন [২৯শে জুন, ১৮৭৩]। যদিও তিনি তার জীবনকালেই 'মোটামুটি' ভাবে নাটকটি শেষ করে গিয়েছিলেন, তবে তাকে পরিমার্জনা করার আর অবকাশ পান নি। ছাপা হওয়ার সময় 'সংবাদ প্রভাকরে'র সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্তভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করে এর আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছিলেন। ফলে একথা মনে করা যেতে পারে যে ভুবনচন্দ্র কোথাও কোথাও কলম চালিয়েছিলেন এবং শেষাংশে কিছুটা যোগও করেছিলেন।

সে যাই হোক, মধুসূদন তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নেও শেক্সপীয়রের নাট্য-প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নি। যেমন: অজয় এবং ইন্দুমতীর সব-ভোলানো প্রেম এবং এই প্রেমের জন্য আত্মঘাতী হওয়ার কাহিনী-পরিকল্পনার মধ্যে শেক্সপীয়রের 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট'-এর পরিমণ্ডলটিকে ধরতে কষ্ট হয় না। এমন কি ইন্দুমতী ও অজয়ের আত্মলোপের স্থান শ্মশান-সদৃশ মায়াকানন রোমিও-জুলিয়েটের আত্মবিনাশের স্থানের অনুরূপ। এছাড়াও 'মায়াকানন'-এর তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে মৃত সিন্ধুদেশের অধিপতির প্রেতাত্মার আবির্ভাব শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের প্রেতাত্মা-প্রদর্শনের কলা-কৌশলের মতো করে তৈরী হয়েছে। কিন্তু তখন কবি-নাট্যকার নিজেই জরাজীর্ণ-রুগ্ন-পরাজিত। তাই কোন কিছুই,—ভালো বা মন্দ আর গ্রহণ করতে পারছেন না; মৃত্যুপথ যাত্রী রোগী যেমন বাইরে থেকে দেওয়া রক্ত আর টানতে পারে না, গঙ্গাজলও গালের কশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি অবসিত-শক্তি মধু-প্রতিভা প্রিয়তম শেক্সপীয়র বা অপর কারো কাছ থেকেই, আর কিছুই প্রায় গ্রহণ করতে পারেন নি।

এইভাবে খুব খুঁটিয়ে খুটিয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, মধুসূদনের নাটকাবলীতে শেক্সপীয়রীয় প্রতিভামৃতের আরো দু-চার ফোঁটা এদিকে ওদিকে

নানা ভাবে বিভিন্ন রূপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কিন্তু এখানে আমরা যতটুকু স্বারূপ্য-লক্ষণ উপস্থিত করেছি তা-থেকে এ-বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, মধুসূদনের নাট্য-সাহিত্যের ওপর শেক্সপীয়রের প্রভাব কতখানি গভীর, সুদূর-প্রসারী ও শক্তিশালী ছিলো।

গ.

: শেক্সপীয়র ও দীনবন্ধুর নাটক

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র [১৮৩০-১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ] হিন্দু কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ফলে, খুব স্বাভাবিক ভাবেই ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর সঙ্গে শেক্সপীয়রের অতুলনীয় সাহিত্য-রসের যোগ ঘটেছে। অবশ্য তিনি যখন হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন [অক্টোবর, ১৮৫০] তার মাত্র বছরখানেক আগে এই কলেজের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও শেক্সপীয়র বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন এই কলেজ পরিত্যাগ করে চলে যান। তাই দীনবন্ধু হিন্দু কলেজে রিচার্ডসনকে শিক্ষক হিসেবে পেলেন না বটে, তবে তাঁর তৈরী করা ইংরেজী সাহিত্যের—বিশেষ করে শেক্সপীয়রের পরিমণ্ডল তাঁকে আচ্ছাদিত করতে দেরী করে নি। আমাদের এই ধারণাকে সমর্থন করে ড সুশীলকুমার দে বলেছেন: 'ডিরোজিওর মত শিক্ষকের প্রেরণায় এখন আর পুস্তকগত জ্ঞানের আস্ফালন নয়, ডি. এল. রিচার্ডসনের মত সাহিত্যরসজ্ঞ অধ্যাপকের প্রভাবে আসিল ইংরেজী সাহিত্যের সহিত বৃহত্তর ও ঘনিষ্ঠতর পরিচয়। এই সাহিত্যের অন্তহীন ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য নব্যবঙ্গের সুপ্ত সাহিত্যিক প্রতিভাকে উজ্জীবিত করিল,—কেবল অনুকরণের জন্য নয়, উপকরণ সংগ্রহের জন্য নয়, তাহার মর্মটি প্রাণের মধ্যে গভীর ভাবে অনুভব করিয়া তাহার সমগ্র রসরূপটি বাংলা ভাষায় প্রতিফলিত করিবার জন্য। ইহাই ছিল মধুসূদন-বঙ্কিম-দীনবন্ধু-বিহারীলাল-যুগের অভিনব বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব।'[২৫] এই প্রতিফলন দীনবন্ধুর ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর বালখিল্যের লেখনীচালনার মধ্যেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর'-এর ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ১৭-১৮ নভেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ' পর্যায়ের রচনাগুলির অন্তর্গত 'হাতে হাতে পাপের ফল'-এ লেখেন: "এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহার গালাগালির উত্তর না দিয়া তাঁহার সদুপদেশ অবলম্বন করিলাম, কারণ তাঁহার মন্দ কথায় রাগান্ধ

হইয়া যত্তপি সৎকথা না শুনি তবে Shakespeare আমাকে বলিবেন 'You are one of those, that will not serve God, if the devil bid you'." এই রচনা থেকেই জানতে পারা যাচ্ছে যে শেক্সপীয়রকে দীনবন্ধু তাঁর মানসনৈকট্যে স্থান দিয়েছেন, যে স্থান থেকে শেক্সপীয়র দীনবন্ধুর বেশ অনেকগুলি নাটকের ভাষা-ভাব আঙ্গিক এবং চরিত্র নির্মাণকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন।

কিন্তু এত সব সত্ত্বেও দীনবন্ধুর প্রথম এবং সর্বাধিক পরিচিত নাটক 'নীলদর্পণ' [১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ]-এ শেক্সপীয়রের প্রভাব প্রায় অনুপস্থিত। এখানে আমরা 'প্রায়' কথাটি ব্যবহার করেছি এই জন্যে যে, শেক্সপীয়রের প্রথম যুগের নাটকগুলিতে যে বিভীষিকাময় ট্রাজিডি-চিন্তাকে [horror tragedy] লক্ষ্য করা যায় তারই অনুসরণে মৃত্যু-হত্যা-উন্মত্ততা-ধর্ষণ ইত্যাদির ব্যবহার করা হলেও আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে, কি ট্র্যাজিডির আদর্শ রচনায়, কি ট্রাজিডির অনুপন্থী নায়ক-চরিত্র চিত্রণে বা অপর কোনো ভাবে 'নীলদর্পণ' নাটকে দীনবন্ধু শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করেন নি। আমরা জানি যে এই নাটকটি মরণান্তিক, এবং বিষাদান্তক। তথাপি পাশ্চাত্ত্য আদর্শের দুটি যে বিশিষ্ট ট্রাজিডি পরিচয় আছে, যেমন : এক. গ্রীক ট্রাজিডি—যাতে দৈব বা নিয়তির কাছে এক বিরাট পুরুষকারের পরাজয় সংঘটিত হয় এবং দুই শেক্সপীয়রীয় ট্রাজিডি—যেখানে দৈব নয়, চরিত্র-ত্রুটি বা প্রচ্ছন্ন মানবিক দুর্বলতার ছিদ্র পথ দিয়ে এক সুবিশাল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন চরিত্রের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে ;— তাদের কোনটিই অনুসৃত হয় নি। এতে একদিকে যেমন কোনো নিয়তিবাদের কথা নেই, তেমনি অন্যদিকে "যে মানবিক দুর্বলতার ছিদ্র পথে ইহাতে নায়কের পতনের বীজ প্রবেশ করিয়া তাহার বিনাশ অনিবার্য করিয়া তুলে, ইহাতে তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কারণ, ইহাতে বলিষ্ঠ কোন নায়ক-চরিত্রই নাই ; সুতরাং সেক্সপীরীয় আদর্শে 'নীলদর্পণ' ট্র্যাজিডি বলিয়া নির্দিষ্ট হইবার যোগ্য নহে।"[২৬] এমনটি হবার অবশ্য কারণ আছে। আমরা জানি যে নাট্যকার দীনবন্ধু একটি তাৎক্ষণিক প্রবল সমাজ-অর্থনৈতিক সমস্যার ওপর তীব্র আঘাত হানবার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই নাটকটি রচনা করেছিলেন। তাই মেলোড্রামাটিক অতি-কথন দ্বারা জনগণের রোষকে একলক্ষ্য করে প্রচণ্ড বিদ্রোহে রূপান্তরিত করার সমস্ত আয়োজন এই নাটকের মধ্যে দিয়েই দীনবন্ধুকে সম্পন্ন করতে হয়েছে।

ফলে, শেক্সপীয়রীয় নাটকের বিস্ফারবোধকে আশ্রয় করা এখানে সম্ভব হয়নি। এই কারণে 'নীলদর্পণ' বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী গ্রন্থ বা প্রথম গণসাহিত্য অথবা গভীর ও ব্যাপক মানব প্রেমের শ্রেষ্ঠ ফসল—ইত্যাদি যাই হোক না কেন, দীনবন্ধুর প্রতিভার যথার্থ ও উজ্জ্বল যে শস্য,—যা কৌতুক এবং অপক্ষপাত শিল্পদৃষ্টির সমবায়ে সৃষ্টি, তার জন্যে আমাদের তাঁর পরবর্তী নাটক-প্রহসনগুলির জন্মগ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এই বিষয়টিকেই কেউ কেউ অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে দীনবন্ধুর নাট্য-জীবনের প্রথম পর্যায় 'নীলদর্পণ' দিয়ে আরম্ভ এবং এই নাটক দিয়েই শেষ। পরবর্তী নাটক ['নবীন তপস্বিনী'—১৮৬৩] থেকে যেন অন্য দীনবন্ধুর অন্যতর নাট্য-পর্যায়ের আরম্ভ। 'নীলদর্পণের জগত থেকে বিদায় নিলেন দীনবন্ধু। পূর্বস্মৃতি বেঁচে রইল কৌতুক সৃষ্টির সূত্র ধরে। প্রত্যক্ষ বর্তমান থেকে অতীতমুখি হলেন তিনি।'[১৭] কেন এমন হলো সে আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। আমরা সেই সমস্ত নাটক-প্রহসনগুলির আলোচনার মধ্যে দিয়ে এটাই কেবল দেখতে পাবো যে ছাত্রাবস্থায় দীনবন্ধু যে শেক্সপীয়রকে আশ্রয় করে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন, সেই শেক্সপীয়র তাঁব নাটকগুলির ওপর নানা দিক থেকে আলোকসম্পাত করে তাদের বিভিন্নভাবে অনুধাবন করতে সাহায্য করেছেন। এখন দীনবন্ধুর পরবর্তী নাটকগুলিকে একে একে আলোচনা করে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করতে চেষ্টা করা হবে।

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপস্বিনী' ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি প্রিয়বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করা হয়েছিলো। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর সাহিত্য-কৃতি ও জীবনী সম্বন্ধে যে সমালোচনা লিখেছিলেন তা থেকে জানা যায় যে এই নাটকের "'জলধর' 'জগদম্বা' *Merry Wives of Windsor* হইতে নীত।" দীনবন্ধুর এই নাটকের জলধর কোন এক রাজ্যের মন্ত্রী। যে সেই রাজ্যের এক বণিক রতিকান্তের সুন্দরী স্ত্রী মালতীর প্রতি কামাসক্ত। এই মালতী তার আত্মীয়া ও বান্ধবী—সে রাজ্যের সহকারী মন্ত্রী বিনায়কের স্ত্রী মল্লিকার সহযোগিতায় জলধরের কামপিপাসাকে নিদারুণ ভাবে শাস্তি দিয়েছে। এই কাহিনী এবং তার পরিবেশ ও ঘটনা সবই শেক্সপীয়রের উক্ত নাটকের অনুরূপ। এখানে ফলস্টাফ হয়েছেন জলধর। মিসট্রেস্ ফোর্ড ও মিসট্রেস্ পেজ হয়েছেন যথাক্রমে মালতী ও মল্লিকা। দীনবন্ধুতে এই দুই

রমণীর জলধর নিপীড়ন ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদার হচ্ছেন রতিকান্ত; কিন্তু শেক্সপীয়রের নাটকে মিস্টার ফোর্ড এইসব ব্যাপারের কিছুই জানতেন না। তবে উভয়তই—রতিকান্ত ও মিস্টার ফোর্ড স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ-বাতিকগ্রস্থ। এ-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' [১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দ] উপন্যাসের গজপতি, বিমলা এবং আশমানীর আচরণটি মনে করতে ইচ্ছে হয়।

'নবীন তপস্বিনীতে' দীনবন্ধু যেখানে জলধরকে হোঁদলকুৎকুতে পরিণত করেছেন, শেক্সপীয়র সেখানে ফলস্টাফকে বাক্সবন্দী করিয়ে মিস্টার ফোর্ডের নির্দেশে ভৃত্যদ্বারা কাদা-ডোবায় নিক্ষেপ করিয়েছেন। দুই নাট্যকারের প্রায় একই ধরণের কায়দাটাকে এখানে পরপর উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে। প্রথমে শেক্সপীয়রের নাটক:

Mrs. Ford. What shall I do ? There is a gentleman, my dear friend ; and I fear not mine own shame so much as his peril I had rather than a thousand pound he were out of the house.

Mrs. Page. For shame, never stand 'you had rather' ! Your husband's here at hand ; be think you of some conveyance ; in the house you cannot hide him. O, how have you deceiv'd me. Look here is a basket ; if he be of any reasonable stature, he may creep in here ; and throw foul linen upon him, as if it were going to bucking, or—it is whiting—time —send him by your two men to Datchet Mead.

Mrs. Ford. He's too big to go in there. What shall I do ?

Fal. [Coming forward] Let me see 't, let me see 't. O, let me see 't ! I'll in, I'll in ; follow your friend's counsel ; I'll in.

Mrs. Page. What, Sir John Falstaff ! [*Aside to Falstaff*] Are these your letters, knight ?

Fal. [*Aside to Mrs. Page*] I love thee and

none but thee ; help me away.—Let me creep in here ; I'll never—

[*Gets into the basket* ; *they cover him with foul linen*]. 3. *III.*

এখন 'নবীন তপস্বিনী'তে দীনবন্ধু কি লিখেছেন দেখা যাক :

নেপথ্যে। মালতি! মালতি! দোর খোলো, একটা কথা বলে যাই।

জল। ঐ তো সদাগর ; ও মা আমি কম্‌নে যাবো, বাবা মলেম, [মল্লিকের পশ্চাৎ লুক্কায়িত হইয়া] মল্লিকে বাছা আমাকে রক্ষা করো। জগদম্বা বড় পেড়াপিড়ি করেছিল তাইতে তোমাকে মা বলিচি, আজ মার কাজ কর, আমাকে বাঁচাও—

নেপথ্যে। ঘরে কথা কয় কে ও, আমি না যেতেই এই, তুমি দোর খেলো, তোমাদের সকলকে কীচক বধ করচি।

মাল। [গাত্রোত্থান করিয়া] ফিরে এলে যে? যদি কেউ দেখ্‌তে পায়, এখনি মন্ত্রীর কাছে বলে দেবে এখন।

জল। মালতি, আমার মাতা খাও দোর খুল না, আমি লুকুই, দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, জগদম্বারে রাঁড় করো না।

মল্লি। পালঙ্গের নীচে যেতে পার না?

জল। দেখি, [চিত হইয়া শয়ন করে পালঙ্গের নীচে যাইতে চেষ্টা] না, পেট্, ঢোকে না, ভুঁড়িটে বাধে।

মল্লি। মালতি, ঐখান্‌টা ছেঁটে দে।

জল। এখন রঙ্গের সময় নয়, আজ যদি বাঁচি তবে রঙ্গের অনেক সময় পাওয়া যাবে।

মাল। মল্লিকে ঐ কোণে ফরমাসে গামলায় কোত্‌রা গুড় আছে তাইতে ডুব্‌য়ে রাখ্, মুখ যদি ডুবুতে না পারে, সেখানে একটা মুখোস্ আছে সেইটে মুখে বেঁধে দে।......

[জলধরের মুখে বিকট মুখস্ বন্ধন এবং জলধরের গুড়ের ভিতর প্রবেশ] ৪।৩

শেক্সপীয়রের নাটকে এই দৃশ্যটি অনুষ্ঠিত হয়েছে : *Ford's house*-এ, আর দীনবন্ধুর নাটকে তা : 'রতিকান্তের শয়নঘর'-এ।

দীনবন্ধুর এই নাটকের দোষ-গুণের আলোচনা এখানে করবার প্রয়োজন না থাকলেও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কাহিনীটি যেন পরিষ্কার দুটি ভাগে ভাগ হয়ে

গেছে ; এক ভাগ রোমাঞ্চের কল্পনায় সৃষ্ট, বিজয় ও কামিনীর প্রেমের কথা, আর অপর ভাগে হাস্যরসের পাত্রে রক্ষিত জলধর-জগদম্বা-মালতী ও মল্লিকার কৌতুক-গল্প। এই দ্বিতীয় কাহিনীতে আমরা যেমন শেক্সপীয়রের 'দি মেরী ওয়াইভস্ অব্ উইণ্ডসোর-এর প্রভাব লক্ষ্য করলাম, তেমনি প্রথম কাহিনীভাগে 'দি কমেডি অব্ এররস্'-এর ঘটনা ও ভাব-সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন এ্যান্টিফোলাস অব্ এফিসিউস্ ও এ্যান্টিফোলাস অব্ সাইরাকিউজ্ এই দুই যমজ ভাই তাদের মা ও বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং যে বাবা-মা আবার পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, ও নাটকের শেষে তাদের সবায়ের সঙ্গে সকলের মিল হয়েছে। দীনবন্ধুর নাটকের মধ্যেও রাজা-বড়রাণী এবং তাঁদের ছেলে বিজয়ের সঙ্গে নাটকের শেষে মধুর মিলন ঘটেছে। ওখানে এমিলিয়া যেমন হয়েছেন একটি মঠের অধ্যক্ষা, এখানে বড় রাণী হচ্ছেন একজন বনবাসিনী তপস্বিনী।

এ-ছাড়াও শেক্সপীয়রের 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট' নাটকের কোনো কোনো সংলাপকে দীনবন্ধু তাঁর এই 'নবীন তপস্বিনী'তে প্রায় একই ভাষায় অনুবাদ করে দিয়েছেন। যেমন, ঐ নাটকের প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে দ্বিতীয় ঘটক বলছে যে : 'ভাগ্যধরী—নামেতে আসে যায় কি, রূপ গুণ থাকলেই হলো—কমলিনীকে অন্য আখ্যায় ব্যাখ্যা করলে কমলিনীর সৌন্দর্য ও সৌগন্ধ্যের অন্যথা হয় না।' তুলনীয়ভাবে শেক্সপীয়রে পাওয়া যাচ্ছে :

'What's in a name ? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet ; 2. II.

আরও অনুসন্ধানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই নাটকের প্রধান কাহিনী শেক্সপীয়রের অপর এক বিখ্যাত নাটক *The Winter's Tale*-এর কাহিনীর ছায়ায় রচিত। যেমন 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে রাজা রমণীমোহনের দুর্ব্যবহারে বড় রাণী অন্তর্বত্নী অবস্থায় নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, কিন্তু রাজা ও রাজ্যের সকলে জানতো যে তিনি জলে ডুবে মরেছেন। অত্যাচারে পলাতকা বড় রাণীর সঙ্গে নাটকের শেষে রাজার মিল হয়েছে এবং তাঁদের পুত্র বিজয়ের সঙ্গে রাজ সভাপণ্ডিতের কন্যায় বিয়ে হয়ে এক মধুরান্তিক মিলন ঘটেছে। এ-ছাড়াও রাজবয়স্য মাধবের সঙ্গে শ্যামার প্রণয়-ঘটিত উপকাহিনীর সঙ্গে *As you like it*-এর রাজসভার ভাঁড় টাচস্টোন-অড্রের উপকাহিনীর সাদৃশ্যের কথাও মনে করা যেতে পারে।

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে দীনবন্ধুর দ্বিতীয় প্রহসন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রকাশিত হয়। এই প্রহসনটিকে সমালোচকগণ 'প্রথম স্বতন্ত্র ও সচেতন প্রহসন' বলেছেন। তা-ছাড়া এতে নাট্যকার যে ধরণের নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তাতে তিনি শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করার বিশেষ অবকাশ রচনা করে উঠতে পারেন নি। তবুও কিছু কিছু সাদৃশ্য যে একেবারে চোখে পড়ে না এমন নয়। যেমন : ক. *The Merry Wives of Windsor* এর জন ফলস্টাফের সামনে আবির্ভাব হয়েছিলো পরীদের, ঠিক তেমনি পেঁচোর মা-এর কাছেও পরীরা স্বপ্নে যেন দেখা দিয়েছিলো। খ. প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বিয়ের জন্যে উন্মত্ত বৃদ্ধ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের সংলাপের কিছু অংশের সঙ্গে *Macbeth* নাটকের কোনো কোনো দৃশ্য ও অঙ্কের ভাষার নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন, দীনবন্ধুর নাটকে বিয়ে পাগলা বুড়ো রাজীব মুখোপাধ্যায় নিজের ঘরে আসীন থেকে গৃহদ্বারে করাঘাত শুনে বলছে :

> '.........[দরোজায় আঘাত] ঠক্, ঠক্, ঠক্, রাত্রিদিনই ঠক্, ঠক্ [দরোজায় আঘাত] আবার ঠক্ ঠক্, কচ্চিই ঠক্ ঠক্ [দরোজায় আঘাত] কে-ও কথা কয় না কেবল [দরোজায় আঘাত] দরোজাটা ভেঙ্গে ফেল্যো, কে ও, রামমণিকে ডাক্‌বো না কি ? গিয়েছে ব্যাটারা' ;

এর সঙ্গে তুলনায়, শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথে পাচ্ছি :

> '*Porter.* Here's a knocking indeed ! If a man were porter of hell-gate, he should have old turning the key. [*Knock*] knock, knock, knock ! Who's there, i' th' name of Beelzebub ? Here's a farmer that hang'd himself on th' expectation of plenty. Come in time, have napkins enow about you ; here you'll sweat for't. [*Knock*] knock, knock. Who's there, i' the' other devil's name ?' 2. III.

জাগ্রত শিল্প চেতনা এবং পরিণত সাহিত্যচর্চার দক্ষতা নিয়ে দীনবন্ধু 'সধবার একাদশী' [১৮৬৬] প্রহসনটি রচনা করেন। এ-প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখলে বোধ হয় দীনবন্ধুর ওপর শেক্সপীয়রের প্রভাবের আলোচনা-বিচার যথার্থ হতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, দীনবন্ধুর সমগ্র নাট্য-কর্ম যথার্থ শ্রদ্ধা ও নিরপেক্ষ শিল্প-দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে বোধ হয় যে, দীনবন্ধু—নাট্যকার দীনবন্ধু

প্রায়শ অস্বচ্ছন্দ, কোথাও কোথাও বা অসহায়—যেন এক misguided প্রতিভা; অথচ তাঁর 'কিন্তু একটি মন্ত্র ছিল। দীনবন্ধুর শিল্পী প্রাণের তিমির হননের সে মন্ত্রের নাম হাস্য'।[২৮] এই মন্ত্র-সিদ্ধির পক্ষে রেস্টোরেশন যুগের কন্‌গ্রীভ-প্রমুখ নাট্যকারই তাঁর পক্ষে অনেক বেশী অনুসরণীয় ছিলো। তাই দীনবন্ধুর ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রের নাট্য-বক্তব্য বা সংলাপের অনুবাদ বা অনুসরণ বহুলাংশেই আরোপিত, স্বভাবে সাযুজ্য লাভ করতে পারে নি।

সে যাই হোক, 'সধবার একাদশী' নাটকের একেবারে সূচনাতেই আখ্যা পত্রে দীনবন্ধু শেক্সপীয়রের *Othello* নাটক থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা হচ্ছে সমগ্র নাটকটির সারবস্তু। শেক্সপীয়র বলছেন: 'O thou invisible spirit of wine, if thou hast no name to be known by, let us call thee Devil' [2. III.] সুরাপান,—সেদিনের নব্য যুবকদের মধ্যে সুরাপানের কুফল দর্শানোর উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত এই নাটকের প্রধান চরিত্র নিমচাঁদ দত্ত ছিলেন সেদিনের 'ইয়ং বেঙ্গলে'র প্রতিনিধি। ফলে, যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষা সেদিনের যুবকদের মানসোৎকর্ষ বিধান করেছিলো তা নিমে দত্তের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই স্ব-প্রকাশ দেখি। ঐ ইংরেজী বিদ্যার মধ্যে আবার শেক্সপীয়রের চর্চা ও সময় অসময়ে আবৃত্তি বিশেষভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো। তাই নিমে দত্ত এবং তার সজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ মাতলামির মধ্যে প্রায় অনর্গল শেক্সপীয়র আউড়েছে। এখানে কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক:

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে অটলের প্রস্তাবের উত্তরে নিমে দত্ত শেক্স-পীয়রের 'মারচেন্ট অব্ ভেনিস্'-এর 'ট্রায়াল সিন'-এ শাইলক্-এর উক্তি আউড়ে বলেছে:

'A Daniel come to judgment ! Yea, a Daniel !
O wise young judge, how do I honour thee !' 4. I.

[মূর্খ এবং মাতাল অটলবিহারী নিমচাঁদের মুখে ইংরেজী প্রবাদ বাক্যের উদ্ধৃতি শুনে বোকার মতো বলেছে [২।২]: 'এমন কোন বিষয় নাই যে শেক্সপীয়ার থেকে কোটেশান দেওয়া যায় না।

নিম। তোমার কাঞ্চন যেমন সতী, এও তেমনি শেক্সপীয়ার।'

এর কিছু পরেই আবার শেক্সপীয়র এসেছেন:

নিম [ভোলাচাঁদের মস্তকে চপেটাঘাত করিয়া] 'This is my

ancient ;—this is my right-hand' and this is my left hand'.

অট। এবার তুই শেক্সপীয়ার বল্‌চিস্‌ তার আর কোন সন্দ নাই—আমরা ও প্লে-টা হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়েছিলাম—Marchant of Venerials আমরা অনেক বার পড়িচি—

এ-ছাড়াও নাট্যকার 'ম্যাকবেথ', 'রোমিও এ্যাণ্ড 'জুলিয়েট' 'ওথেলো' থেকে বারে বারে পংক্তি উদ্ধৃত করে নিমচাঁদের মুখে বসিয়ে তাকে যেন 'ইয়ং বেঙ্গলে'র প্রতিরূপ করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। যেমন:

১. 'সধবার একাদশী'র দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে:

Canst thou not minister to a mind diseas'd
Pluck from the memory a rooted sorrow ;
Range out the written troubles of the brain ;
And with some······ [*Macbeth* : 5. III

২. ঐ দৃশ্যই আবার 'ম্যাকবেথ' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের অনুকরণে বলা হয়েছে: 'Macbeth ! Macbeth ! Macbeth ! Beware Macduff ; Beware নিমচাঁদ, Beware কাল্‌নিমে। কি বাবা ঘটিরাম Conspiracy কচ্চো ?'

ঠিক এই ভাবেই 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট'-এর উদ্ধৃতির [2. II.] মধ্যে বাঙলা শব্দ চালিয়ে দিয়ে নিমচাঁদ নিজের ভাব প্রকাশের অনুযায়ী করে নিয়েছে। যেমন:

'It is the east, and Juliet is the sun.
Arise, fair sun, kill the envious দরওয়ান।'

এরপর দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নিজের অবস্থাকে নিমচাঁদ Othello-র সঙ্গে তুলনা করে বলেছে যে,

'The tyrant custom, most grave senators,
Hath made the flinty and steel couch of war
My thrice-driven bed of down'. [1. III.

ঐ একই দৃশ্যেই কিছু পরে পুলিশ সার্জেন্টকে উদ্দেশ্য করে নিমচাঁদ বলেছে: 'Thou canst not say ; I did it never shake / Thy gory looks at me.' [*Macbeth* : 3. IV.] এর একটু পরেই সে আবার শেক্সপীয়রের

Othello নাটক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে : 'Man but a rush against Othello's breast, / And he retires.' [5. II.]। নিমচাঁদের এই মাতলামি শুনে সার্জেণ্ট যখন আবার বললো যে সে নিমেকে হুগলীর জলে চোবাবে, তখনও নিমচাঁদ শেক্সপীয়রকে ছাড়তে পারছে না : 'Drown cats, and blind puppies' [*Othello* : 3.IV.]।

এরপরে নিমচাঁদ তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আবার শেক্সপীয়রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে : 'Their best conscience / Is—not to leave undone, but keep unknown.' এতো সব সত্বেও কিন্তু নিমচাঁদ তার বিবেক ও মনুষ্যত্বকে বর্জন করতে রাজী নয়। কারণ, সমস্ত অবস্থাতেই এই-ই তার পরম অবলম্বন। তাই আবার তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে শেক্সপীয়র তার কণ্ঠে আশ্রয় নেন : 'I dare do all that may become a man ; / Who dares do move, is none' [*Macbeth* : 1. VII.] ঐ একই দৃশ্যে কিছুক্ষণ বাদে আবার নিমচাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে শেক্সপীয়রের আর একটি নাটকের [*Hamlet*] সংলাপ : 'Bloody bowdy villain ! / Remoresless, treacherous, lecherous, kindless villain' [2. II.]। এরপর অটলবিহারী যখন নিমচাঁদের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, তখন তার উত্তরে শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের ইয়াগোর সঙ্গে তুলনা করে অটলকে নিমচাঁদ বলেছে :

> 'I look down towards his feet – but that's a table :
> If thou be'st a devil I cannot kill thee'. 5. II.

অধিকন্তু কারো কারো মতে নিমে দত্ত "অনুভব করে যে তাহার মতো জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিও আজ অবস্থা-বৈগুণ্যে ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাই যখন তাহার ব্যঙ্গ-কুটিল ওষ্ঠদ্বয়ের ভিতর দিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বাহির না হইয়া হৃদয়ভেদী অনুতাপ উদ্গত হইতে থাকে, তখন আমাদের হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। ·· তখন মনে হয় দীনবন্ধুর কমেডীর মধ্যে এক নিতান্ত করুণ ট্রাজিক চরিত্র আঁকিয়াছেন এবং তাহার চরিত্র আলোচনা কালে কিং লীয়ারের উক্তি মনে হয়—'I am more sinned against than sinning.'[২৯] একেই কেউ কেউ 'শেক্সপীরীয়ান ট্রাজিক ধারণা' বলে গ্রহণ করতে চান।

এ-ছাড়াও রামমাণিক্যের 'বাঙালে' ভাষা-ব্যবহারের সঙ্গে 'দি মেরী

ওয়াইভস্ অব উইণ্ডসর'-এর ডক্টর কেইয়াস ও স্যার ইভানসের বিকৃত ভাষা প্রয়োগের তুলনা করা যেতে পারে। আরও অনেক উদাহরণ দিয়ে এই নাটকে শেক্সপীয়রের সংলাপ অনুসরণের প্রাচুর্যকে অনেক করে দেখানো যেতে পারে।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিভার সর্বোত্তম পর্যায়ে রচিত নাটকের নাম 'লীলাবতী' [১৮৬৭, ১৭ই ডিসেম্বর]। এই পর্যায়ে লেখা হাস্যরসাত্মক প্রহসন তিনটির পর একমাত্র সিরিয়াস নাটক হচ্ছে 'লীলাবতী'। ফলে, এখানেও শেক্সপীয়রকে ভুলে থাকা নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই দেখছি যে জমিদার হরবিলাসের আশ্রিত যুবক ললিত ও নিজ কন্যা ললিতার মধ্যেকার প্রেমকাহিনী 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েটে'র প্রেমের অনুরূপে গড়ে উঠেছে। "সেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের অনুকরণে এই নাটকে দীনবন্ধু ললিত-লীলাবতীর একটি সুদীর্ঘ প্রণয় দৃশ্যের [love scene] অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু মনের সুগভীর স্তরে সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষেত্রে নরনারীর যে প্রণয়-বেদনা স্তম্ভিত হইয়া আছে, তাহা জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইলে যে সূক্ষ্ম রসবোধের প্রয়োজন, তাহা দীনবন্ধুর ছিল না।"[৩০] ফলে, শেক্সপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েট, যুবক ও যুবতীর, প্রেম-স্বপ্নের সার্থকতা ও তাকে অনুভব করার জন্যে যে বেদনা-মধুর হৃদয়াবেগের উদ্বোধন ঘটানোর প্রয়োজন ছিলো, তা ললিত-ললিতার ক্ষেত্রে একান্ত ভাবেই অনুপস্থিত থেকেছে। তাই এখানকার শেক্সপীয়র প্রভাব সম্পূর্ণতই প্রাণহীন অনুকরণ-সর্বস্বতায় গতি-বিযুক্ত। এছাড়াও শেক্সপীয়রের 'দি কমেডি অব এররস্', 'দি উইণ্টার্স টেল' এবং 'পেরিক্লিস' ইত্যাদি নাটকের অনুসরণে জমিদার হরবিলাস কর্তৃক হারানো পুত্র-কন্যাকে ফিরে পাওয়ার কাহিনীটিকে গড়ে তোলা হয়েছে।

আবার 'সিম্বেলিন' নাটকের অনুরূপে হরবিলাস কর্তৃক লীলাবতীর সঙ্গে কুলীন-পাত্র নদেরচাঁদের বিয়ে দেওয়ার দৃঢ় সংকল্পের ঘটনাটি তৈরী করা হয়েছে। 'সিম্বেলিন' নাটকে ঐ ঘটনাটি ঘটেছে এই ভাবে: ব্রিটেনের রাজা সিম্বেলিন তাঁর কন্যা ইমোজেনকে বিয়ে দিতে চান রাণীর পূর্বতন স্বামীর পুত্র ক্লোটেনের সঙ্গে, অথচ ইমোজেন বিয়ে করতে চায় অন্য এক যুবক পসথুমাস লিওনেটাস্কে।

এরপর ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মার্চ দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক' প্রহসনটি

প্রকাশিত হয়। এটি সেকালের ঘরজামাই রাখার রীতিকে ব্যঙ্গ করে এবং কোলকাতার কোনো এক পরিবারে এই ধরণের ঘরজামাই রাখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দীনবন্ধু নাটকটি রচনা করেছিলেন। এছাড়া এই ধরণের ঘরজামাই সমস্যা ছিলো বাঙালীর নিজস্ব ঘরোয়া সমস্যা এবং সপত্নী কলহ-ক্লান্ত পরিবার বাঙলা দেশে এককালে আদৌ অপ্রতুল ছিলো না। অতএব এই নাটকের সংলাপ বা ভাব-সৃষ্টির জন্যে দীনবন্ধুকে শেক্সপীয়রের কাছে বিশেষ যেতে হয় নি। কেবলমাত্র তাঁর 'দি টেমিং অব দি শ্রু' নাটকের দর্পিতা, কলহ-কুশলা এবং কটুভাষিণী ক্যাথারিনার সঙ্গে 'জামাই বারিক'-এর কামিনীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

দীনবন্ধুর শেষ নাটক 'কমলে কামিনী নাটক' মৃত্যুর দু-মাস পূর্বে অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত। এই নাটক যখন দীনবন্ধু লিখছেন তখন মৃত্যুর কালো ছায়া তাঁর জীবনের ঈশান কোণে ঘোর হয়ে এসেছে। এই অবস্থায় নাটক লেখার উদ্যমেও কিন্তু তিনি শেক্সপীয়রকে ভুলতে পারছেন না। তাঁর 'কমলে কামিনী নাটকে'র আখ্যাপত্রে 'ম্যাকবেথ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নাট্য-বক্তব্যের মটো [Motto] প্রকাশ করেছেন। লাইন কটি হচ্ছে :

Dun. Dismay'd not this
Our captains, Macbeth and Banquo ?
Serg. Yes ;
As sparrows eagles, or the hare the lion. [1. II.

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নাট্যকার ম্যাকবেথের মতো এখানেও বীররসকে প্রাধান্য দেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর করে উঠতে পারেন নি। যদিও তিনি নাটকের অন্যতম বীর চরিত্র ও মণিপুর রাজ্যের সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডিবাহনকে ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কোর সদৃশে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা যে বিশেষ সার্থক হয়েছিলো তা মনে হয় না।

মণিপুরের রাজমহিষী গান্ধারীকে লেডী ম্যাকবেথের মতো করে আঁকার চেষ্টা কোনো কোনো ক্ষেত্রে করা হয়েছে। ক্ষমার অযোগ্য পাপকর্ম করে লেডী ম্যাকবেথ যেমন অনুতাপের বিষে, বিবেকের দংশনে জ্বলে পুড়ে মরেছেন; রাত্রের ঘুম, দিবসের চিন্তা সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে,—শেষে তিনি উন্মাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, গান্ধারীও ঠিক সেইরূপ সপত্নী-পুত্রকে হত্যার চক্রান্ত করে

সমস্ত মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর সম্বন্ধে সুশীলা বলেছে: 'সেই অবধি রাণীর দুই চক্ষে শতধারা পড়ছে, বলচেন কত পাপ করেছিলেম তাই এমন কুপুত্র জন্মেছে। রাণী ত্বরায় শক্ট রোগে অভিভূত হবেন, কারণ তিনি নিস্তব্ধ হয়ে আছেন, আহারও নাই নিদ্রাও নাই' [১ম অঙ্ক।২য় গর্ভাঙ্ক]। অবশ্য এখানে রাণী গান্ধারীর মৃত্যু হয়নি, তবে নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক-এ রাণীর উন্মাদ অবস্থার আচরণের সঙ্গে লেডী ম্যাকবেথের এই ধরণের আচরণের অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এছাড়াও এখানে রাণীর কিছু কিছু সংলাপ লেডী ম্যাকবেথ অথবা কোথাও ম্যাকবেথের সংলাপের যেন হুবহু মর্মানুবাদ। ম্যাকবেথ বা লেডী ম্যাকবেথের পাপবোধের অনুশোচনা সৃষ্টি হয়েছে স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা ডানকানকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করার পর থেকেই এবং এখানে এই 'কমলে কামিনী নাটকে' গান্ধারীর সপত্নী-পুত্রকে হত্যা করার চক্রান্ত থেকে। এখন আমরা গান্ধারীর সংলাপগুলি উদ্ধৃত করে 'ম্যাকবেথ' নাটকের সঙ্গে তার সাদৃশ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করবো। 'কমলে কামিনী নাটকে'র সংলাপগুলি চতুর্থ অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক থেকে গৃহীত হলো:

ক. 'রাজা। এ কি ভয়ানক ব্যাধি; মহিষী নিদ্রিতা কি জাগ্রতা নির্ণয় করা যায় না। মহিষীর চক্ষু কখন উন্মীলিত, কখন মুকুলিত। নিদ্রিতাবস্থায় ভ্রমণ করেন, নিদ্রিতাবস্থায় জাগ্রতের ন্যায় কথা কন।'

খ. একই দৃশ্যে রাণী গান্ধারী বলছেন:

'..... জল দাও, এক কলসী জল দাও, সহস্র কলসী জল দাও—আরো জল। গোমুখী হতে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গঙ্গার যত জল আছে একেবারে ঢেলে দাও—ও মা!'

'ম্যাকবেথ' নাটকের পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে লেডী ম্যাকবেথের পরিচারিকা এবং ডাক্তার তাঁর সম্বন্ধে ঠিক এই ধরণের কথা বলেছে।

'*Lady M.* Here's the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Oh, Oh, Oh!'

এরপরের লাইনেই গান্ধারী আবার বলেছেন:

'পাপের প্রাণ পোড়ে না কেবল পরিতপ্ত হয়। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, প্রাণ একেবারে জ্বলে গেল। জল দাও, জল—দাও—অনন্তসীমা, অতলস্পর্শ, সমুদায় শীতলসাগর শুষ্ক করে জল দাও,

পাপের আগুন নেবে না। হে সুশীতল নীলাম্বুনিধি! পাপীয়সীর পাপানলে তোমার নির্বাপিকাশক্তি তিরোহিত হল।',

এর সঙ্গে তুলনীয় 'ম্যাকবেথে'র উক্তি :

'Will all great Neptune's ocean wash this blood
Clean from my hand ? No ; this my hand will rather
The multitudinous seas incarnadine,
Making the green one red,' 2. II.

দীনবন্ধু এবং শেক্সপীয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ কালের এই মানস-নৈকট্য লক্ষ্য করে জনৈক সমালোচক সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন : 'দীনবন্ধুর নাটকে শেক্সপীয়রের কাহিনীর কিছু প্রভাব, প্লটের জটিলতা, জন্মবৃত্তান্ত ও প্রকৃত পরিচয়ের গোলমাল ইত্যাদি থাকলেও তা দীনবন্ধুব নাট্যপ্রতিভার স্বরূপ-লক্ষণ নয়। দেশীয় নকশা-ব্যঙ্গকৌতুকই তাঁর নাটকের মূল প্রেরণা, অবশ্য মধুসূদনের প্রহসন দুটি তাঁর পথনির্দেশ করেছিল। একমাত্র নিমচাঁদের অবিস্মরণীয় চরিত্র-সৃষ্টিকালেই তিনি অনেকাংশে শেক্সপীরীয় ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।'[৩১] কিন্তু সে যাই হোক, আমরা দীনবন্ধুর সমস্ত নাট্যকর্ম পর্যালোচনা করে দেখতে পেলাম যে, মৃত্যুর একেবারে দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হয়েও দীনবন্ধু শেক্সপীয়রকে ছাড়তে পারছেন না। জ্ঞানার্জনের প্রাক্-উষা কাল থেকে জীবনের সন্ধ্যা-সময় পর্যন্ত শেক্সপীয়র ছিলেন দীনবন্ধুর অন্তরঙ্গতম মানস-অভিভাবক। দীনবন্ধুর নাট্যচেতনায় এই শেক্সপীয়র-অভিব্যক্তি প্রশংসনীয় বিস্ময় উদ্রেক করলেও শিক্ষিত বাঙালীর কাছে সেদিন তা নতুন কিছু ছিলো না। কারণ, হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র দীনবন্ধু ডিরোজিও, রিচার্ডসন প্রমুখের সৃষ্ট শেক্সপীয়রীয় বাতাবরণের মধ্যে লালিত হয়ে কখনও শেক্সপীয়রকে ভুলতে বা অবহেলা করতে পারেন নি। দীনবন্ধু উক্ত পরিমণ্ডলে সাবালকত্ব অর্জন করেছেন এবং হয়েছেন নাট্যকার, এমতাবস্থায় শেক্সপীয়র থেকে কি ভাবে দূরে সরে থাকা যায়?

ঘ.

: শেক্সপীয়র ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক

বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদাদা এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর [৪ঠা মে ১৮৪৯-৮ঠা মার্চ ১৯২৫] 'অনুবাদ নাটক', 'গীতিনাট্য', 'প্রহসন', 'ইতিহাসাশ্রিত নাটক, ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় তেত্রিশখানি নাট্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এই নাট্যসাহিত্য-চর্চার আধেয় ছিলো প্রধানত দুটি : ১। তৎকালের অনুষঙ্গে উদ্বেল দেশপ্রেম এবং ২। মূলত ফরাসী-সংস্কৃত-ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার সুপরিচিত কিছু নাটকের স্বী-করণাত্মক অনুসরণ ও অনুবাদ। এই দুই আপাত-প্রত্যক্ষ বৈশিষ্ট্যের জন্যে কোনো কোনো সমালোচক বলতে চেয়েছেন যে : 'কোন মৌলিক প্রতিভার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি তাঁহার কোন সুগভীর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় না, কিংবা তাঁহার জীবনবোধ ব্যক্তি অথবা সমাজজীবনের সুগভীর স্তরও স্পর্শ করিতে পারে নাই—অনুকরণ ও অনুবাদই তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, ... বিশেষতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে মৌলিক প্রতিভার প্রেরণা ছিল না;'[৩২] কিন্তু এই মন্তব্যকে আমরা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে মৌলিক প্রতিভা না থাকলে, নাটক লেখার ও নাট্যাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নাট্যরস-পিপাসার বেগ নিবৃত্ত করার এমন বহুতর আয়োজনের ব্যবস্থা তিনি করতে পারতেন না। দ্বিতীয়ত, 'পুরুবিক্রম' বা 'সরোজিনী' ইত্যাদি নাটকগুলিতে তিনি যে বিশিষ্ট ও নিজস্ব পদ্ধতিতে অনুসরণ-কর্মটি সম্পাদন করেছেন তা উন্মেষশালিনী বুদ্ধির সৃষ্টি হিসেবেই গৃহীত হওয়ার যোগ্য। তাই দেশাত্মবোধ এবং অনুবাদ-প্রীতি তাঁকে নাটক রচনায় উদ্দীপনা যোগালেও তৎকালের জীবনবোধ এবং যুগচেতনা তাঁর হৃদয় ও বুদ্ধি উভয়কেই যে পরিপুষ্ট করেছিলো সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। এরই ফলে আমরা তাঁর হাত থেকে পাই : **এক.** বেশ কিছু সার্থক প্রহসন, **দুই.** প্রতীচ্য-নাট্যশাস্ত্র-সম্মত সুষ্ঠু-কলাঙ্গিকসমৃদ্ধ নাটক, **তিন.** তাঁর নাটকে মেলোড্রামার অভাব।

এইসব সত্ত্বেও কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তৎকালের বাঙলা নাটককারদের কাছে চরম আদর্শ যে শেক্সপীয়র, তাঁর কাছ থেকে বিশেষ তেমন ঋণ গ্রহণ করেন নি। এই রকম অভাবাত্মক মন্তব্য করার পরেও দেখতে পাচ্ছি যে, নেই নেই করেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথে শেক্সপীয়র একেবারে অনুপস্থিত থাকেন নি।

প্রথমত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একমাত্র শেক্সপীয়র অনুবাদ হচ্ছে *Julius Caesar* নাটক। এটি মূল নামেই প্রথমে ১৩১১ সনের 'ভারতী'তে প্রকাশিত

হয় এবং ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর গ্রন্থের রূপ নেয়। অনেকেই বলতে চান যে শেক্সপীয়রের এই বিখ্যাত ট্রাজিডিটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতেই সবচেয়ে সার্থক ভাবে অনূদিত হয়েছে। অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুই ভাষার শক্তি-সামর্থ্য-ওজোগুণ যথার্থভাবে উপলব্ধি করে, ইংরেজীর মূলের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে, তার আন্তর-সত্যকে যতদূর সম্ভব বাঙলায় রূপান্তরিত করেছেন। এখানে আমরা শেক্সপীয়রের মূল ও তাঁর অনুবাদের পাশাপাশি উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টিকে একটু বোঝবার চেষ্টা করবো। প্রথমে *Julius Caesar* নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য থেকে ফ্লেভিয়াসের উক্তিতে পাচ্ছি :

Flav. Hence ! home, you idle creatures, get you home.
Is this a holiday ? What ! know you not,
Being mechanical, you ought not walk
Upon a labouring day without the sign
Of your profession ? Speak, what trade art thou ?

এর অনুবাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই ভাবে করেছেন :

বাড়ী যা, বাড়ী যা তোরা যত অকর্মার দল।
আজ কি ছুটির দিন ? তোরা সব কারিগর লোক
—তোরা কি জানিস নারে উচিত না করমের দিনে
পথ দিয়া চলা হেন, নিজ নিজ ব্যবসায়-চিহ্ন ?
বল্ তুই কি করিস ? কিসের ব্যবসা তোর বল্ ?

এর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জুলিয়াস সীজারের প্রথম অঙ্ক-এ ক্যাসিয়াসের উক্তির ভাষান্তর করছেন এই ভাবে :

দেখিছ না সখা তুমি, সঙ্কীর্ণ এ ধরা পৃষ্ঠ
চাপিয়া বসিয়া আছে বিরাট সীজার ?
আর মোরা ক্ষুদ্র জীব পায়ের তলার নীচে
ঘুরিয়া বেড়াই হীন মরণ যাচিয়া ॥

সেখানে মূলে শেক্সপীয়র বলছেন :

Cas. Why, men, he doth bestride the narrow world,
Like a Colossus, and we petty men
Walk under his huge legs, and peep about.
To find ourselves dishonourable graves. [1. II.]

এই অনুবাদের ক্ষেত্রে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৬ মাত্রার অমিত্রাক্ষর ব্যবহার

করেছেন। এই দীর্ঘ ছত্র প্রয়োগ ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের পক্ষে ১৪ মাত্রার অমিত্রাক্ষর অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। এর ফলে তিনি শেক্সপীরীয় ব্ল্যাঙ্ক ভার্স প্রায় ছত্রে ছত্রে অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছেন। বাঙলা অনুবাদ-সাহিত্যে, বিশেষতঃ শেক্সপীয়র অনুবাদ সাহিত্যের সহজাত আবেগাতিরেক ও তজ্জাত বাগ্‌বাহুল্য দোষ থেকে তাঁর রচনা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যথাযথ অনুবাদই তাঁর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য এবং এক্ষেত্রে তিনি সার্থকতায় উপনীত হয়েছেন।··জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিভা মধ্যচারী, তাঁর শেক্সপীয়র অনুবাদ সুখপাঠ্য, যথাযথ।'[৩৩] অবশ্য এই সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, 'জুলিয়াস সিজারের হত্যাদৃশ্য, সিজারের মৃতদেহ দর্শনে অ্যান্টনিওর উক্তি, ব্রুটাসের উক্তি—ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুবাদ যথাযথ হলেও উচ্চমানের নয়। বাচ্যার্থ এ-সকল স্থলে যথাযথ অনুসৃত হয়েছে, কিন্তু ব্যঙ্গার্থ তুল্যমানের হয় নি।'[৩৩] অধিকন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদের পাত্রপাত্রীদের অনেকখানি বাঙালী করে ফেলেছেন;—বিশেষ করে সম্বোধনের ক্ষেত্রে ইংরেজী বাঙলা মিশে এমন একটা চেহারা নিয়েছে যে, কোন কোন জায়গায় বেশ কানে লাগে, হাসিও পায়। যেমন, পোর্শিয়া তার স্বামীকে সম্বোধন করেছে 'প্রাণসখা', 'প্রাণেশ্বর', 'নাথ' বলে। আবার কোথাও বা 'ব্রুটাস গো' বা এর উত্তরে 'কেন গো পোর্শিয়া' ইত্যাদি। এর জন্যে কোথাও কোথাও মনে হয়েছে যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষা বুঝি প্রাকৃতজনের জীবন-সন্নিকটবর্তী নয়, তাতে স্বাচ্ছন্দ্যও নেই। কিন্তু তা ঠিক নয়, কারণ, ভাবপ্রবণতা ও যাত্রাগানের দেশীয় ঢিলে-ঢালার বিপরীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই কি অনুবাদ নাটক, কি মৌলিক নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম সার্থকভাবে ইংরেজী নাট্যকলাকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু 'তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এবং জনচিত্তে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তারকারী এবং রঙ্গমঞ্চের সাহায্যগ্রহণকারী গিরিশ-চন্দ্রের সাধনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধারা দ্রুত আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।'[৩৪]

শেক্সপীয়রের নাটকের এই প্রত্যক্ষ অনুবাদের পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি মৌলিক নাটক নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হয়। সেটি হচ্ছে, ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'অশ্রুমতী নাটক'। অনেকে এটিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটক বলতে চেয়েছেন। এখানে নাট্যকার শেক্সপীয়রের প্রেরণাকে যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মীকরণ করেছেন। শেক্সপীয়রের অমর ট্রাজিডি 'ওথেলো'-র প্রভাবই এখানে বিশেষ স্পষ্ট হয়ে

উঠেছে। যেমন, এর অন্যতম প্রধান চরিত্র 'সেলিমের মধ্যে ঈর্ষা ও বিশ্বাসের যে অস্থির দোলায়মান অবস্থা নাট্যকার দেখাইয়াছেন তাহা খুবই চমৎকার হইয়াছে। ওথেলোর মতই সে ঈর্ষা বিষে জর্জরিত হইয়া নিতান্ত অন্যায় ভাবে প্রণয়িনীকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং পরে অনুতাপের সুতীব্র অগ্নিতে নিজেকে দগ্ধ করিয়াছে।'[৩৫] এর অতিরিক্ত এই যে, 'ওথেলো' নাটকের ডেসডেমোনার মতো অশ্রুমতীও ধর্ম-ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিজাতীয় পুরুষকে হৃদয় দান করেছে। সরলতা ও চারিত্র্যমহিমার দিক থেকেও এই দুই চরিত্রের নৈকট্য অনেকখানি। তা-ছাড়া প্রেমাস্পদের কাছ থেকে চরম আঘাত পেয়ে কি অশ্রুমতী, কি ডেসডেমোনা কেউই তাদের প্রণয়ীদের বিরুদ্ধে কোনোও অনুযোগ আনে নি বা পরুষবাক্য প্রয়োগ করেনি। এবং পরে যখন সব চক্রান্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে তখন কি ওথেলো, কি সেলিম উভয়েই অনুশোচনার আগুনে নিজেদের তিল তিল করে পুড়িয়েছে।

'অশ্রুমতী'র ফরিদ খাঁ-র চরিত্রটি পরিকল্পিত হয়েছে অনেকখানি যেন 'ওথেলো' নাটকের ইয়াগো চরিত্রের অনুসরণে। কারণ ওথেলোর মতো সেলিমের মনে সন্দেহ জাগিয়েছে এই ফরিদ খাঁ এবং বীর ওথেলোর মনকে ডেসডেমোনার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলার জন্যে সেখানে যেমন ব্যবহৃত হয়েছিলো একটি ছোট রুমাল, এখানে তেমনি ফরিদ খাঁ ব্যবহার করেছে অশ্রুমতীকে লেখা পৃথ্বীরাজের একটি প্রেম-পত্র। তবে ইয়াগো সম্পর্কে যেমন বলা হয়ে থাকে যে সে [ইয়াগো] হচ্ছে 'motive-hunting of a motiveless malignity'—তেমন মূল্যায়ন ফরিদ খাঁ চরিত্র সম্বন্ধে করা যায় না। কারণ, যে তরবারি এক কোপে শিরশ্ছেদ করতে পারে তার তীক্ষ্ণতায়ও একটা ভীষণ এবং ধ্বংসাত্মক উজ্জ্বলতা আছে—এই তুলনায় শয়তানেরও একটা চরিত্র [character] আছে,—এবং তারই জোরে শয়তান ইয়াগো বিশ্বসাহিত্যে অমরতা লাভ করেছে, কিন্তু ফরিদ খাঁ সেই সমুন্নতিতে পৌঁছোতে না পেরে 'পেজোমি' করার একটা যন্ত্রে পরিণত হয়েছে মাত্র।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আর একটি ছোট গীতিনাট্য রচিত হয়েছিলো ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে। এই নাটকটিই প্রায় উনিশ বছর পরে [১৮৯৯] 'পুনর্বসন্ত' নাম নিয়ে পরিবর্ধিত আকারে আবার প্রকাশিত হয়। এই গীতিনাট্যটিতে শেক্সপীয়রের *A Midsummer-Night's Dream*-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পরিশেষে অনুবাদ সহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমগ্র নাটকগুলি পর্যালোচনান্তে

একথা আমরা বলতে পারি যে, নাটক রচনার ক্ষেত্রে ফরাসী সাহিত্যের পরিহাস-প্রসঙ্গ এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ধ্রুপদী রসবন্ধন তাঁকে যতখানি আকর্ষণ ও পরিপ্লুত করেছিলো, শেক্সপীয়রের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী সেই পরিমাণে তাঁকে উদ্বোধিত করতে পারে নি। ফলে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকসমূহে শেক্সপীয়রের প্রভাব তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট পরিমাণেই ক্ষীণ।

ঙ.

: শেক্সপীয়র ও গিরিশচন্দ্রের নাটক

বাঙলা নাট্যসাহিত্যে ও মঞ্চ-জগতে একাধারে নাট্যকার, নট ও নাট্য-প্রয়োগ শিল্পী এই তিন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যশালায় নতুন প্রাণাবেগ সঞ্চার করেছিলেন যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ [১৮৪৪-১৯১২ খ্রীস্টাব্দ], তিনি অনধিক প্রায় আশিখানি নাটক-প্রহসন রচনা করেছিলেন। এই সৃষ্টিকর্মের মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক নাটক আছে, কিছু অনুবাদ নাটক আছে, তেমনি আছে তৎকালে প্রচলিত কিছু বিখ্যাত উপন্যাস এবং মহাকাব্যের নাট্যরূপ। অধিকন্তু সমসাময়িক সমাজ-সমস্যা বা প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত কয়েকটি প্রহসন বা 'পঞ্চরঙ' জাতীয় রচনাও ঐ তালিকার সঙ্গে যুক্ত হবে। এই বিরাট নাট্য-রচনা সম্ভারের সঙ্গে সমীভূত হয়েছিলো তাঁর ব্যক্তিগত অভিনয় প্রতিভা এবং একজন দক্ষ প্রয়োগ শিল্পী হিসেবে বঙ্গরঙ্গ মঞ্চের নিজস্ব ভাষা সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান। ফলে, গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্য রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে বা তাদের বিশ্লেষণ করতে হলে উক্ত দু-দিকেই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এবং তা করতে গেলে স্বভাবতই দেখা যাবে যে গিরিশচন্দ্রের নাটক-প্রহসনাদি সেদিনের মঞ্চ এবং তার পৃষ্ঠপোষক দর্শকসাধারণের অভিরুচি -নিরপেক্ষ 'নিজস্ব' সাহিত্য হয়ে উঠতে বহুক্ষেত্রেই বাধা পেয়েছে। এরই সঙ্গে যাকে 'বক্স অফিস হিট্' বলে তা এবং নাটক রচনা ও তার অভিনয় সম্পর্কে জনরুচির কাছ থেকে নগদ-নারায়ণ পাওনার বিষয়েও তাঁকে প্রতিমুহূর্তে সচেতন থাকতে হয়েছিলো।

এখন দেখা যাক যে গিরিশচন্দ্রের সম-সময়ে দেশীয় জনরুচি এবং তাদের বোধ ও বুদ্ধির প্রবাহ কোন খাতে বয়ে গেছে। এ সম্পর্কে 'বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস'কার বলেছেন : "গিরিশচন্দ্রের যখন আবির্ভাব হয়, তখনও

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের দুইটী ধারা পরস্পর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল—একটি গীতাভিনয়ের ধারা ও অপরটি ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব-সৃষ্ট বাংলা নাটকের ধারা। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ মাইকেল-দীনবন্ধু প্রবর্তিত ধারার সঙ্গে মনোমোহন বসু প্রমুখ নাট্যকারগণ প্রবর্তিত 'নূতন যাত্রা' বা গীতাভিনয়ের ধারাটির মধ্যে যোগ স্থাপন করাই গিরিশচন্দ্রের জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তি।...... মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকখানির মধ্যে নৃত্যগীত যুক্ত করিয়া ইহাকে একখানি পূর্ণাঙ্গ যাত্রার রূপ দিয়া তিনি [গিরিশচন্দ্র] যাত্রার দলে ইহা সর্বপ্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহার যাত্রাভিনয়ের এই সংস্কার শেষ জীবন পর্যন্ত কোনদিনই সম্পূর্ণভাবে তাঁহার মধ্য হইতে বিদূরিত হইয়া যায় নাই।...... এবং এই সংস্কারের জন্যই তিনি সংস্কৃত নাটক দ্বারা একেবারেই প্রভাবান্বিত হন নাই। ... কারণ, তিনি জানিতেন যে সংস্কৃত নাটক বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের আদর্শের অনুকূল নহে। গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর জাতীয় রসচৈতন্যের যে মূল ধারাটি অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের কোনই স্থান ছিল না। যে জাতীয় রসপ্রেরণায় গিরিশচন্দ্র বাল্মীকি-বেদব্যাসকে পরিত্যাগ করিয়া কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই তিনি সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের বিপুল সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীর মঙ্গলকাব্য পাঁচালী কবিওয়ালার গান ইত্যাদির বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন।"[৩৬] এবং ঠিক ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গী ও বাস্তববোধের প্রেরণাতেই তখনকার দিনের শিক্ষিত বাঙালীর কাছে প্রিয় যে য়ুরোপীয় বা শেক্সপীয়রীয় নাট্য-সাহিত্যের রস-সংস্কার তাকেও গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকাবলীতে মেনে নিতে দ্বিধা করেন নি। ফলে, তাঁর নাটকের বিদূষক, চরিত্র সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রের চেয়ে গোত্রে এবং আচরণে শেক্সপীয়রের নাটকের 'ফুল'-এর নিকটতর আত্মীয়। এ বিষয়ে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে: 'মহাকবি কাশীরাম দাস কৃত্তিবাস আমার ভাষার বনিয়াদ। আমার লেখায় তাঁদের প্রভাবও দেখতে পাবে।' আবার অন্যদিকে 'মহাকবি শেক্সপীয়রই আমার আদর্শ। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেছি।'[৩৭] অতএব গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব বক্তব্যকে অনুধাবন করে তাঁর রচিত নাটকাবলী থেকে শেক্সপীয়রের নাটকের প্রভাবকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

"শেক্সপীয়রের নাটকসমূহ দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হইয়া

গিরিশচন্দ্র যে সকল নাটক রচনা করেন, 'জনা' তাহাদের অন্যতম। ইহার মূল আখ্যান-ভাগ কাশীরাম দাসকৃত মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব হইতে গৃহীত হইলেও, ইহার নায়িকা চরিত্র-সৃষ্টির প্রেরণা সম্পূর্ণভাবেই পাশ্চাত্ত্য আদর্শ হইতে আসিয়াছে। 'ম্যাকবেথে'র বঙ্গানুবাদ রঙ্গমঞ্চে দর্শকদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিল না দেখিয়া গিরিশচন্দ্র আর কোন ইংরেজি নাটকের এমনভাবে ভাবানুবাদ করিয়া অভিনয় করিবার প্রয়াস পান নাই; কিন্তু দেশীয় ভিত্তি এবং পরিবেশ সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রাখিয়া ইংরেজি আদর্শের চরিত্র সৃষ্টি দ্বারা যে কয়েকখানি নাটক তিনি এই সময়ে রচনা করেন, 'জনা' তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। দেশীয় পাত্রে বৈদেশিক রস পরিবেশন করিবার যে প্রয়াস ইতিপূর্বেই কাব্যের ক্ষেত্রে সার্থকতা অর্জন করিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র তাহাই নাট্য-সাহিত্যে সার্থক করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন। এই বিষয়ে তাঁহার 'জনা'য় তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।"[৩৮] এখন এই মন্তব্যকে স-উদাহরণ প্রমাণ করা যেতে পারে।

গিরিশচন্দ্র 'জনা' [১৮৯৪] নাটকের নাম-ভূমিকার চরিত্রটি শেক্সপীয়রের একাধিক নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের সমবায়ে তৈরী হয়েছে। যেমন, অর্জুনের প্রতি 'জনা' যে প্রতিহিংসামূলক মনোভাব পোষণ করে প্রায় উন্মাদিনী হয়ে উঠেছেন তার অনেকটাই শেক্সপীয়রের 'কিং রিচার্ড দি থার্ড' নাটকের রাজা ষষ্ঠ হেনরীর বিধবা পত্নী মার্গারেটের আচরণের অনুরূপ। স্বামী এবং পুত্রশোকে ক্ষিপ্তা মার্গারেট যেমন ঐ নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বলেছেন:

> If heaven have any grievous plague in store
> Exceeding those that I can wish upon thee,
> O, let them keep it till thy sins be ripe,
> And then hurl down their indignation
> On thee, the troubler of the poor world's peace !
> The worm of conscience still be-gnaw thy soul !
> Thy friends suspect for traitors while thou liv'st,
> And take deep traitors for thy dearest friends.
> No sleep close up that deadly eye of thine,
> Unless it be while some tormenting dream
> Affrights thee with a hell of ugly devils !'

এইভাবেই 'জনা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক থেকে পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক পর্যন্ত জনার আচরণ সর্বত্রই উক্ত ভাষায় বর্ণিত ভাবের অনুরূপ, এবং তিনি উক্ত ভাবে উব্‌বুদ্ধ হয়েই যেন বলেছেন :

পুত্রশোকাতুরা মাতৃকোপানলে,
দেখি পরিত্রাণ পাও কোন্ দেব-বলে।
যাই যাই,
পুত্রহারা অরাতি আছে জীবিত এখন। ৩।৪

কিংবা :

প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা,
মার প্রাণে প্রতিহিংসা জ্বলে
পুত্রঘাতী পাবে না নিস্তার,
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা জ্বলে। ৫।৩

এইরূপ প্রতিহিংসার মনোভাব যে পুত্রশোকের সৃষ্টি করে তার চেহারা সমস্ত বিশ্বমাতৃত্বের ক্ষেত্রেই একরূপ। কারণ, ঠিক ঐ ভাবেই মার্গারেট বলেছেন :

For Edward our son, that was Prince of Wales,
Die in his youth by like untimely violence !' 1. III

স্বামি পুত্রের অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রাণী মার্গারেট যে রকম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলেন,—ওপরে উদ্ধৃত অংশটুকুতে জনাকে ঠিক যেন সেই রকম চেহারাতেই দেখতে পাচ্ছি। অধিকন্তু জনার চরিত্রে যে ধরণের পুরুষালি তেজস্বিতা রয়েছে তাও মার্গারেটের সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য জনার এই আচরণকে সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, 'জনার অতি-নাটকীয় বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি ও কার্যসমূহ এদেশের নারীত্বের আদর্শে কৃত্রিম ও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তবে মার্গারেট যেমন স্বামি-পুত্র শোকে ক্ষিপ্তা, জনাও তেমনই পুত্র শোকে ক্ষিপ্তা বলিয়া তাঁহার উক্তিগুলি সর্বাংশে যুক্তি-তর্কের দিক দিয়া বিচারসহ নহে।'[৩৯] ঐ নাটকে মার্গারেটের উক্ত আচরণ সম্বন্ধে যেমন বলা হয়েছে :

Dorest. Dispute not with her ; she is lunatic. I. III.

জনা সম্বন্ধেও তেমনি বলা হয়েছে :

দূত। ভয়ঙ্করী কোথা হতে আসিয়াছে নারী
এলোকেশী আরক্ত নয়না' ...

… উন্মাদিনী উঠিল আবার,
থেকে থেকে করে বামা ভীষণ চীৎকার। ৪।১

অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণও জনা সম্পর্কে বলেছেন :

শ্রীকৃষ্ণ। খেদ কর শিবিরে যাইয়া।
আসে জনা উন্মাদিনী, …… ৩।৪

এছাড়াও শেক্সপীয়রের 'কোরিওলেনাস' [*Coriolanus*] নাটকের প্রভাব জনা চরিত্রের ওপর বেশ স্পষ্ট ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। ঐ নাটকের নায়ক কোরিওলেনাসকে যুদ্ধে পাঠাতে তাঁর স্ত্রী ভার্জিলিয়া [Virgilia] যেমন ভয় পেয়েছে, প্রবীরের স্ত্রী মদনমঞ্জরীও তেমনি শঙ্কিত হয়েছে। এই যুদ্ধ ও মৃত্যু-ভীতিকে ভৎর্সনা করে কোরিওলেনাসের মা ভল্যুমনিয়া [Volumnia] তাঁর পুত্রবধূ ভার্জিলিয়াকে যেমন বলেছেন :

Vol. Away, you fool. It more becomes a man
Than gilt his trophy. The breasts of Hecuba,
When she did suckle Hector, look'd not lovelier
Than Hector's forehead when it spit forth blood
At Grecian sword, contemning I. III.

ঠিক এই ভাবেই তাঁর পুত্রবধূ মদনমঞ্জরীকে বলেছেন :

জনা। এনেছি কি পুত্রবধূ নীচ কুল হতে
যুদ্ধকার্য নিত্য যেই ঘরে,
আছে তথা অমঙ্গল আশঙ্কা সর্বদা,
কিন্তু তোর সম,
শুনি দূর সমীরণ-ধ্বনি,
রোদনের ধ্বনি অনুমানি—
অকল্যাণ চিন্তা কেবা করে
আরে হীনমতি,
পতি ভক্তি এই কি তোমার!
কেবা সে অর্জুন—কে বা নারায়ণ
পতি শ্রেষ্ঠ সবা হতে। ২।১

আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে রাজমহিষী জননী যেমন ক্ষত্রিয় নারী, ঠিক তেমনি ভল্যুমনিয়াও বীরের মাতা। এঁর বীরত্বব্যঞ্জক বাক্য এবং পুত্র

কোরিওলেনাসের প্রতি উৎসাহবাণীর সঙ্গে জনার কণ্ঠস্বর যেন একই সুরে বেজেছে। অন্যদিকে মদনমঞ্জরী যেমন যুদ্ধ-বিরোধী এবং স্বামীর বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত, ঠিক তেমনি কোরিওলেনাসের স্ত্রী ভার্জিলিয়াকে দেখা যায় যে স্বামীর বিপদ আশঙ্কা করে তাঁকে যুদ্ধে যেতে নিরস্ত করেছেন।

অন্যদিকে পুত্র প্রবীরের প্রতি জনার উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা যা শুনতে পাচ্ছি, তা এইরকম :

জনা। বৎস, ত্যজ মনস্তাপ,
প্রবল প্রতাপ পাণ্ডব ফাল্গুনী শুনি।
তুমি নৃপতির নয়নের নিধি,
তাই রাজা নিবারে তোমারে
সমরে যাইতে যাদুমণি।
বলবানে পূজা—দান আছে এ নিয়ম
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর। ৪।১

এ যেন কোরিওলেনাসের তেজস্বিনী মাতা ভল্যুমনিয়ার কণ্ঠস্বরের যথার্থ প্রতিধ্বনি। ঠিক এই ভাবে নাটকের অন্যত্র ভীত মদনমঞ্জরী যখন শাশুড়ী জনাকে বলেছেন :

মদনমঞ্জরী। কৃষ্ণসখা অজেয় পাণ্ডব শুনি, রাণি,
তাই মা গো কেঁদে উঠে প্রাণ!
···মা হ'য়ে মা, অকূলে ফেল না দুহিতায়,
আপন নন্দনে, মা গো নাহি ঠেল পায়। ২।১

এর উত্তরে জনা তেমনি বলে উঠেছেন :

জন্মিয়াছ ক্ষত্রিয়ের কুলে,
মালা দেছ ক্ষত্রিয়ের গলে,
রণ শুনি' বিষণ্ণ হয়ো না বালা।
ক্ষত্রিয়ের নিত্য বাধে রণ ; ২।১

এই রকম করেই জনা আবার কখনও নিজে নিজেই স্বগতোক্তির মতো বলে উঠেছেন :

দেখছি আমি ক্ষত্রিয়-জননী নই,—চণ্ডালিনীর ন্যায় আমার আচার।
বীরমাতা হ'য়ে বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রের গৌরব-পথে কি কণ্টক হ'ব ?
কদাচ নয়,—জনার জীবন থাকতে নয়। ঐ

এরই সঙ্গে তুলনীয় রূপে আমরা ভল্যুমনিয়ার কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি :

To a cruel war I sent him, from whence he return'd his brows bound with oak. I tell thee, daughter, I sprang not more in joy at first hearing he was a man-child than now in first seeing he had proved himself a man.

Vir. But had he died in the business, madam, how then ?

Vol. Then his good report should have been my son ; I therein would have found issue. Hear me profess sincerely ; had I a dozen sons, each in my love alike, and had eleven die nobly for their country than one voluptuously surfeit out of action. 1. III.

এছাড়াও শেক্সপীয়রের অন্তত আরও দুটি নাটকের প্রভাব যে 'জনা' নাটকের ওপর পড়েছে তা অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না যেমন :

দৃশ্য পরিবর্তন—শ্মশান—সখিগণের ডাকিনী-বেশে পরিবর্তন

গীত

সামন্ত-সারঙ্গ—খেমটা

সখিগণ। মড়ার হাড়ের ফুলে মালা পরেছি গলায়,
নিয়ে মড়ার মাথা খেলি আয়।…
আয় লো বসি মড়ার বুকে,
চিতের ছাই আয় মাখি গায়।
হি হি হি হাসির ঘটায় খেলুক দামিনী,
নেচে নেচে আয় লো, যোগিনি, রণরঙ্গিণি,
নাড়ীর মালে, মড়ার ছালে ; আয় সজনি, সাজাই কায়। ৩।১

'ম্যাকবেথ' নাটকে ঠিক এই ধরণের পরিবেশে ডাকিনীদের কণ্ঠে গান শোনা গেছে :

1. *Witch.* Round about the cauldron go ;
In the poison'd entrails throw.

Toad that under cold stone
Days and nights had thirty-one
Swelt'red venom sleeping got
Boil thou first i' th' charmed pot. 4. I.

শেক্সপীয়রের অপর একটি নাটক 'এ মিড সামার নাইটস্ ড্রিম'-এ যে অদ্ভুত বনভূমির অবস্থান দেখা গেছে তার অনুসরণে 'জনা' নাটকের 'মায়া কানন'-টি নির্মিত হয়েছে [৩।১] এবং ঐ দৃশ্যে অবতীর্ণ 'নায়িকা ও সখিগণ' আচার-আচরণে শেক্সপীয়রের উক্ত নাটকের 'Titania, with her Train' [2. II.] -এর সমগোত্রীয়। এমন কি উভয়ে ব্যবহৃত গানের ভাবের মধ্যেও মিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অধিকন্তু, গিরিশচন্দ্রের এই 'জনা' নাটকের পরিসমাপ্তিতেও শেক্সপীয়রীয় নাট্যভাবের ছায়া লক্ষ্য করে কোন সমালোচক বলেছেন, নাটক শেষে "নীলধ্বজ মহিষী গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। অর্জুনের প্রতি গঙ্গার অভিশাপ। পরে কৈলাস-শিখরে জনা, প্রবীর ও মদনমঞ্জরীর ছায়ামূর্তি প্রদর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাজাকে বলিলেন: 'প্রপঞ্চ বুঝিয়ে ভূপ, মন কর স্থির।' মহাকবি শেক্সপীয়ার রচিত করুণরসাশ্রিত 'কিং লীয়ার' নাটকও এইরূপ শান্তিরসে সমাপ্ত হইয়াছে:

Kent. Vex not his ghost : O, let him pass! he hates him
That would upon the rack of this tough world
Stretch him out longer."[৪০] 5. III

কেউ কেউ গিরিশচন্দ্রের বিদূষক বা ঐ ধরণের হাস্যরস উদ্বোধক চরিত্র-গুলিকে শেক্সপীয়রের Fool-এর প্রভাব জাত বলে মনে করে থাকেন। নিরপেক্ষ বিচার করলে দেখা যাবে যে ঐ শ্রেণীর চরিত্র-সৃষ্টিতে শেক্সপীয়রীয় নাট্য-উদ্দীপনা প্রাথমিক পর্যায়ে হয়তো গিরিশচন্দ্রে অল্পবিস্তর সক্রিয় ছিলো; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ-বিষয়ের তিনি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এ সম্পর্কে সবচেয়ে সার্থক উদাহরণ হচ্ছে 'জনা' নাটকের রাজ-বয়স্য বিদূষক চরিত্র। এই নাটকের বিদূষক চরিত্র একান্তভাবে গিরিশচন্দ্রেরই নিজস্ব সৃষ্টি; এবং গিরিশচন্দ্রের এই মৌলিকতার কাছে শেক্সপীয়রের 'কিং লীয়ার' নাটকের 'ফুল' চরিত্রটিকে বহুলাংশেই যেন নিষ্প্রভ বলে মনে হয়।

এরপরে আমরা গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'প্রফুল্ল' [১৮৮৯]-তে

শেক্সপীয়রের প্রভাব কতখানি এবং কেমন ভাবে তা অনুভব করতে পারি সে বিষয়ে আলোচনা করবো। প্রথমত, গিরিশচন্দ্র তাঁর এই নাটকের যে ট্রাজিডির পরিকল্পনা করেছেন তা শেক্সপীয়রের পরিকল্পিত ট্রাজিডিরই অনুরূপ। শেক্সপীয়রের নাটকে, বিশেষত 'ম্যাকবেথ'-এ লক্ষ্য করি যে: 'The calamities proceed mainly from conscious, voluntary actions—actions expressive of character. In other words in Shakespearean tragedy Character is Destiny'[৪১] ঠিক এমনি ভাবেই যোগেশের চরিত্রগত ত্রুটিই সমগ্র 'প্রফুল্ল' নাটকটির বিষাদান্ত পরিণতির জন্য দায়ী; এখানে গিরিশচন্দ্র শেক্সপীয়রীয় ট্রাজিডির ধারাকেই নিজস্ব রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী স্বীকার করে নিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, 'ওথেলো' নাটকে ক্যাসিও মদ খেয়ে মাতলামি করার অপরাধে যেমন চাকরি-ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে এনেছে, সুনাম হারিয়ে হাহাকার করে উঠেছে, ঠিক তেমনি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় যোগেশ অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে নিজেকে আর তুলে দাঁড় করাতে পারলেন না; মদের নেশা তাঁর সব কিছুকেই নষ্ট করে দিলো। সুনাম পর্যন্ত হারিয়ে অনুশোচনায় যেন নিজেই নিজের মাথার চুল ছিঁড়েছেন; ভগ্নহৃদয়ে বলেছেন:

> যোগেশ। মান গিয়েছে, বুঝেছ পীতাম্বর, দুর্নাম রটেছে।··· সুনাম খুইয়েছি। সুনাম খুইয়েছি! জীবনের সার রত্ন হারিয়েছি! পিতৃবিয়োগে দরিদ্র হয়েছিলুম, কিন্তু পরশমণি সুনাম ছিল! সেই পরশমণি যাতে ঠেকেছে, সোনা হয়েছে—সে রত্ন আর আমার নেই।
> ২।২ ও ২।৪

ঠিক এই ভাষাতেই ওথেলোর মাননীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যাসিও বলেছে:

> '*Cas.* Reputation, reputation, reputation! O, I have lost my reputation! I have lost the immortal part of myself, and what remains is bestial. My reputation, Iago, my reputation! 3. III.

তৃতীয়ত, ইয়াগো যেমন ক্যাসিওকে মদ খেতে প্রলুব্ধ করে নাটকটিকে চরম বিষাদান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে, ঠিক তেমনি রমেশও যোগেশকে মদ খাইয়ে তার সর্বনাশ করেছে।

চতুর্থত, প্রফুল্ল নাটকের ভজহরি " 'শেক্সপীয়র রচিত Fool-এর নিকটতম

প্রতিবেশী'। শেক্সপীয়রের Fool এর মধ্যেও বাহিরের হাস্যরস দিয়া অন্তরের সুগভীর করুণ রস চাপা থাকে। সমালোচকের কথায় বলিতে গেলে 'দুঃখের আঘাতে কেহ সিনিক হয়, কেহ হিউমরিষ্ট হয়, ভজহরি সিনিক নয়, হিউমরিষ্ট। দুঃখের আলখাল্লাটা উল্টাইলেই দেখা যায় যে, সেটা বিদূষকের চাপকান। হাস্যরস ও করুণরস অদৃষ্টের যমজ সন্তান, একটু নিরিখ করিয়া দেখিলেই দু-জনের মুখের আদল ধরা পড়িবে'।"[৪২]

পঞ্চমত, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন: "এইরূপ মোহিনী ও রমেশ উভয়ই villain, কিন্তু মোহিনীর কন্যাস্নেহরূপ একটা ক্ষীণসূত্র ছিল, কিন্তু রমেশ 'কারুর নয়'। গিরিশ শেক্সপীয়রের Edward IV-এর সহোদর Richard Third-কে যোগেশের সহোদর রমেশরূপে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন: 'He has no mixture of common humanity, no regard for kindred nor posterity. He owes no fellowship with others, he is himself alone."[৪৩]

ষষ্ঠত, মহাকবি শেক্সপীয়রের 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে এণ্টোনিও যেমন নিজের আগামী বিপদের আশঙ্কায় বিষণ্ণভাবে বলেছেন: 'In sooth I know not why I am so sad.' [1. I.] ঠিক তেমনিই 'প্রফুল্ল' নাটকের শেষ ভাগে প্রফুল্ল আপন স্বামীর দুষ্ট কর্মের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে অজানা বিপদের আগমন-আশঙ্কায় বলে উঠেছে: 'আমি আর বাঁচবো না, আমার কোথায় ভরাডুবি হয়েছে।' [৫।১]। অধিকন্তু, প্রফুল্লর নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গটিকে বিচার করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন: 'সংসারে বিচার অনেক প্রকার আছে।···কিন্তু কবির বা কাব্যের বিচার [poetic justice] সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কাব্যকলা ও ধর্মনীতির সংমিশ্রণে যে বিচার দর্শকের মনে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করে, তাহাই কাব্যের বিচার। জীবনে কখন কখন এমন সকল ঘটনা ঘটে, যখন জীবন ধারণ বিড়ম্বনা, মনে হয় মৃত্যুই মঙ্গল—দণ্ড নয়—পুরস্কার। রমেশের সহিত পুনর্মিলন ঘটিলেই প্রফুল্লের কঠোরতম দণ্ড হইত। এই জন্যই নিষ্পাপা নিরপরাধা ডেস্‌ডিমোনার মৃত্যু-শয়নে, কর্ডেলিয়ার উদ্বন্ধনে আত্মবিসর্জনই এইরূপ মহৎ জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।'[৪৪]

সপ্তমত, 'প্রফুল্ল' নাটকের ট্রাজিডির বীজ যোগেশের হৃদয়েই অঙ্কুরিত হয়েছিলো। এই চরিত্রের বা সমগ্র নাটকের ট্রাজিডি বিচার প্রসঙ্গে বেশ কয়েকজন সমালোচক শেক্সপীয়রের কয়েকটি বিখ্যাত নাটকের ট্রাজিডি রসকে

তুলনায় সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলতে চান যে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'র ট্রাজিডি সৃষ্টিতে শেক্সপীয়রের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। তাঁদের মতে: 'ম্যাকবেথের উচ্চাশারূপ দুরাকাঙ্ক্ষা Lear-এর স্নেহের দৌর্বল্য, ওথেলোর সন্দেহ, কোরিওলেনাসের গর্বিত ভাব, Hamlet-এর ভাববিহ্বলতা, Antony-Cleopatra-র সম্ভোগবাসনারূপ দুর্বলতা·· এই সমস্ত নাটককে tragedy-তে পরিণত করিয়াছে। যোগেশের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা তাহার সুনাম-সুযশের আকাঙ্ক্ষাই প্রফুল্ল নাটকে tragedy-র কারণ। মিথ্যাপবাদেও এই যে অতিরিক্ত ব্যাকুলতা ও আত্মবিস্মৃতি উহাই সুনাম-রূপ একটা abstraction-এর উপাসক যোগেশকে সংযম ভ্রষ্ট করিয়া নাটকখানিকে ট্রাজিডিতে পরিণত করিয়াছে।···হ্যামলেটের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই যেমন ঐ নাটকখানিকে ট্রাজিডিতে পরিণত করিয়াছে—পিতৃহত্যার প্রতিহিংসার কথা একটা উপলক্ষ মাত্র, তেমনি শিথিল-প্রত্যয় যোগেশের মানসিক দুর্বলতাই প্রফুল্ল নাটকের ট্রাজিডির কারণ, যোগেশ অতিরিক্ত মদ্যপানে আসক্ত না হইলেও তাহা ঘটিতে পারিত।'[৪৫]

উপরোক্ত বা অপরাপর সমালোচক কথিত শেক্সপীয়রীয় নাট্যকলার সঙ্গে এই সাদৃশ্য বা ভাবানুসরণকে বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের কোন কোন সমালোচক 'নিতান্তই বাহ্য বা মৌহূর্তিক' বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁদের মতে লীয়র বা হ্যামলেটের যে ট্রাজিডি তার সমুন্নত মহিমা যোগেশে কোথায়? কিংবা, বিশেষ করে হ্যামলেটের 'আত্যন্তিক মানসিক দ্বন্দ্ব ও চিন্তাপ্রবণতা বা মানস চঞ্চলতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিঘাত'—যা হ্যামলেটের সর্বপ্রকার সক্ষম ক্রিয়াশক্তিকে স্থাণু করে দিয়েছিলো তার একান্ত অভাব কি যোগেশে নিদারুণ ভাবে অনুভূত হয় না? যার ফলে: 'যোগেশের অন্তর্দ্বন্দ্বময় মনোজগৎ একেবারেই অপরিস্ফুট'[৪৬] রয়ে গেছে।

গিরিশচন্দ্রের অন্যতম সুপরিচিত ঐতিহাসিক নাটকটির নাম 'সিরাজদ্দৌলা' [১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ] এই নাটক সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়েছিল ৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সালে। ১০ জানুয়ারী ১৯০৬ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পুলিশের নির্দেশে মূল পাণ্ডুলিপির কিছু বদল ঘটিয়ে তবে অভিনয়ের অনুমতি মিলেছিল। তাতেও ব্যাপারটি মোটেই নিরাপদ মনে হয় নি। ১৯১১ সালের ৮ জানুয়ারী নাটকটির অভিনয় ও প্রচার বৃটিশ সরকার বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ নাটকটির সঙ্গে স্বদেশী-আন্দোলনের উত্তেজক ইতিহাস

জড়িত।'[৪৭] এ-হেন নাটক রচনার সময়েও কিন্তু গিরিশচন্দ্র শেক্সপীয়রকে ভুলতে পারেন নি। তিনি শেক্সপীয়রের অনেক কটি নাটকের ঋণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এতে গ্রহণ করেছেন। যেমন: আমরা শেক্সপীয়রের 'কিং রিচার্ড দি সেকেণ্ড' নাটকের দ্বিতীয় রিচার্ডের সঙ্গে 'সিরাজদৌলা' নাটকের নাম-চরিত্রের অনেকখানি মিল পেতে পারি। একদিকে রিচার্ড যেমন কবি ও বিলাসী, রাজকীয় ঘোরপ্যাচকে আয়ত্ত করার মতো মানসিক জটিলতা তাঁর মধ্যে ছিলো না; যদিও রাজা হয়ে দেশ শাসন করার সাধ তাঁর ছিলো; ফলে, তাঁকে সিংহাসন হারাতে হয়েছে, করুণ মৃত্যুই হয়েছে তাঁর শেষ পরিণতি। অন্যদিকে তেমনি সিরাজও প্রজাদের ভালোবাসতেন, তাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পাওয়ার চেষ্টা করতেন, কিন্তু ভাগ্যচক্রে এবং রাজনীতির কূট চক্রান্তের সঙ্গে কুশলী-সংগ্রাম করতে না পেরে তাঁকেও শোচনীয় ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এই শোচনীয় পরিণতিতে উভয়ের রক্তাক্ত হৃদয়ের আর্তি ও সংলাপ পর্যন্ত বহুক্ষেত্রেই যেন এক হয়ে গিয়েছে। যেমন, রিচার্ড তাঁর স্ত্রী অ্যানকে বলেছেন:

K. Rich. Join not with grief, fair woman, do not so,
To make my end too sudden. Learn good soul,
To think our former state a happy dream;
From which awak'd, the truth of what we are
Shows us but this :...' 5. I.

অনুরূপ ভাবে সিরাজ তাঁর পত্নী লুৎফউন্নিসার কাছে হৃদয়-বেদনা প্রকাশ করে বলেছেন:

সিরাজ। নাহি আর সম্ভাবনা তার,
নাহি হয় আশার সঞ্চার;
মহাভয় উদয় হৃদয়ে
হেরি ভবিষ্যৎ ছবি তমোময়।
যদি কেহ আশ্রয় প্রদানে বালিকায়,
দোঁহে মিলি প্রবেশি সলিলে;
ধরাবাস কারাবাস সম। ৪।৬

ঐ একই নাটকের আর একস্থানে আমরা যেমন পাচ্ছি:

North. My lord—

K. Rich. No lord of thine. thou haught insulting man,

Nor no man's lord ; I have no name, no title—

No not that name was given me at the font— 4. I.

তেমনি আমরা 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকেও দেখছি :

লুৎফউন্নিসা। নবাব—জাঁহাপনা !

সিরাজ। নবাব কে—কারে নবাব বল্‌ছ ? ৪।৪

ঐ একই সংলাপের শেষাংশে আবার যেমন রিচার্ড বলেছেন : 'O that I were a mockery kind of snow', ঠিক সেই ভাবেই অসহায় সিরাজ দুঃখ-দীর্ণ হৃদয়ে বলেছেন :

প্রিয়ে, ফুরায়েছে রাজ-অভিনয়

কল্পনায় না হয় উদয়,

কয়জন বিদেশী বণিক,

কাড়ি নিল সিংহাসন। ৪।৬

আবার শেক্সপীয়রের *King Henry The Fifth* নাটকে রাজা পঞ্চম হেনরী যেমন মন্ত্রপ এবং চরিত্রহীনতায় যথেষ্ট দুর্নাম কুড়িয়েছিলেন এবং পরে শেক্সপীয়রের দৃষ্টিতে আদর্শ রাজা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, ঠিক তেমনি সিরাজদ্দৌলাও যৌবনের প্রথম উন্মাদনায় যে চরিত্র স্খলনের অপযশ আহরণ করেছিলেন তাকে অতিক্রম করে গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগে বাঙালীর হৃদ্-সিংহাসনে তিনিই আবার প্রীতির স্থান পেয়েছেন। এই জন্যেই রাজা পঞ্চম হেনরী সম্বন্ধে ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ বলেছেন :

Cant. The courses of his youth promis'd it not.

The breath no sooner left his father's body

But that his wildness, mortified in him,

Seem'd to die too ; yea, at that very moment,

Consideration like an angel came

And whipp'd th' offending Adam out of him,

Leaving his body as paradise

T' envelop and contain celesital spirits. 1. I.

যেন ঠিক এই ভাষাতেই সিরাজদ্দৌলা নিজের সম্বন্ধে নিজেই বলেছেন :

… · স্বেচ্ছাচারে চালিত জীবন,
হিতাহিত ছিল না বিচার,
মদ্যপানে করিয়াছি, শত শত দুর্নীত ব্যাভার।
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন,
বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ-শয্যায়,
শেষ বাক্যে তাঁর
জন্মিয়াছে ধারণা আমার,
রাজকার্য নহে স্বেচ্ছাচার ;
নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে ;
প্রজার মঙ্গল কার্য সতত সাধন,
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে। ১।৫

যেমন রাজা পঞ্চম হেনরীর সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

Cant. The King is full of grace and fair regard.

Ely. And a true lover of the holy Church. 1. I.

এমনি ভাবেই নবাব সিরাজদ্দৌলা সম্বন্ধে তাঁর অমাত্যেরা বলেছেন [২।১] :

স্বরূপ। সকতজঙ্গের যুদ্ধের পর নবাবের যেন সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে, বিনয়ী নম্র, সকলকে যথাযোগ্য উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করছেন।

জগৎ। যেন বৃদ্ধ আলিবর্দী যৌবন লাভ ক'রে, প্রত্যাবর্তন করেছেন।

এর পর, স্বামী হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মাদিনীপ্রায় জহরার সঙ্গে 'কিং রিচার্ড দি থার্ড'-এর মার্গারেট চরিত্রের সাদৃশ্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এবং মাঝে মাঝে মনে হয় যে জহরার চরিত্র অধিকতর মহৎ। কারণ, সে কেবল শত্রুর হার দেখেই খুশি হতে চায় না :

Here in these confines slily have I lurk'd
To watch the waiving of mine enemies. 4. III.

ঝঞ্ঝার মতো চরম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, নিয়তির মতো অবাধ কর্মকুশলতায়, এবং শয়তানের মতো প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তার লক্ষ্য বস্তুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে তাকে সমূলে ধ্বংস করার কাজে জহরা সমস্ত নাটক জুড়েই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে।

এই নাটকের অপর একটি চরিত্র করিম চাচা। এই চরিত্রটিকে শেক্সপীয়রের

Fool-এর অনুরূপ সৃষ্টি বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু এখানেও গিরিশচন্দ্র শেক্সপীয়রের ভাব-বস্তুকে পাশ কাটিয়ে আপন বিশিষ্ট রস-চৈতন্যকে মুক্তি দিয়েছেন। ফলে: "করিম যেমন রাজভক্ত ও স্বদেশ প্রেমিক, তেমনি আবার দূরদর্শী। কি ছোট, কি বড় কাহাকেও সে সত্য কথা বলতে কুণ্ঠিত হয় না। তাহার চরিত্রে ভয়ের লেশমাত্রও নাই। তাহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রসিকতার আবরণে লুক্কায়িত। শেক্সপীয়রের 'As You Like It'-এর Jaques ও 'King Lear' এর Knet-চরিত্র একত্র করিলেও করিম চাচার সহিত তুলনা হয় না। দার্শনিক Jaques অপ্রিয় সত্য শুনাইবার জন্য ভাঁড় সাজিতে চাহেন, 'I am ambitious for a motley coat.' আবার অন্যদিকে সে Lear নাটকের Knet-এর ন্যায় রাজভক্ত; স্পষ্টবক্তা ও সাহসী। বিশ্বাস-ঘাতকদের সম্বন্ধে Kent যেমন বলিতেছেন:

> 'Such smiling rogues as these
> Like rats oft bite the holy cords a-twain
> Which are too intrinsic t' unloose smooth every passion
> That in the nature of their lords rebel.'

করিমচাচাও, মিরজাফর তাহাকে বেইমান বলিয়া সম্বোধন করিলে, খুব সরস ভাষায়ই নির্বিকার চিত্তে উত্তর প্রদান করেন: 'বেইমানি তো আমার একচেটে নয়, আমি তো হংসমধ্যে বকোযথা। বেইমানির যদি সাজা থাকতো, তা হ'লে সারি সারি মুণ্ড গড়াতো' [৫।৬]।"[৪৮]

এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করলে গিরিশচন্দ্রের আরও বেশ কিছু নাটকের সঙ্গে শেক্সপীয়রের অনেকগুলি নাট্য-কাহিনীর, চরিত্র-চিত্রণের ও ঘটনা সংস্থাপনের এবং ভাবধর্মের সঙ্গে মিল খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না। আমরা নিম্নে নাতিবিস্তৃতভাবে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

১. গিরিশচন্দ্রের 'মীরকাসিম' [১৯০৬] নাটকের নাম চরিত্র মীরকাসিমের বেগমের সঙ্গে 'জুলিয়াস সীজার'-এর অন্যতর প্রধান চরিত্র ব্রুটাসের স্ত্রী পোর্শিয়ার মিল দেখতে পাওয়া যায়। পোর্শিয়া যেমন বলেছেন:

> Am I your self
> But, as it were, in short or limitation?
> To keep with you at meals, comfort your bed,
> And talk to you sometimes?...

…I grant I am a woman ; but withal

A woman that Lord Brutus took to wife. 2. I.

ঠিক এইভাবে বেগম বলেছেন :

…আমি তোমার নিকট থাকবো না ? রণ অবসানে, ক্লান্ত হয়ে যখন শিবিরে ফিরবে, আমি তোমার সেবা করবো না ? তোমার চিন্তাপূর্ণ উষ্ণমস্তিষ্ক কার সঙ্গীতে শীতল হবে, কার শুশ্রূষায় তুমি নিদ্রা যাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, উৎসাহবাক্যে কে তোমায় যুদ্ধে পাঠাবে—আমি। ১।৪

অন্যত্র আবার মীরকাসিমের বেগম বলেছেন :

আমি তোমার পত্নী, তুমি আমায় বিলাসিনী রমণীজ্ঞানে উপেক্ষা করো না। ১।৪

২. 'বিষাদ' [১৮৮৯] গিরিশচন্দ্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। এই নাটকের সরস্বতীর স্বামী লম্পট এবং চরিত্রহীন। তৎসত্ত্বেও সেই স্বামীকে সরস্বতী সেবা করেছে নিঃস্বার্থভাবে। তার এই পতিপ্রাণতার কথায় আমাদের মনে পড়ে জুলিয়ার কথা ['দি টু জেণ্টল্‌মেন অব ভেরোনা']। অধিকন্তু এই এই নাটকের তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে ছদ্মবেশী সরস্বতীর প্রতি উজ্জ্বলার যে ভালবাসা সঞ্চারিত হয়েছে তা আমাদের মহাকবি শেক্সপীয়রের 'টুয়েলফ্‌থ নাইট ; অর, হোয়াট ইউ উইল'-এর পুরুষের বেশধারিণী ভায়োলার প্রতি কাউণ্টেস্ অলিভিয়ার অনুরাগ সঞ্চারের বিষয়টিকে মনে করিয়ে দেয় [3. 1.]।

৩. গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিতে যে একধরণের কৌতুকপ্রবণ চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন : "Falstaff শেক্সপীয়রের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। ডাক্তার জন্‌সন্ বলেন : 'Falstaff is the summit of Shakespeare's comic invention.' বানার্ড্‌শ-ও বলেন, 'Shakespeare's Falstaff is more vivid than any of those serious reflective characters.'

"শেক্সপীয়রের সম্মুখে এক জীবন্ত রহস্য মূর্তি বিদ্যমান ছিল। Tarlton নামে খর্বাকৃতি, খর্বনাসিকা, স্থূলদেহ জনৈক রহস্যপ্রিয় ব্যক্তি হাস্যরস সৃষ্টি করিতে এতই পটু ছিল যে, হৃদয়ের গুরুভার লাঘব করিবার জন্য স্বয়ং সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথও তাহার শরণাপন্ন হইতেন। এই বাস্তব চরিত্র শেক্সপীয়রের নিপুণ তূলিকায় আরও সরস হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু এরূপ চরিত্র বীরবল,

গোপাল ভাঁড়ে সম্ভব হইলেও পরাধীনতার যুগে বাঙালা দেশে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তথাপি...সিদ্ধহস্ত গিরিশের লেখনীতে যে Falstaff-এরও অনুরূপ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়"[৪৯] তার এক সার্থক উদাহরণ হচ্ছে তাঁর 'মুকুলমঞ্জুরা' [১৮৯৩] নাটকের বরুণচাঁদ। এর অসাধারণ বাকপটুতায় এবং উপস্থিত বুদ্ধিতে একে ফল্স্টাফের নিকটতম প্রতিবেশীরূপে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। শেক্সপীয়রের 'কিং হেনরী দি ফোর্থ' নাটকের প্রথম খণ্ড-এর দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে যুবরাজ হেনরীর সামনে ফলস্টাফের অভিনয়ের সঙ্গে বরুণচাঁদের [১।৩] অভিনয়ের যে সাদৃশ্য তা তার চমৎকারিত্বে এবং রমণীয়তায়।

আবার ফলস্টাফ যেমন আপনি না হেসে অন্যদের হাসায় বরুণচাঁদও তাই; সে নিজে গম্ভীর থেকে অন্যদের হাসিকে থামতে দেয় না। এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে তার হাস্যরসে কোনো স্থূলতা বা চ্যাংড়ামি নেই। তবে হাস্যরস পরিবেষণ বা রহস্যালাপই কেবল বরুণচাঁদের কর্ম নয়। তার নীতিজ্ঞান ও ধর্মবোধও যথেষ্ট ছিলো; কারণ, বরুণচাঁদ আফিমের মাত্রা চড়িয়েও বলতে পারে: 'আফিং না দাও বাবা, নেই দেবে, খামকা যে অবলার জাতকুল খাব, তা পারবো না' [১।৩]। তরল হাস্যরসের ভাঁড়ারী হলেও ধর্মভীরু বরুণ আবার বলছে: 'সিদে পথের চেয়ে পথ নেই. যারা সোজা পথে চলে, তাদের ঘোড়ার চালও ভাবতে হয় না, ব'ড়ের চালও ভাবতে হয় না' [২।১]। এই নৈতিকতাবোধের বিচারে আমরা ফলস্টাফকে কিছু খাটো বলে গ্রহণ করতে পারি।

৪. এইটি ছাড়া গিরিশচন্দ্রের আরও কতকগুলি নাটকের আরও কিছু অপ্রধান চরিত্রের ওপর ফলস্টাফের ছায়াপাত ঘটেছে। যেমন: 'মায়াবসান' [১৮৯৮] নাটকের সাতকড়ি চাটুজ্যেকে নিয়ে যে কৌতুককর দৃশ্যটি অঙ্কিত হয়েছে তা যেন *Merry Wives of Windsor*-নাটকে মিস্ট্রেস ফোর্ড ও মিস্ট্রেস পেজ কর্তৃক ফলস্টাফকে বাক্সবন্দী করে রাখার ঘটনা-দৃশ্যের অনুরূপ। এ প্রসঙ্গে দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী' নাটকটির কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। এই নাটকের শান্তিরামের চরিত্রটিও একটি সরস চিত্র। তার কথা: 'মনের পচা পাঁক উট্‌কে দেখলে কেউ কারুকে দুর্জন বল্‌তো নি।' শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের: 'Use every man after his desert, and who shall scape whipping?' [2. II.] উক্তিটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনি ভাবে 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকে [১৮৮৮] সুন্দরী ও সারি কর্তৃক দামোদরকে বাঁদর সাজানোর

ব্যাপারটির মধ্যে যেমন কৌতুক আছে, তেমনি আছে বিমল আনন্দজাত হাসি। গিরিশচন্দ্রের 'বাসর' [১৯০৬] নামক আর একটি নাটকেও দেখতে পাচ্ছি ঐ ধরণের ঘটনা। বিম্বাবতীর সঙ্গে প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপন করতে এসে জগন্নাথ রান্নাঘরে চাবি বন্ধ হয়ে থেকেছে। এই দুই জায়গায়ই শেক্সপীয়রের ছায়া অত্যন্ত স্পষ্ট।

গিরিশচন্দ্রের 'আদর্শ গৃহিণী বা গৃহলক্ষ্মী' [১৯১২][৫০] নাটকের মূল বীজ নাট্যকার শেক্সপীয়রের 'কিং লীয়র' নাটক থেকে সংগৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এই নাটকের উপেন্দ্রনাথ সত্যনিষ্ঠ এবং ন্যায়বান। তিনি তাঁর ছোট ভাই শৈলেন্দ্রকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। ভায়ের প্রতি এই স্নেহদুর্বলতাই তাঁর জীবন-ট্রাজিডি রচনার রন্ধ্র পথ, ঠিক রাজা লীয়রের কন্যা-স্নেহের মতোই।

আরও তন্ন তন্ন করে খুঁজলে গিরিশচন্দ্রের নাটকে শেক্সপীয়রের আরও অনেক নাটকের ছায়াপাত দেখতে পাওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। আর সম্ভব হবে না-ই বা কেন। গিরিশচন্দ্র তো প্রকাশ্যেই শেক্সপীয়রকে তাঁর সাহিত্য-জীবনের গুরু হিসেবে শ্রদ্ধায় স্বীকার করে নিয়েছেন। ফলে কি নাট্য-চরিত্র রচনায়, কিংবা নাট্য-ঘটনা-সংস্থান তৈরীতে গিরিশচন্দ্র যেমন শেক্সপীয়রের ঋণ গ্রহণ করেছেন, তেমনি নাট্য-রীতি, ভাষা-ছন্দ, আন্তর-স্বরূপের পরিচয় প্রদানের বেলাতেও শেক্সপীয়র বহুক্ষেত্রেই তাঁর পথ-প্রদর্শক ও উদাহরণস্থল ছিলেন। এখন আমরা সে সম্বন্ধে একে একে কিছু আলোচনা করে বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার টানবো।

ক. নারী-চরিত্রকে পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করানোর পদ্ধতিটি শেক্সপীয়রীয় নাট্য-কৌশলের অন্যতম। এটিকে গিরিশচন্দ্র ব্যাপক ভাবে তাঁর নাটকে গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, 'রূপ সনাতন' [১৮৮৮] নাটকে অলকার জ্যোতিষীর বেশ ধারণ; 'মায়াবসান' নাটকে যাদব ও মাধবের স্ত্রী-রূপ ধারণ করে প্রবেশ; 'বিষাদ' নাটকে সরস্বতীর পুরুষ বেশ গ্রহণ ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে এই ছদ্মবেশ গ্রহণের কৌশল বাঙলা সাহিত্যে গিরিশই প্রথম ব্যবহার করেছেন তা নয়, মধুসূদন তাঁর নাটকে এবং বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারটি বেশ সার্থকভাবেই অনুসরণ করে এসেছেন।

খ. গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে পাত্র-পাত্রীর মুখে পদ্যময় সংলাপের জন্যে যে নতুন ধরণের এক ছন্দোরীতি ব্যবহার করেছিলেন,—যা বাঙলা ছন্দের

ইতিহাসে 'গৈরিশছন্দ' নামে সুপরিচিত, অনেকে মনে করেন এর উদ্ভাবনের পেছনে মিল্টন বা মধুসূদনের তুলনায় শেক্সপীয়রের প্রভাবই পরিমাণে অধিক।

গ. গিরিশচন্দ্র স্বয়ং বলেছিলেন: 'এই যে ভিতরের দ্বন্দ্ব, internal dramatic actions—যা সামান্যভাবে প্রকাশ পায়, সেই internal dramatic actions এঁকে দেখানোই best literary art.'[৫১] এই অন্তঃস্থ-হৃদয় সংগ্রাম গিরিশচন্দ্র শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির স্বভাব থেকে গ্রহণ করে তাঁর বিয়োগান্তক নাটকগুলি রচনা করেছিলেন। কিন্তু এখানেও গিরিশচন্দ্রের পক্ষে কিছু বলার আছে। তা হচ্ছে এই যে গিরিশচন্দ্র তৎকালীন যুগ-প্রভাবে সৃষ্ট 'নিও হিন্দুইজম্'-এর ভক্তিভাবকে কোনো রূপেই অতিক্রম করতে পারেন নি। ফলে, তিনি শেক্সপীয়রের কাছ থেকে পাওয়া 'বেস্ট লিটারারি আর্ট' আয়ত্তের পরেও তাঁর নাটকে জ্ঞান-ভক্তির চরম বিকাশ, প্রেম-ভক্তির উচ্চতম উন্মাদনা ও উচ্ছ্বাস দেখাতে পেরেছেন। তাই, সমালোচকের ভাষায়: 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র মহাকবি শেক্সপীয়ারকে তাঁহার আদর্শরূপে স্থানে স্থানে অনুকরণ করিলেও তাঁহার রচনা মৌলিকতাবর্জিত ছিল না। তাঁহার স্বকল্পিত নাটকের কথা ছাড়িয়া দিলেও যে সকল নাটকে তিনি শেক্সপীয়ারের অনুসরণ করিয়াছেন, সেগুলিতেও তাঁহার নিজস্ব দান যথেষ্ট আছে। মহাকবি শেক্সপীয়ার ছিলেন কর্মের অনুরাগী, মহাকবি গিরিশচন্দ্র ছিলেন ধর্মের। মহাকবি শেক্সপীয়ার কোন একটি সমস্যায় নাটকের সূচনা করিতেন, গিরিশচন্দ্রের অবলম্বন ছিল নায়ক বা নায়িকার চরিত্র। পাশ্চাত্ত্য কবির নাট্য-সমস্যা নৈতিক-ঐহিক, গিরিশচন্দ্রের ছিল পারমার্থিক। শেক্সপীয়ারের নাটকীয় বিকাশ হইতে ঘটনায় চরিত্রসৃষ্টির মধ্য দিয়া, গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় বিকাশের লক্ষ্য ছিল রসের পুষ্টি। শেক্সপীয়ার realistic হইয়াও কল্পনা-বিলাসী, গিরিশচন্দ্র ভাব-প্রবণ হইয়াও প্রত্যক্ষবাদী। পাশ্চাত্ত্য নাট্যকার কোন কোন নাটকে অলৌকিকের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু অবস্থাবিশেষে ঘটনার আনুকূল্যে লোকচরিত্রে লোকাতীত ভাবের উদ্দীপনা, আবির্ভাব ও উন্মাদনা প্রদর্শন একমাত্র গিরিশচন্দ্রের জাতিগত, স্বভাবসিদ্ধ অধিকার।'[৫২]

ঘ. এছাড়াও আরো কিছু কিছু শেক্সপীয়রীয় অনুসরণ গিরিশচন্দ্রে দেখা যায়। যেমন: "শেক্সপীয়ারের ন্যায় তিনিও নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাগ সর্বত্র মানিয়া চলিয়াছেন। শেক্সপীয়ারকে অনুসরণ করিয়া তিনি আদিম প্রবৃত্তির সংঘাত এবং প্রবল ভাবের [passion] আতিশয্য বর্ণনা করিয়াছেন।

মানব সমাজে যত রকম অন্যায় ও দুষ্কৃতি আছে শেক্সপীয়ার নির্ভীক লেখনীর দ্বারা সব কিছু অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রও নাটকে ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, প্রতিহিংসা, ব্যভিচার, নরহত্যা প্রভৃতি সর্বরকম অপরাধ ও পাপ দেখাইয়াছেন। বিদূষক প্রভৃতি চরিত্রের উপরেও শেক্সপীয়ারের fool-এর প্রভাব পড়িয়াছে। শেক্সপীয়ারের ন্যায় গিরিশচন্দ্রও লঘু ও হাস্যরসাত্মক ভাবপ্রকাশের জন্য গদ্য এবং গম্ভীর ও তেজস্বী বিষয় ব্যক্ত করিবার জন্য পদ্য ব্যবহার করিয়াছেন। শেক্সপীয়ারের 'জুলিয়াস সিজার', 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ' প্রভৃতি নাটকে যেমন প্রেতাত্মার অস্তিত্ব আছে, গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড', 'কালাপাহাড়' ইত্যাদি নাটকেও তেমনি অশরীরী ছায়ামূর্তির আবির্ভাব দেখানো হইয়াছে।"[৫৩]

কিন্তু এহো বাহ্য। গিরিশচন্দ্রের নাটকে এই পরানুকৃতিই সার কথা নয়। উত্তর কোলকাতার নিজস্ব বাবু কালচার, রামকৃষ্ণ-কেশব সেন ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গলীয় মনোভাবের সংঘাত ও সদ্যোজাত জাতীয়তাবোধের বাতাবরণ গিরিশচন্দ্রের চেতনায় অভিনব এক বাঙালীয়ানার জন্ম দিয়েছিলো; যা সমস্ত রকম প্রভাবকে অতিক্রম করে 'ভক্তভৈরব' গিরিশ-প্রতিভাকে বাঙালীর জাতীয় নাট্যকারের সম্মানীয় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।[৫৪]

চ.

: শেক্সপীয়র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক

কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় [১৮৬৩-১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ] যখন বাঙলা নাট্যাকাশে তাঁর প্রথম প্রহসন-নাট্য নিয়ে উদিত হয়েছিলেন [১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ] তখন প্রখ্যাত নট ও প্রতিভাধর নাট্যকার এবং নাট্য-প্রযোজক গিরিশচন্দ্র ঘোষ [১৮৪৪-১৯১২ খ্রীস্টাব্দ] তাঁর প্রচুর প্রতিভা-কিরণ সম্পাতে বাঙলার নাট্য-গগন সমুজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজী শিক্ষায় কৃতবিদ্য এবং বিলাত ফেরৎ। এবং "বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাঠে আমার আসক্তি ছিল।…বিলাত গিয়া ক্রমাগত Shelley পড়িতাম এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রমাগত Wordsworth ও Shakespeare বারবার পড়িতাম; ও শেষোক্ত কবির নাটকের যে যে অংশ কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ বোধ হইত, মুখস্থ করিতাম।

"বিলাত যাইবার পূর্বে আমি 'হেমলতা' নাটক ও 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখীন অভিনেতৃ-দল

কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addison-এর Cato এবং Shakespeare-এর Julius Caesar-এর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।

"বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চসমূহে অভিনয় দেখি এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়।"[৫৫]

দ্বিজেন্দ্রলালের স্ব-কথিত এই শেক্সপীয়র-প্রীতি ও নাট্যরুচি তাঁর অধিকাংশ নাটকে শেক্সপীয়রীয় প্রভাব অনুসন্ধানের প্রধানতম অভিজ্ঞান হিসাবে প্রথমেই আমাদেব গ্রহণ করতে হবে। তাই আমাদের আলোচনার সূচনাতেই জেনে নিতে হচ্ছে যে: দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র নাট্যসৃষ্টি ক. প্রহসন, খ. নাট্যকাব্য, গ. সামাজিক এবং ঘ. ঐতিহাসিক এই চারভাগে বিভক্ত। এবং এই সব ভাগ মিলিয়ে তাঁর মোট নাটক-প্রহসন ইত্যাদির সংখ্যা আঠারো।

এই পরিমাণ নাটক ও প্রহসন প্রভৃতি সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্র-মনোভূমিতে যে রসসিঞ্চন ঘটেছিলো তা পাশ্চাত্ত্যের নাট্য-রীতি, ট্রাজিডি-চেতনা, এমন কি নাট্যসংলাপের ধারা থেকেই বহুলাংশে আহৃত হয়েছিলো। তার মধ্যে আবার ঐ রসস্রোতের সিংহভাগ এসেছিলো শেক্সপীয়রের নাট্য-ভাগীরথী থেকে। উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের জন্য বিলাতে গিয়ে, শেক্সপীয়রের জন্মভূমিতে দাঁড়িয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল আবেগ-জড়িত কণ্ঠে শেক্সপীয়রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছিলেন: 'সেখানে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম, এইস্থানে অনন্ত কবিত্ব-নির্ঝরিণীর উৎস সেই মহাকবি আজ নীরবে অন্ধকারময় আগারে শয়িত। মনে যে ভাব উদিত হইল, তাহা অবর্ণনীয়। অনন্ত তরঙ্গায়িত, অমর কবিত্বের বাণীময়ী ভাষা এই স্থানে নিদ্রিত। ঘুমাও কবিবর! যেখানে ইংরাজী ভাষা বিদিত, সেখানে তোমার নাম অশ্রুত থাকিবে না।...আর দূরে গঙ্গাতীরবাসী আর্যাবর্তের শ্যামল সন্তান তোমাকে ভারতীর বর-পুত্র কালিদাসের প্রিয় ভ্রাতা, জগতের প্রিয় কবি বলিয়া আলিঙ্গন ও আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবে।'[৫৬] এই শ্রদ্ধাই পরবর্তীকালে তাঁর নাটকে সার্থক অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। অধিকন্তু 'আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ' ['নাট্য-মন্দির': ১৩১৭]

'কালিদাস ও ভবভূতি' ['সাহিত্য' : ১৩১৭-১৮], 'অভিনেতার কর্তব্য' ['নাট্য-মন্দির' : ১৩১৭] ইত্যাদি বেশ কিছু প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়রের নাটকের যে রস বিশ্লেষণ করেছিলেন তার অভিঘাত তাঁর নাটককে সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। আমরা এখন একে একে দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসরণ প্রসঙ্গটির আলোচনা করবো।

ক. নাট্যভাষা : আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাট্যভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সূচনা থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন যে : "প্রথমে Shakespeare-এর অনুকরণে Blank Verse-এ নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। 'তারাবাই' প্রকাশিত হইবার পরে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এক কপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে, এ নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর, মাইকেলের ছন্দোমাধুরী ইহাতে নাই—এ অমিত্রাক্ষরে চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল যে —অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু দ্রুত কথোপকথনের কথা ত গদ্যের মত হইতেই হইবে। Shakespeare-এর অমিত্রাক্ষর Milton-এর অমিত্রাক্ষর হইতে পৃথক। ...দেখিলাম যে Shakespeare-এ খানিক গদ্য, খানিক পদ্য, তথাপি খাপ খাইতেছে।... পদ্যের ঝঙ্কার গদ্যে দেওয়া যায়, কিন্তু গদ্যের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাগতি পদ্যে নাই।... এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি তখন হইতে নাটকগুলি গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম।... কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।'[৫৭] এই স্বীকারোক্তি অনুসরণে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে নাট্যভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়রীয় পদ্ধতি ['Shakespeare-এ খানিক গদ্য খানিক পদ্য তথাপি দুইটি খাপ খাইতেছে। কারণ ইংরাজি ভাষায় সেরূপ অবস্থা আসিয়াছিল।'] পরিত্যাগ করেছেন; কিন্তু তবুও ঐ মহাকবি তাঁর নাটকে কাব্য এবং নাটকীয়তার যে অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন; দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে কোনো মতেই পরিহার করতে না পারায় দ্বিজেন্দ্র-নাটক অপূর্ব কাব্যময়ী গদ্য সংলাপের আভরণ ধারণ করে শ্রীময়ী হয়ে উঠেছে।

খ. নাট্যরীতি : দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'কালিদাস ও ভবভূতি' প্রবন্ধে বলেছেন : 'অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকে দেখানো হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক,

যেমন—হ্যামলেট বা কিং লিয়র। বহির্ঘটনার সহিত যুদ্ধ তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর নাটকের উপাদান; যেমন—ওথেলো বা ম্যাক্‌বেথ।·· এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সব মহানাটকে আছেই আছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংঘাতে তরঙ্গ না উঠাইতে পারিলে, বিপরীত বায়ুর সংঘাতে ঘূর্ণী ঝটিকা না উঠাইতে পারিলে কবি জমকালো রকম নাটকের সৃষ্টি করিতে পারেন না।

'অন্তর্বিরোধ না থাকিলে উচ্চ অঙ্গের নাটক হয় না। বাহিরের যুদ্ধ নাটকের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করে না।··· যে নাটক বৃত্তিসমূহের যুদ্ধ দেখায়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক।'[৫৮] দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাট্যরীতি-জ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবেই শেক্সপীয়রের কাছ থেকে আহৃত। এবং এই কৌশলকে তিনি তাঁর অনেকগুলি নাটকে অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন।

এছাড়াও শেক্সপীয়রের কাছ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল আরও একটা নাট্যরীতি আয়ত্ত করেছিলেন। তা হচ্ছে soliloquy বা স্বগতোক্তির ব্যবহার। যদিও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'নূরজাহান' [১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ] নাটকের ভূমিকায় লিখেছিলেন: 'আমি এই নাটকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমক্ষে কাহারও স্বগতোক্তি একেবারে বর্জন করিয়াছি',- তথাপি চাণক্য, ['চন্দ্রগুপ্ত'], ঔরঙ্গজীব ['সাজাহান'] ও নূরজাহান ['নূরজাহান'] প্রমুখ অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ চরিত্রগুলি তাঁদের বিক্ষত হৃদয়ের বা শ্রান্ত মস্তিস্কের রক্তমোক্ষণকে বাইরে দৃশ্যমান করার জন্যে একা একা আবেগময় ভাষায় স্বগতোক্তি ব্যবহার করেছে। এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবেই শেক্সপীয়রীয়।

ওপরের আলোচনায় আমরা দেখে এলাম যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটক রচনার প্রায় প্রথম থেকেই শেক্সপীয়রীয় নাট্যশিল্পকে অধিগত করার চেষ্টা করছেন এবং জীবনের অপরাহ্ন বেলায় পৌঁছে তাঁর 'নূরজাহান' [১৯০৮] নাটকটিতেই তিনি শেক্সপীয়রের নাট্যরীতির স্বরূপধর্মটিকে পরিপূর্ণভাবে নিজের মধ্যে সংহরণ করে নিয়ে মনস্তত্ত্বসম্মত নাট্যরচনার দিকে বাঙলা নাটকের প্রশস্ত দুয়ারটিকে খুলে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন: 'বাংলার অন্যান্য নাট্যকারদের মত দ্বিজেন্দ্রলালের বহু নাটকে শেক্সপীয়রের চরিত্র ও ঘটনার ছায়া দেখা যায়। কিন্তু 'নূরজাহান' নাটকে শেক্সপীয়রের বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রভাব সমধিক প্রকটিত হইয়াছে। সার্থক হউক আর না হউক এই চেষ্টা যে দুঃসাহসিক সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।'[৫৯]

কাহিনীর দিক থেকে অবশ্য 'এ্যান্টনী এণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা'-র সঙ্গে

'নূরজাহানে'র কোনো মিল নেই, কিন্তু ক্লিওপ্যাট্রার চরিত্র-বর্ণনাকে উপলক্ষ করে ঐ নাটকের কাহিনী আমাদের যেমন কতকগুলি অ-সমাধান-যোগ্য প্রশ্নের সম্মুখীন করে দেয়, তেমনি ভাবেই নূরজাহানের চরিত্র-প্রস্ফুটন নির্ভর 'নূরজাহান'-এর কাহিনীও পাঠককে কিছু বিস্ময়াপন্ন জিজ্ঞাসার সামনে এনে হাজির করে। শেক্সপীয়র যেমন ইতিহাস অতিক্রম করে জীবন-রস-রসিকা এবং মৃত্যুকে শ্যাম-সমান রূপে আলিঙ্গনকারিণী ক্লিওপ্যাট্রাকে তাঁর চরিত্রের সমগ্র রহস্যময়তাসহ নাটকে উপস্থিত করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালও যেন অনেকখানি তেমন পদ্ধতিতেই নূরজাহানকে আঁকবার চেষ্টা করেছিলেন।

এছাড়াও ক্লিওপ্যাট্রার রূপের মোহে আত্মবিলোপকারী সম্রাট এ্যাণ্টনী রাজ্য সাম্রাজ্য সব কিছুকে ভুলে কুক্কুরবৎ কামুকতার [strumpt's fool'] বলি হলেন, জাহাঙ্গীরও ঠিক তাই হয়েছিলেন। ক্লিওপ্যাট্রার জন্যে যেমন তিনি তাঁর বিশাল রোম সাম্রাজ্যকে জলাঞ্জলি দিতে দ্বিধা করেন নি: 'Let Rome in Tiber melt' [1. I.]; রাতের ঘোরতম অন্ধকারকে বিলাসের গভীরতায় ভরিয়ে দিতে চেয়ে যেমন বলে উঠেছিলেন:

Come.
Let's have one other gaudy night. Call to me
All my sad captains; fill our bowls once more;
Let's mock the midnight bell. 3. XIII.

ঠিক তেমনি ভাবেই জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন:

জাহাঙ্গীর। তোমার সাম্রাজ্য তুমি শাসন কর প্রিয়ে। এখন নিয়ে এসো আমার সাম্রাজ্য-সুরা, সৌন্দর্য, সঙ্গীত। ৪।২

অথবা,

জাহাঙ্গীর। ··· তোমায় সাম্রাজ্য দিয়েছি, ভোগ কর, ধ্বংস কর। আমি যে সাম্রাজ্য পেয়েছি তার কাছে এ কিছুই নয় ··· সুরা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীত আমায় ঘিরে রাখুক। ৪।৪

ইত্যাদি বহু সংলাপের সঙ্গে শেক্সপীয়রের ঐ নাটকের সংলাপের আক্ষরিক বা তার ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করতে অসুবিধা হয় না। অধিকন্তু ঐ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে Pompey যেমন Cleopatra সম্বন্ধে বলেছেন:

But all the charms of love,
Salt Cleopatra, soften thy wan'd lip!

Let witchcraft join with beauty lust with both ;
Tie up the libertine in a field of feasts,
Keep his brain fuming.

ঠিক একই ভাবে যেন জাহাঙ্গীর বলেছেন [৪ অঙ্ক ৪ দৃশ্য] :

—তোমার কি মোহমন্ত্রে আমায় মুগ্ধ ক'রে রেখেছো হে যাদুকরী! তোমার কি বিষাক্ত নিঃশ্বাসে আমায় অভিভূত ক'রে রেখেছো—হে কালভুজঙ্গী। আমি তোমায় মগ্ন হয়ে আছি;...সুরা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীত আমায় ঘিরে রাখুক। আর তার উপর তুমি তোমার রূপ, কণ্ঠস্বর, চুম্বন, আলিঙ্গন দাও প্রিয়ে। চক্ষু থেকে পৃথিবী নিভে যাক্।

এ-ছাড়াও শেক্সপীয়রের আরও একটি নাটকের প্রধান দুটি চরিত্র ও তাঁদের আচরণাদির ছায়া আমরা নূরজাহান চরিত্রের ওপর দেখতে পাচ্ছি। তা-হচ্ছে, *Macbeth* নাটকের ম্যাকবেথ ও লেডী ম্যাকবেথের চরিত্র। প্রথমত, পুরুষ হলেও ম্যাকবেথের সঙ্গে নূরজাহানের চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ, লেডী ম্যাকবেথ তো তাঁর স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপুষ্টি ও হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করেছেন, কিন্তু নূরজাহান সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্যে স্বয়ং সিংহাসন থেকেই হত্যাকর্মের অনুষ্ঠান করে গেছেন। মনে হয় নাট্যকার এটিকে একটি সার্থক 'She Tragedy' করার জন্যেই তাঁর মধ্যে ম্যাকবেথের চারিত্র্যগুণ প্রবিষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন।[৬০] দ্বিতীয়ত, প্রভূত ক্ষমতা করায়ত্ত করার পৈশাচিক আকাঙ্ক্ষা-প্রসঙ্গে লেডী ম্যাকবেথ ও নূরজাহানের আচরণ একই প্রকার। এবং এই অ-নারী-প্রকৃতি-সুলভ আচরণের ফলে উভয়েই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। উভয়ের মধ্যেকার নারী-স্বভাব-বিরুদ্ধ উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্দাম ঝড় এবং তাতেই ক্ষয়প্রাপ্তির সাধর্ম্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এর পরে আমরা নূরজাহান কন্যা লায়লার সঙ্গে হ্যামলেটের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করতে পারি;—তবে সেটা নাটকের প্রথমাংশেই অনেকখানি সার্থক। লায়লার মা তার পিতার হত্যাকারীকে বিয়ে করেছে, এটা ঠিক হ্যামলেটের মতোই তার কাছে অসহ্য ঠেকেছে। তাই হ্যামলেটের মতই এই বিরুদ্ধ ঘটনা ও পরিবেশের মধ্যে লায়লা দ্বিধায়, দ্বন্দ্বে দীর্ণ-জীর্ণ হয়েছে। শেক্সপীয়রের এই নাটক ও নূরজাহানের চারিত্র্যের সাদৃশ্যের সূত্র ধরে জনৈক তরুণ সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে: 'উন্মাদ [?] হ্যামলেটের মধ্যে রাজা [Claudius] যত অসঙ্গতিই দেখুন না কেন, দর্শক বা পাঠক জানেন যে, তার বাহ্য অসঙ্গতি এক

গভীরতর সঙ্গতিতে বিদ্ধৃত। নূরজাহান চরিত্রটি কিন্তু এরূপ অসঙ্গতি সত্ত্বেও সঙ্গতিবিশিষ্ট [inconsistently consistent] নয়।'[৬১] কিন্তু 'এহো বাহ্য', অতি-সম্প্রতি অপর এক নাট্য-সমালোচক এই নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন সেদিকে মনোযোগ দেওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি। কারণ, তিনি বলেছেন: 'এই নূরজাহানকে দ্বিজেন্দ্রলাল একেবারে প্রতিহিংসাপরায়ণা পিশাচী করে তুলেছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা নারীর স্বাভাবিক কোমল বৃত্তিকে কিভাবে নষ্ট করে দেয়—শেক্সপীয়রের লেডি ম্যাকবেথ-এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে কোনও কোনও সমালোচক নূরজাহান চরিত্র ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লেডি ম্যাকবেথ-এর পৈশাচিকতার মধ্যেও নারীত্ব একেবারে হারিয়ে যায় নি। তার অনুতাপ যে সহানুভূতি আকর্ষণ করে, নূরজাহানের নিয়তি-তাড়িত স্বগতোক্তি সে সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে না। সে তার পাপের ফল লাভ করেছে। তার জন্যে সহানুভূতি জ্ঞাপনের সুযোগ কোথায়?' এই মন্তব্য করেও কিন্তু ঐ সমালোচক ঐ একই গ্রন্থে বলেছেন: '…নূরজাহানের জীবনের ইতিহাস-অনুক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে নাট্যকার সুন্দর কৌতূহলোদ্দীপক নাটক সৃষ্টি করেছেন। নূরজাহানের চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকার প্রধানত শেক্সপীয়রের নাট্যরীতি গ্রহণ করেছেন। শেক্সপীয়রের চরিত্র নির্ভর, অন্তর্সংঘাত সমাকুল ট্র্যাজেডির আদর্শে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলা ভাষায় প্রথম একটি সার্থক নারী-ট্র্যাজেডি [She-Tragedy] রচনা করলেন।'[৬২] সব শেষে দ্বিজেন্দ্রলালের এই অমর নাটকে শেক্সপীয়রের *Hamlet* নাটকের একটি বিখ্যাত চরণের অনুসরণের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। যেমন: নূরজাহানের উন্মত্ততার প্রসঙ্গে [৫ অঙ্ক ৮ দৃশ্য] জাহাঙ্গীরের মন্ত্রীপুত্র আসফ যে মন্তব্য করেছে: 'উন্মত্ততার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে।' ঠিক এরই পাশে শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকে হ্যামলেটের উন্মত্ততার উল্লেখ করে Polonius বলেছে: 'Though this be madness, yet there is method in't.' [2. II]। উভয়ই ভাষায় ও তাৎপর্যে যে একই তা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না।

এরপর দ্বিজেন্দ্রলালের 'তারাবাই' [১৯০৩, ২২ সেপ্টেম্বর]—নাটকের উল্লেখ করতে পারি। এই নাটকের অন্যতম মুখ্য চরিত্র সূর্যমল [রায়মলের ভাই ও সেনাপতি] চেয়েছিলেন সবাইকে হঠিয়ে দিয়ে মেবারের রাণা হতে। এই বিষয়ে তাঁকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁর স্ত্রী তমসা। কিন্তু সেনাপতি-

দম্পতীর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁদের করুণ পরিণতির কারণ হয়েছে। এ-প্রসঙ্গেই ঐ দুইজনের চরিত্র রচনায় শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের ম্যাকবেথ ও লেডী ম্যাকবেথের প্রভাবের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ম্যাকবেথ যেমন বৃদ্ধ রাজা ডানকানকে হত্যা করে রাজা হতে চেয়েছে; এবং এই হত্যা কর্মে তার মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় দেখা দিয়েছে, ঠিক একইভাবে সূর্যমল সন্দেহ ও দ্বিধায় দীর্ণ হয়েছে। ম্যাকবেথকে রাজ্য অধিকার করতে যেমন তার স্ত্রী ও ডাকিনীরা প্ররোচিত করেছে, ঠিক সেইভাবে সূর্যমল ও তমসা চারণীর কাছ থেকে উৎসাহ লাভ করেছে :

সূর্য। আশ্চর্য! আশ্চর্য ইহা!—জানিল কিরূপে
তমসা আমার পাপ অন্তরের কথা?
সে দিন গিয়াছিলাম চারণী মন্দিরে,
কহিল চারণী, হস্ত দেখিয়া আমার,
'মেবারের রাজ্যভাগ তোমার'—সহসা
কে যেন অমনি বেগে করিল আঘাত
উচ্চাশার রুদ্ধদ্বারে। ১।১

কিন্তু ঐ পর্যন্ত! শেষ পর্যন্ত ঐ প্রভাব তেমন গভীরে পৌঁছোতে পারে নি। কারণ, ঐ দুই চরিত্র শেক্সপীয়র রচিত চরিত্রের মতো ঐ-রূপ সমুন্নতি লাভ করতে পারে নি। তমসা চরিত্রটি তো মেলোড্রামাটিকতার দোষে দুষ্ট।

এছাড়াও এই 'তারাবাই' নাটক প্রসঙ্গে আরও একটি শেক্সপীয়রীয় নাট্য-প্রভাবের কথা মনে আনতে পারি। তা হচ্ছে শেক্সপীয়রের অনুসরণে গদ্য-পদ্য মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার। এখানে যে প্রচেষ্টার সূচনা দ্বিজেন্দ্রলাল করেছিলেন, এবং ব্যর্থ হয়ে নিজেই সে পথ ত্যাগ করে গেছেন। অতএব দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার পক্ষে যা যথার্থ নাট্যভাষা তা অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এই নাটকটির যে একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে তা অস্বীকার করা যাবে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-কালের শেষ রচনা বলে মনে করা হয় এবং তাঁর মৃত্যুর দু-বছর পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত [১৩ অক্টোবর, ১৯১৫] যে নাটক, সেই 'সিংহল-বিজয়' নাটকটিতে শেক্সপীয়রের দুটি বিখ্যাত নাটক 'টেম্পেষ্ট' ও 'সিম্বেলীন'-এর প্রভাব লক্ষ্য করতে পারি। প্রথমে 'টেম্পেষ্ট' নাটকের কথা বলা যাক। এই নাটকের কাহিনী যেমন লোকালয় থেকে বহু দূরে সমুদ্রে ঘেরা নির্জন দ্বীপে গড়ে উঠেছে; ঠিক তেমনি সিংহল বা লঙ্কা দ্বীপ বাস্তব

জগতের মধ্যে অবস্থিত হলেও, আজকের মানুষের ধারণায় তার অতীত ইতিহাস সবই কুহেলিকাময়, অস্পষ্ট কল্পনার বস্তু। টেম্পেষ্ট-এর নায়ক যেমন অতিলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, তার অনুচরেরাও যেমন অদ্ভুত অলৌকিক জীব, তেমনি সিংহলবাসীরা বিশেষ মায়া-মমতা সম্পন্ন যক্ষ। নায়ক প্রসপেরো সৃষ্ট মায়া-ঝড় যেমন ফার্দিনান্দকে নায়িকা মিরান্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরে মিলন ঘটাতে সাহায্য করেছিলো, ঠিক তেমনি দারুণ সামুদ্রিক ঝড় নায়ক বিজয়সিংহ এবং নায়িকা কুবেণীর মধ্যে মিলন-সেতু রচনা করতে সহায়তা করেছে।

দ্বিতীয়ে, ঐ অনুসরণ অতিক্রম করে আমরা শেক্সপীয়রের শেষ দিককার রচনা 'সিম্বেলীন'-এর প্রভাব এই 'সিংহল-বিজয়' নাটকে যেন একটু বেশী করে অনুভব করি। যেমন : ক. দুই নাটকের দুই রাজাই দ্বিতীয় পক্ষের কুমতি স্ত্রী কর্তৃক বশীভূত। খ. ব্রিটেন এবং সিংহল দু-দেশের ক্ষেত্রেই রাজ্যের প্রথম পক্ষের সন্তানের সঙ্গে সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারিণীর বিয়ে দিয়ে রাজ্যলাভের একটা চক্রান্ত দেখা যায়। তবে 'সিম্বেলীন'-এ যেখানে এই চক্রান্তকারী রাণী নিজে, অন্য পক্ষে 'সিংহল-বিজয়'-এ সেই চক্রান্ত করেছে রাণীর স্বামী কালসেন। গ. এ ছাড়াও ক্লোটেন ও জয়সেনের মধ্যে কিছুটা মিল দেখা যায়। ঘ. অধিকন্তু "আর একটি পরিকল্পনায় শেক্সপীয়রের প্রভাব আরও স্পষ্ট। সিম্বেলীন ও স্বামী পস্থিউমাস্ ছদ্মবেশিনী ইমোজেনকে চিনিতে পারে নাই ; বিজয়সিংহের স্ত্রী লীলা পুরুষের ছদ্মবেশে স্বামীর সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কিন্তু স্বামী তাহাকে চিনিতে পারে নাই। এইখানে শেক্সপীয়রের শেষ পর্বের সিম্বেলীন অপেক্ষা তাঁহার আদিপর্বের 'দি টু জেণ্টলমেন অব্ ভেরোনা'র সঙ্গে সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠতর। জুলিয়া ছায়ার মত প্রণয়ীর সাহচর্য করিয়াছে আর প্রণয়ী প্রটিউস্ তাহাকে চিনিতে পারে নাই. কিন্তু অতর্কিতে প্রণয়ীর অন্য নারী গ্রহণের সম্ভাবনার সন্ধিক্ষণে তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। লীলার পরিচয়ও অতর্কিতে ব্যক্ত হইয়াছে এবং তাহা জানিতে পারিয়াছে তাহার সপত্নী কুবেণী। লীলার আত্মত্যাগের কাহিনী অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের নিজস্ব, কিন্তু এই মৌলিকতা তাঁহার বিস্তীর্ণ ঋণের কাছে গৌণ।"[৬৩] ঙ. 'সিংহল-বিজয়' এবং 'সিম্বেলীন' উভয় নাটকেরই কাহিনী সংগ্রহ করা হয়েছে যথার্থ প্রমাণ-সিদ্ধ ইতিহাস থেকে নয়, পুরাকথা থেকে। চ. ফলে শেক্সপীয়রের শেষ পর্বের নাটকের রোমান্সধর্ম দ্বিজেন্দ্রলালের এই

নাটককে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। অপূর্ব নির্মাণক্ষম প্রতিভা শেক্সপীয়র তাঁর শেষ পর্যায়ের নাটকগুলিতে রোমান্সের আবরণে তাঁর নাট্য-জগতকে এমনভাবে কল্পনা করেছেন যে, তা যেন রূপকথায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব-জীবনের রস-রসিক শেক্সপীয়র মানুষের অন্তর্সত্যকে প্রকটিত করতে ব্যর্থ হন নি,—'সেখানেও ম্যাজিকের মধ্যে তিনি লজিককে ভুলে যান নি।' কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর এই নাটকে শেক্সপীয়রীয় রোমান্সকে অনুসরণ করতে গিয়ে তাল রক্ষা করতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্র-নাটকে লীলার ছদ্মবেশ-ধারণপূর্বক অপূর্ব বীরত্ব দেখানো বা আত্মবিসর্জন, কিংবা বিজয়ের স্ত্রী জাতির প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়ে লীলার দিকে নজর না দেওয়া; অথবা বিজয়সিংহের দেশপ্রেম তথা বিশ্বপ্রেমের পরিচয় দিতে গিয়ে সিংহবাহু উপকাহিনীকে অহেতুক প্রাধান্য দেওয়াব ব্যাপারের সঙ্গে, শেক্সপীয়রের ইমোজেন ['সিম্বেলিন']-এর ব্যবহার বা রাজা লিওন্টিসের ['দি উইন্টার্স টেল'] অকারণ সন্দেহ, কিংবা পার্ডিটা উপকাহিনীর [ঐ] অন্তর্গত যে চমৎকারিত্ব, তা কোন ভাবেই সাদৃশ্য-যুক্ত হতে পারে নি।

শেক্সপীয়রের নাটকাবলীর বহু কাব্যগুণ সমন্বিত অংশ বা সংলাপের যথাযথ অনুবাদ, কোথাও বা ভাবানুবাদ দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর অনেকগুলি নাটকে,—বিশেষ করে বিয়োগান্তক নাটকে সার্থক ভাবে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আগে এ-রকম অনেকগুলির কথা বলেছি, এখন আরও একটা নাটক 'পরপারে' [১৯১২ খ্রীস্টাব্দ]-র থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন, ঐ নাটকে দয়াল নামক জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি বলেছেন [৩ অঙ্ক। ১ দৃশ্য]: 'যা কখন ভাবনি এমন ব্যাপার পৃথিবীতে অনেক ঘটে।' এ-যেন হ্যামলেটের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি :

> There are more things in heaven and earth, Horatio,
> Than are dreamt of in your philosophy. 1. V.

ঠিক এই ভাবেই ঐ নাটকের এক ভ্রষ্টা নারী হিরণ্ময়ী যখন বলে :

> হিরণ্ময়ী। রৌদ্র বৃষ্টি শীত খল পুরুষদের চেয়ে ভালো। রৌদ্র যখন পোড়ায়—পোড়ায়, বলে না সে গোলাপ জলে স্নান করিয়ে দিতে এসেছে। শীতের দাঁত যখন মাংস কেটে বসে—সোজা বসে, তার মধ্যে ছলনা নাই। বৃষ্টি যখন নামে—প্রেমালিঙ্গন করে না, সোজা শত্রুভাবে মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে।

ঠিক একই ভাষায় শেক্সপীয়রের *As You Like It* নাটকের Duke Senior গান গেয়ে উঠেছেন :

Blow, blow, thou winter wind,
Thou art not so unkind
As man's ingratitude ;
Thy tooth is not so keen,
Because thou art not seen,
Although thy breath be rude…
Freeze, freeze, thou bitter sky,
That dost not bite so nigh
As benefits forget ;
Though thou the waters warp,
Thy sting is not so sharp
As friend rememb'red not… 2. VII.

দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম জনপ্রিয় নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত' [১৯১১] খ্রীস্টজন্ম পূর্বাব্দের ধূসর ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। এখানেও দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করতে বিরত থাকেন নি। এমন কি, এ নাটকে তাঁর কোনো কোনো পাত্র-পাত্রীর মুখে শেক্সপীয়রীয় সংলাপের হুবহু বঙ্গানুবাদ যেন শোনা গেছে। এখানে এ-বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের, এমন কি সমগ্র বাঙলা নাট্যসাহিত্যে, দ্বিজেন্দ্রলালের স্বষ্ট চাণক্য চরিত্রটি স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। নাট্যকার নিজে তাকে 'মেকিয়াভেলি'-র সঙ্গে তুলনা করলেও শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের ইয়াগো চরিত্রের সঙ্গে তার বহু বিষয়েই মিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন, চাণক্য ও ইয়াগো সমান কূট-কৌশলী। নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে উভয়েই মানুষের কদর্য প্রবৃত্তিগুলিকে কাজে লাগিয়েছে। [৩৷৩]। এ ছাড়াও চাণক্য এবং ইয়াগো বিশ্বাস করে যে, 'যখন ছুরি শানাচ্ছ তখন মুখে হাসতে হবে, যখন পানীয়ে বিষ মেশাচ্ছ তখন আলাপে মোহিত কর্ত্তে হবে।' [৩৷৩]। ইয়াগোর মতো চাণক্য গান গাইতে না পারলেও চাণক্যের মধ্যে কবি-প্রাণতা আছে। উভয়েই নিজের উদ্দেশ্য-চরিতার্থ করার জন্যে তীব্র গতিতে উর্ণনাভের মতো

চক্রান্তের জাল পাততে পাততে পরিণতির দিকে ছুটে গেছে। এই মিল সত্ত্বেও উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। ইয়াগোর 'হীনবুদ্ধি, উচ্চাশা, অর্থ-লোলুপতা, ঈর্ষা এবং অবদমিত যৌনকামনাই তার চরিত্রের মূল motive force।'[৬৪] এদিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর বাসিন্দা হচ্ছেন চাণক্য। রাজা, ঈশ্বর ও পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা ঐভাবে নিপীড়িত না হলে বোধ হয় তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ রূপেই স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করে যেতে পারতেন। অবশেষে যে স্নেহ-প্রেম ও মমতাকে অবলম্বন করে চাণক্য প্রকৃতিস্থ হলেন,—ইয়াগোতে কিন্তু তার একান্ত অভাব। বরঞ্চ চাণক্য চরিত্রের এই অংশের সঙ্গে শেক্সপীয়রের *Pericles, Prince of Tyre* নাটকের পেরিক্লিসের সঙ্গে সাদৃশ্য অনেকখানি প্রত্যক্ষ। এমন কি কন্যা আত্রেয়ীকে ফিরে পাওয়ার দৃশ্যের [৫।২] সঙ্গে শেক্সপীয়রের ঐ নাটকের [৫।১] দৃশ্য-যোজনায়, নাট্য-চরিত্রের আচরণে ও সংলাপ ব্যবহারে বেশ মিল দেখা যায়। যেমন :

> চাণক্য। [তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে] একেবারে সেই মুখ! সেই চক্ষু দুটি! একেবারে—অথচ ভিক্ষুক। ৫।২
>
> *Pericles.* I am great with woe, and shall deliver weeping
> My dearest wife was like this maid, and such a one.
> My daughter might have been my queen's square brows;
> Her stature to an inch; as wand-like straight;
> As silver voic'd; her eyes as a jewel-like. 5. I.

এরপরে দুই পিতার আনন্দাশ্রু বিসর্জন এবং সংলাপও প্রায় একই ধরণের।

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের ৪র্থ অঙ্ক ৪ম দৃশ্যের প্রথমাংশে দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের ৫।৩, ৫।৭, ৫।৮ দৃশ্যগুলির দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এমন কি চন্দ্রগুপ্ত ও ম্যাকবেথের সংলাপ পর্যন্ত এক। যেমন :

> চন্দ্রগুপ্ত। শেষে আমারই প্রজা, আমারই সৈন্য—বিপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়েছে!—বাইরে শত্রু, ঘরে শত্রু।···যুদ্ধে মর্ব। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত আমায় খুঁচিয়ে মার্তে দেব না। যুদ্ধক্ষেত্রে, নক্ষত্র খচিত মুক্ত নীল আকাশের তলে আমার সৈন্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কর্তে কর্তে মর্ব।

তুলনীয় :

Mac. Bring me no more reports ; let them fly all.
Then fly, false. thanes,…
Doctor, the thanes fly from me.…
They have tied me to a stake ; I cannot fly,
But, bear-like, I must fight the course. 5. III., VII

আবার চাণক্য যখন উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনায় স্বগতোক্তি করেছে [২।২] : 'শূকরের মুখ, উর্ণনাভের ত্বক, শবদাহের গন্ধ, এরণ্ডের আস্বাদ, আর গর্দভের চীৎকার একসঙ্গে কড়ায় চাপিয়েছি।' এই পাকশালা ঠিক 'ম্যাকবেথে'র ডাইনীদের অনুরূপ, কারণ সেখানেও :

ACT FOUR

SCENE I. *A dark cave. In the middle, a cauldron boiling.*

Thunder

2 *Witch.* Fillet of a fenny snake,
In the cauldron boil and bake ;
Eye of newt, and toe of frog,
Wool of lat, and tongue of dog,
Adder's fork, and blind-worm's sting,
Lizard's leg, and howlet's wing—
For a charm of pow'rful trouble,
Like a hell-broth boil and bubble.

ঠিক একই পরিবেশে তিন ডাইনী ভগিনী ঠিক চাণক্যের ধরণেই রান্না চাপিয়েছে।[৬৫]

এ ছাড়াও শেক্সপীয়রের 'দি মার্চেন্ট অব্ ভেনিস' নাটকে নিগৃহীত শাইলক যেমন বলেছে :

I am a Jew. Hath not a Jew eyes ? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions, fed with the same food,… 3. I.

ঠিক এই একই ভাষায় মুরা কথা কয়ে উঠেছে [১/৪] : 'শূদ্রাণী!—শূদ্র

মানুষ নহে? তার কি ক্ষত্রিয়ের মত হস্তপদ নাই? মস্তিষ্ক নাই? হৃদয় নাই? এত ঘৃণা!···দেখাবো যে সে মানুষ।'

এ-ছাড়াও আরো কেউ কেউ 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে আরও কিছু শেক্সপীয়রীয় অনুসরণ লক্ষ্য করেছেন। যেমন "দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আণ্টিগোনাস বলেছে হেলেন আত্মদান না করলে সে সেলুকসকে আজীবন অন্ধকার কারাগৃহে আবদ্ধ রাখবে। তবুও হেলেন অসম্মত হল, কিন্তু চরম মুহূর্তে সেলুকস দুর্বল হয়ে অশ্রুবিসর্জন করলেন। *Measure for Measure* নাটকে এঞ্জেলা-কর্তৃক ক্লডিওর বধদণ্ডাজ্ঞা এবং ইসাবেলা আত্মসমর্পণ করলে, তাকে মুক্তি দেবার প্রতিশ্রুতিদান অনেকাংশে পূর্বোক্ত ঘটনায় রূপায়িত হয়েছে। চরম মুহূর্তে ক্লডিও ইসাবেলার দেহের বিনিময়ে তার প্রাণভিক্ষা চেয়েছে।

"অ্যাণ্টিগোনাস চরিত্রের ক্ষোভপূর্ণ উক্তি অনেকাংশে কিং লিয়ারের নাটকের এডমাণ্ডের মত। চন্দ্রগুপ্ত ও তার মাতার প্রতি নন্দের লাঞ্ছনা ও শূদ্রাণী মা শব্দের ব্যবহারও অনেকাংশে 'কিং লিয়ারে' কেণ্টের উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য এডমাণ্ড ও চন্দ্রগুপ্তের চরিত্র-পার্থক্যহেতু এর প্রতিক্রিয়া উভয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়েছে।"[৬৬]

শেক্সপীয়র তাঁর 'দি উইণ্টার্স টেল'—প্রভৃতি কয়েকটা নাটকে আষাঢ়ে কাহিনী ফেঁদে সময়ের ব্যবধান-ঘটিত ঐক্যকে সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, শেক্সপীয়রের মতো প্রতিভাও তাতে বিশেষ সার্থকতা অর্জন করতে পারে নি। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলালের মতো নাট্যকারও তাঁর 'সোরাব রুস্তম' [১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ] নাটকের কাহিনীর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে বিশ বছরের ব্যবধানকে, শেক্সপীয়রের নাট্য পরিকল্পনার অনুসরণে,—অস্বীকার করতে সাহসী হলেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই সফল হলেন না।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' [১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ] নাটকটিতে শেক্সপীয়র আন্তরিকভাবে অনুসৃত হওয়ায় এটি একটি সার্থক ট্রাজিডি হয়ে উঠেছে। "সমগ্র নাট্যকাহিনীটি ঘন-সংবদ্ধ, আদি-মধ্য এবং অন্ত্যরেখার সুবলয়ে সুডোল ভাবে চিত্রিত। নাটকীয় কৌতূহলের প্রথম বীজটি প্রথম দৃশ্যেই রোপিত। ঠিক শেক্সপীয়রের নাটকের মতোই প্রথম দৃশ্যটিকে বলা যায় 'Key-note of the play; সেটা এক কথায় বলা হয়েছে: 'তাইত! এ বড় দুঃসংবাদ দারা'।"[৬৭]

দ্বিজেন্দ্রলালের বোধ হয় সবচেয়ে প্রিয় নাটক ছিলো শেক্সপীয়রের

'কিং লীয়র'। তা না হলে তিনি এমন পরিপূর্ণ ভাবে ঐ নাটক এবং তার লীয়র চরিত্রটিকে 'সাজাহান'-এ অনুসরণ করতে চাইবেন কেন? এখানকার বহু দৃশ্য যেমন, তেমনি অনেক চরিত্র কিং লীয়রের অনুরূপ। এমন কি সাজাহানের বহু সংলাপও লীয়রের উক্তির ভাবানুবাদ বলে মনে হয়। অবশ্য কোন কোন সমালোচক বলতে চান যে 'সাজাহান' নাটকে ঔরঙ্গজীব যে ভাবে একের পর এক হত্যার আশ্রয় নিয়েছে তাতে তাঁর চরিত্রে ম্যাকবেথের ধর্ম লক্ষ্য করা যেতে পারে। সাজাহান যখন নিজ পৌত্র মহম্মদকে বলেছেন:

আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। একি একটা সত্য ঘটনা না সব স্বপ্ন? আমি কে? সম্রাট সাজাহান? ১।৭

এখানে লীয়রের ভাবানুসরণে শুনতে পাচ্ছি:

Does any here know me? This is not Lear
Does Lear walk thus? Speak thus? Where are his eyes?
Either his motion weakens, or his discernings
Are lethargied. —Ha. waking? Tis not so.
Who is it that can tell me who I am? I. IV.

'সাহজাহান' নাটকের পূর্বোদ্ধৃত অঙ্ক ও দৃশ্যে ঔরঙ্গজীব প্রমুখ সন্তানগণের অকৃতজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে হাহাকার করে ওঠা সাজাহানের পিতৃত্ব, ঠিক কিং লীয়রের ভাব ও ভাষা নিয়ে বলে উঠেছে:

সাজাহান। সত্য বলেছো কন্যা—পিতা সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না; বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না; তা'দের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো না। তা'রা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর। তা'রা সব শিশু-শয়তান।

Lear. It may be so, my lord.
Hear, Nature, hear; dear goddes, hear.
Suspend thy purpose, if thou didst indeed
To make this creature fruitful.
Into her womb convey sterility;
Dry up in her the organs of increase;
And from her derogate body never spring
A babe to honour her! I. IV.

লীয়র এবং সাজাহানের অন্তরের তীব্র সংক্ষোভ এবং প্রচণ্ড আলোড়নকে বাইরের প্রকৃতি জগতের ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিদ্যুৎপাত ইত্যাদির পটভূমিকায় স্থাপন করে দুটি নাটকেই সমান ভাবে গাম্ভীর্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ঐ বাইরের ঝড় যেমন লীয়র চরিত্রকে পরিবর্তনের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে, তাঁর পুরাতন সত্তাকে ভেঙ্গে চুরে নতুন বোধ ও বুদ্ধির দুয়ারে এনে হাজির করেছে; ঠিক একই ভাবে বাইরের জগতের ঝড় সাজাহানের অন্তর্বিক্ষোভের সঙ্গে মিশে হৃদয়াবেগের উন্মাদনাকে প্রকাশ করেছে। এই দুই নাটকের দুই দৃশ্যের মধ্যে বেশ কিছুটা ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে। 'সাজাহান' নাটকে যখন বলা হচ্ছে:

জহরৎ। উঃ কি গর্জন! বাইরে পঞ্চভূতের যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। আর ভিতরে এই অর্দ্ধোন্মাদ পিতামহের মনের মধ্যে সেই যুদ্ধ চলেছে। ৫।৩

'কিং লীয়র' নাটকেও সেই রকম বলা হচ্ছে:

Gent. Contending with the fretful elements;
Bids the wind blow the earth into the sea,
Or swell the curled waters 'bove the main,
That things might change or cease; tears his white hair, 3.I.

'সাজাহান' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পিতাকে পীড়নকারী ঔরঙ্গজীব পিতা বর্তমানেই পিতৃ-সিংহাসনে জোর কোরে বসলে বৃদ্ধ সম্রাট সমগ্র সংসারের অকৃতজ্ঞতায়, প্রচণ্ড আত্মধিক্কারে বলে উঠেছেন: 'যদি তাই হয়, তবে এখনও আকাশ—তুমি নীলবর্ণ কেন! সূর্য! তুমি এখনো আকাশের উপরে কেন? নির্লজ্জ! নেমে এসো! একটা মহাসংঘাতে তুমি চূর্ণ হ'য়ে যাও। ভূমিকম্প! তুমি ভৈরব হুঙ্কারে জেগে উঠে এ পৃথিবীর বক্ষ ভেঙ্গে খান খান করে' ফেল। একটা প্রকাণ্ড দাবানল জ্বলে উঠে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে চলে যাও। আর একটা বিরাট ঘূর্ণীঝঞ্ঝা এসে সেই ভস্মরাশি ঈশ্বরের মুখে ছড়িয়ে দাও।' এই চিত্ত-বিক্ষোভ যেন রাজা লীয়রের হাহাকারেরই প্রতিধ্বনি:

**And thou, all-shaking thunders
Strike flat the thick rotundity O' th' world;
Crack nature's moulds, all germents spill at once,
That makes ingrateful man. 3. II.**

এত সব ঘটনা, পীড়ন ও অপমানের মধ্যেও সাজাহানের সম্রাটত্বের বোধ অত্যন্ত প্রবল : 'আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে, কিন্তু আমি সাজাহান।' [১।৭]। ঠিক এই মতই রাজা লীয়রও বলেছেন : 'Ah, every inch a king.' [4. VI.]

আঘাতে আঘাতে বিদীর্ণ হৃদয় সাজাহানের মধ্যে যখন মাঝে মাঝেই উন্মত্ততার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তখন জাহানারা সম্রাট সম্পর্কে বলছে : 'এ উন্মত্ততা নয়! এর সঙ্গে জ্ঞান জড়ানো রয়েছে। এ যেন ছন্দে বিলাপ' [৫।৬]। ঠিক এরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আমরা লীয়র সম্পর্কে এডগারের বক্তব্যে :

Edg. O, matter and impertinency mix'd !
Reason in madness ! 4. VI.

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন : "মানুষের অন্তর্জগৎ মন্থন করিয়া তাঁহার অপূর্ব নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন বলিয়াই, শেক্সপীয়র জগতের আদর্শ কবি। তাই বলিয়া বহির্জগৎ কাব্য হইতে বাদ দিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বরং কার্যের বা প্রবৃত্তির সৌন্দর্যকে বহিঃসৌন্দর্যের 'পাটে' বসাইলে কাব্যের সৌন্দয বৃদ্ধি হয়। শেক্সপীয়র এই হিসেবেই Lear এর মনের ঝটিকা বাহিরের ঝটিকার background-এ আঁকিয়া এক অপূর্ব চিত্রের রচনা করিয়াছেন।"[৬৮] এই ধারণাকেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'সাজাহান' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে প্রয়োগ করলেন :

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রার সাজাহানের প্রসাদ কক্ষ। কাল—রাত্রি।

বাহিরে ঝটিকা বৃষ্টি বজ্র ও বিদ্যুৎ।

সাজাহান ও জহরৎ উন্নিসা

সাজাহান। দে বেটারা! খুব দে, খুব দে! পৃথিবী নীরব হয়ে' সব সহ্য কর্বে।··· ওর যেমনি কর্ম তেমনি ফল। দে বেটারা। কি কর্বে ও? রাশি রাশি গৈরিক জ্বালা উদ্বমন কর্বে? করুক, সে গৈরিক জ্বালা আকাশে উঠে দ্বিগুণ জোরে তারই বুকে এসে লাগবে। সে সমুদ্র তরঙ্গ তুলে ক্রোধে ফুলে উঠ্‌বে! ··· দে, ওর বুকের উপর দিয়ে দলে' দলে' চষে' দিয়ে যা! ও কিছু কর্তে পার্বে না—দে বেটারা!—মা, একবার গর্জে' উঠতে পারো না? প্রলয়ের ডাকে ডেকে, শত সূর্যের প্রভায় জ্বলে উঠে, ফেটে চৌচির হ'য়ে—

মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে একবার ছুটকে যেতে পারো না—দেখি, ওরা কোথায় থাকে !

দন্ত ঘর্ষণ

অথবা এর ঠিক পরের সংলাপেই :

সাজাহান। ইচ্ছা কর্চ্ছে জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে একবার ছুটে বেরোই। আর এই শাদা চুল ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছা কর্চ্ছে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই। ইচ্ছা কর্চ্ছে যে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে বা'র করে' তা ঈশ্বরকে দেখাই ! ঐ আবার গর্জন !—মেঘ ! বার বার কি নিষ্ফল গর্জন কর্চ্ছ ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে' দিতে পারো ? অন্ধকার ? কি অন্ধকার হয়েছো ! তোমার পিছনে ঐ সূর্য, নক্ষত্রগুলোকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেল্‌তে পারো ?

মেঘ গর্জন

অনুরূপভাবে আমরা 'কিং লীয়র' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দেখতে পাচ্ছি :

SCENE II.

Another part of the heath.

Strom still *Enter* LEAR *and* FOOL.

Lear. Blow, winds, and crack your cheeks ; rage blow.
You cataracts and hurricanoes, spout
Till you have drench'd our steepless, drown'd the cocks.
You sulph'rous and thought executing fires,
Vaunt-couriers of oak-cleaving thunder-bolts,
Singe my white head.

অথবা এর পরবর্তী সংলাপ :

Lear. Rumble thy bellyful. Spit, fire ; spout, rain.
Nor rain, wind, thunder, fire, are my daughters.
I tax not you, you elements, with unkindness ;
I never gave you kingdom, call'd you children ;

You owe me no subscription. Then let fall
Your horrible pleasure. Here I stand, your slave,
A poor, infirm, weak and despis'd old man :
But yet I call you servile ministers
That will with two pernicious daughters join
Your high-engender'd battles 'gainst a head
So old and white as this. O, ho ! 'tis foul ! 3. II.

'কিং লীয়র' নাটকের এবং তার লীয়র চরিত্রের সঙ্গে 'সাজাহান' নাটকের ও সাজাহান চরিত্রের ভাব বা ভাষাগত নৈকট্য থাকলেও শেক্সপীয়রের আর একটি নাটক *Timon of Athens* নাটকের নাম-চরিত্র টাইমনের কিছু কিছু উক্তিরও মিল দেখা যায়। যেমন, এথেন্সবাসীদের কৃতঘ্নতায় ক্ষুব্ধ টাইমন মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন, ঠিক তেমনি সাজাহানও শোকে জর্জরিত হয়ে তাঁর প্রিয় প্রজাদের ওপর সাময়িকভাবে আস্থা বা বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। 'সাজাহান' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষদিককার সাজাহানের মনোভাব ও সংলাপের সঙ্গে টাইমনের একাধিক উক্তির তুলনা করা যেতে পারে। এখানে জাহানারা আগ্রাবাসীদের সম্পর্কে যেসব কথাবার্তা বলেছেন, যেমন : 'নীচ সংসার সেই রকমই চল্‌ছে বাবা! বন্দী সাজাহানকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না।···সংসার কাউকে নিয়ে ভাবে না। সবাই নিজের নিজের নিয়ে ব্যস্ত। ···না বাবা! —মানুষ খোসামুদে—কুকুরের মত খোসামুদে···' ইত্যাদির সঙ্গে টাইমনের : 'Hate all, curse all, show charity to none.' প্রভৃতি সংলাপের তুলনা করা যেতে পারে।

শেক্সপীয়রের কিং লীয়র নাটকের আর যে একটি চরিত্রের সঙ্গে 'সাজাহান' এর অপর একটি চরিত্রের সাদৃশ্য আছে তা হচ্ছে 'দিলদার' এবং 'ফুল' [Fool]-এর মধ্যে। এ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনচরিত রচয়িতা নবকৃষ্ণ ঘোষ তাঁর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে বলেছেন : "লীয়ারের যেমন 'ফুল' [Fool] মোরাদের তেমনি দিলদার। 'ফুল' যেমন লীয়ারকে তাঁহার দুষ্ট কন্যাদ্বয়ের কপটতা বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, দিলদারও তেমনি মোরাদকে পিতৃদ্রোহিতার মহাপাপ হইতে, ঔরঙ্গজীবের সাংঘাতিক ছলনা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শুনে কে? লীয়ার মতিচ্ছন্ন, মোরাদ নির্বোধ" [২য় সংস্করণ : পৃ. ১৮১]। কিন্তু, এই মন্তব্য সত্ত্বেও এবং 'ফুল' চরিত্রটির ছায়ায়

দিলদার চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়ে থাকলেও উভয়ের মধ্যে কিছু বাহ্য আচার বা সংলাপ-ব্যবহার-গত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় মাত্র। এ-ছাড়া দুয়ের মধ্যেকার আন্তর-প্রকৃতির ব্যবধান দুস্তর।

সেই কারণেই আমরা এখানে কেবল দিলদারের সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল কি ভাবে শেক্সপীয়রের কিং লীয়র নাটকের অনুকরণ করেছেন তারই কিছু উদাহরণ উপস্থিত করার চেষ্টা করবো :

ক। 'ফুল' সম্পর্কে লীয়রকে কেণ্ট যেমন বলেছে :

> *Kent.* I can keep honest counsel, ride, run, mar, a curious tale in telling it, and deliver a plain message bluntly. That which ordinary men are fit for, I am qualified in ; and the best of me is diligence. I. IV.

ঠিক একই ভাবে দিলদার নিজের সম্বন্ধে নিজেই ঔরঙ্গজীবকে বলেছেন : 'কিছু করতে পারি না। হাই তুলতে পারি, একটা কাজ দিলে সেটা পণ্ড করতে পারি, গালাগালি দিলে সেটা বুঝতে পারি—আর কিছু পারি না জাহাপনা।' [২।১]।

খ। আবার 'কিং লীয়র' নাটকে উন্মাদের ছদ্মবেশধারী এড্‌গার তার নিজের সম্বন্ধে যেমন লীয়রকে বলেছে :

> *Edg.*·····Wine lov'd I deeply, dice dearly : and in woman out-paramour'd the Turk. False of heart, light of ear, bloody of hand ; hog in sloth, fox in stealth, wolf in greediness, dog in madness, lion in prey. 3. IV.

প্রায় ঠিক একই ভাষায় নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে দিলদার ঔরঙ্গজীবকে বলেছেন :

> আমি একজন বেজায় পুরানো গাঁটকাটা, ধাপ্পাবাজ, চোর। আমার স্বভাবটা হচ্ছে খোসামুদী, বাঁদরামি, জোচ্চোরী, পেজোমীর একটা ঘণ্ট। আমি শামুকের চেয়ে কুঁড়ে, কুকুরের চেয়েও পা-চাটা, চড়ুয়ের চেয়েও লম্পট। ২।১

আবার কেণ্ট 'ফুল' সম্পর্কে লীয়রকে বলেছেন : 'This is not altogether Fool, my Lord.' 'সাজাহানে'ও দিলদার সম্পর্কে ঔরঙ্গজীব বলেছেন : 'তুমি তো শুধু বিদূষক নও'।

অন্যত্র 'কিং লীয়র' নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে লীয়র এবং 'ফুল'-এর মধ্যে আপাত-নির্বোধ অথচ দ্ব্যর্থবোধক যে সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে পাচ্ছি :

Fool She will taste as like this as a crab does to a crab. Thou canst tell why one's nose stands i' th' middle of on's face ?

Lear. No.

Fool. Why, to keep one's eyes of either side's nose, that what a man cannot smell out, he may spy into.

ঠিক এই ধরণের ভাষাগত সৌসাদৃশ্য পাচ্ছি দিলদারের সংলাপে [১।২]। সেখানে দিলদার বলছেন :

দিলদার।……ঈশ্বর নাক দিয়েছিলেন কেন ? নিঃশ্বাস ফেলবার জন্য ত ?

মোরাদ। হাঁ, আর শুঁকবার জন্যও বোধ হয়।

দিলদার। কিন্তু মানুষ তার উপর—বাহাদুরী করেছে ! সে আবার সেই নাকের উপর চশমা পরে ' দয়াময়ের নিশ্চয়ই সে উদ্দেশ্য ছিল না।

অধিকন্তু, রাজা লীয়রের 'ফুল' তাঁর কৌতুককর, অথচ শ্লেষপ্রধান সংলাপের দ্বারা বারেবারে রাজাকে তাঁর মেয়েদের ষড়যন্ত্র এবং নীচতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলো ; ঠিক তেমনিই দিলদারও বিশেষত নাটকের প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের উক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে ঔরঙ্গজীবের কপটতা ও নীচতা সম্পর্কে মোরাদকে সচেতন করে দিয়েছিলেন। দুই নাটকের উক্ত দুই চরিত্রের সংলাপগুলিকে পাশাপাশি রেখে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, দিলদারের নাট্যভাষা 'ফুলে'র মুখের কথার প্রতিধ্বনিতে রচিত।

এ ছাড়াও সমগ্র 'সাজাহান' নাটকটিতে দ্বিজেন্দ্রলাল আরও কতভাবে, কত ভঙ্গীতে শেক্সপীয়রের বেশ কিছু নাটককে যে অনুসরণ করেছেন তা উদাহরণ দিয়ে শেষ করা কঠিন। এখানে আরও কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র করবো। যেমন :

১. ঔরঙ্গজীবের বাক্যের প্রয়োগপটুতা, বুদ্ধিঋদ্ধ কপটাভিনয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের জন্যে রক্ততৃষ্ণা এবং মিথ্যা কথা ও আচরণ আমাদের বহুলাংশে 'রিচার্ড দি থার্ড' নাটকের রিচার্ডকে মনে করিয়ে দেয়। লেডী এ্যানকে মুগ্ধ করবার চেষ্টার সঙ্গে ঔরঙ্গজীব কর্তৃক জাহানারাকে স্বপক্ষে আনার চেষ্টাও তুলনীয়।

২. ঔরঙ্গজীবের 'বিবেকের যবনিকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি'-রূপ যে অনুতাপ তাঁর দিনের ভাবনা, রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলো, সেই চিত্র আঁকার কাজে এবং তৎ-সময়ের সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রিচার্ড, ম্যাকবেথ ও হ্যামলেটের আচরণ ও প্রেতদর্শন ব্যাপারটির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

৩. দারার কন্যা জহরৎ উন্নিসা নাটকের শেষে [৫।৬] ঔরঙ্গজীবের প্রতি যে অগ্নিগর্ভ অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ করেছে, তা শেক্সপীয়রের 'রিচার্ড দি থার্ড' নাটকের চরিত্র রাজা ষষ্ঠ হেনরীর বিধবা পত্নী মার্গারেট প্রদত্ত অভিসম্পাতকে [১।৩] মনে পড়িয়ে দেয়।

৪. সাজাহান নাটকের কাশ্মীরের রাজা পৃথ্বীসিংহের প্রমোদোদ্যানের দৃশ্যটি [৩।৪] রচনার সময় দ্বিজেন্দ্রলাল বোধ হয় 'এ্যাণ্টনি এণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের সিন্‌ডাস নদীর পরিবেশগত কাব্যময়তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

৫. 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে ক্যাসিয়াসের প্রতি সীজারের সন্দেহ পরায়ণতা [১।২]-র অনুসরণ বোধহয় ঔরঙ্গজীব কর্তৃক নিজ পুত্র মহম্মদকে সন্দেহ করার মধ্যে [৩।৫] দেখতে পাই।

মাত্র একটি নাটকের সামান্য কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করে আমরা দেখাতে পারলাম যে দ্বিজেন্দ্রলালের ওপর শেক্সপীয়র-প্রতিভার কি অপরিসীম প্রভাব পড়েছিলো। এ বিষয়ে প্রখ্যাত দ্বিজেন্দ্র-সমালোচক যা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : 'দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু পাশ্চাত্য নাটকের সুরসিক পাঠকই ছিলেন না, তিনি দীর্ঘদিন ধরে শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতি বাংলা নাটকে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। এ-বিষয়ে সাজাহান নাটকেই চরম সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল। শেক্সপীয়রের চরিত্রসৃষ্টি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ট্রাজেডি পরিকল্পনা ও জীবনরহস্যের গভীরে অবতরণ করার নাটকীয় কৌশল তিনি এই নাটকে অনেকখানি আয়ত্ত করেছেন। সাজাহান নাটকে তিনি শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি পরিকল্পনার সার্থকতা দেখিয়েছেন। শেক্সপীয়র বাঙালী নাট্যকারদের প্রিয়তম শিল্পী হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের আগে আর কোনো নাট্যকার শেক্সপীয়রীয় রীতি এমন সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন নি।'[৬৭] এ-বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে এক অপূর্ব নির্মাণক্ষম প্রতিভা।

ছ.

: শেক্সপীয়র ও অপরাপর বঙ্গীয় নাট্যকারগণ

অমৃতলাল বসু [১৮৫৩-১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ] নিজের পিতার সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন : "ইনি [অমৃতলালের পিতা] অদ্বিতীয় শেক্সপীয়র পাঠক ক্যাপটেন ডি. এল. রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্রগণের অন্যতম। 'ওরিয়েণ্টালের' কৃতবিদ্য ছাত্রেরা মহাসমারোহে শেক্সপীয়রের নাটক অভিনয় করিতেন ; তখন সে অভিনয়ের ইনি একজন প্রধান উদ্‌যোগী ও পরিচালক ছিলেন। তাছাড়া ইনি স্বয়ং একবার হ্যামলেটে প্রেতাত্মার অংশ অভিনয় করেন, গ্রন্থকারের এইটুকু জানা আছে। শেক্সপীয়র আবৃত্তি করিয়া ইনি যে প্রাণোন্মাদকর অমিয়াময় মধুর ঝঙ্কার তুলিতেন, তাহা শুনিয়া শুনিয়া শৈশবকাল হইতেই গ্রন্থকারের হৃদয়ে সেই জগৎ কবির পবিত্র প্রীতি অনুরাগ অঙ্কুরিত হইতে থাকে।"[৭০] এবং এই অঙ্কুর কালে অমৃতলালের সংস্কারে এমন একটি পুষ্প-পল্লবিত অটবীর আকার ধারণ করে যে, উত্তরকালে তিনি ভাবতেই করতে পারতেন না যে : 'তিনি ব্যতীত আর কেহ শেক্সপীয়র আবৃত্তি করিয়া সু-অভিনয় করিতে পারিবেন। আর সেই অভিমানেই তিনি গিরিশচন্দ্রের অভিনয় ['সধবার একাদশী'তে নিমে দত্তের চরিত্র] দেখিতে যান নাই।'[৭১] কিন্তু অমৃতলালের লেখায় শেক্সপীয়র সম্পর্কে উক্ত সংস্কার বা অভিমান মধুসূদন-দীনবন্ধু-গিরিশ বা দ্বিজেন্দ্রলাল এমন কি রবীন্দ্রনাথের মতোও গভীরশায়ী প্রভাব অথবা বাহ্যিক অনুসরণের ক্ষেত্রে তেমন কোন অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে নি।

তবে যেহেতু জগতে কোনো জিনিষই বৃথা যায় না, তাই শেক্সপীয়র সম্বন্ধে অমৃতলালের আবাল্য পরিচয় তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে কিছু না কিছু চিহ্ন রেখে গেছে। এখানে আমরা সে-সম্বন্ধে কিছু তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করবো।

১. অমৃতলালের 'আদর্শ বন্ধু' [১৯০০ খ্রীস্টাব্দ] নাটকের দণ্ডার চরিত্রটির সঙ্গে শেক্সপীয়রের 'মেজার ফর মেজার' নাটকের ডিউকের কিছু ব্যবহার এবং কোন কোন কাজের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায় ;—যেমন, ঐ দুজনের দুই নাটকের মধ্যে ছদ্মবেশ ধারণের ব্যাপারে। তবে এর মধ্যে অমৃতলালের দণ্ডার ছদ্মবেশ ধারণের কারণটি অনেকখানি স্পষ্টতর। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ক্লডিয়াকে ডিউক কর্তৃক দেখতে যাওয়ার ব্যাপারটির অনুসরণে দণ্ডার সিংহ কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত পৃথ্বীরাজের সঙ্গে কারাগারে দেখা করতে যাওয়া ঘটনাটির মিল দেখা যায়।

২. পরবর্তী 'নব যৌবন' [১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ] কমেডিটির মধ্যেও আমরা শেক্সপীয়রের ছায়া লক্ষ্য করতে পারছি। যেমন: অলকা এবং সুকুমারের যে প্রণয় ব্যাপার পরস্পর সহযোগীরূপে অগ্রসর হতে চেয়েছে, তা পোর্শিয়ার পাশে নেরিশা এবং রোজালিণ্ড-এর পাশে সিলিয়ার প্রেমের পারস্পরিকতাকে স্মরণ করায়। এবং শেক্সপীয়রের শেষোক্ত এই দু-জনের চরিত্রের যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য তার অনুসরণ দেখতে পাই অলকা এবং সুকুমারের মধ্যে।

৩. শেক্সপীয়রের 'দি টেমিং অব্ দি শ্রু' নাটকের ক্রিস্টোফার স্লাইয়ের ভাষার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি 'রাজা বাহাদুর' [১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ] নাটকের ব্লকম্যান ফিশের ভাষায়। যেমন প্রথমে ক্রিস্টোফার স্লাই বলছে:

> *Sly.* Am I a Lord and have I such a lady ?
> Or do I dream ? Or have I dream'd till now ?
> I do not sleep : I see, I hear, I speak ; *Itro.* II.

প্রায় ঠিক এই ভাষায় ব্লকম্যান ফিশ্ বলেছে:

> ফিশ্। Am I a Lord ? Then where is my Lady ? Or do I dream ? Or have I dreamt till now ? I do not sleep ··· ··· I see I hear, I speak.

অবশ্য এই ফিশ্‌কে অনেক মৌলিক এবং হাস্যরসাত্মক সংলাপ ব্যবহার করতেও দেখি। স্লাই বা ফিশের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে যে চরিত্রগত সাদৃশ্য আছে তাকেও লক্ষ্য করতে অসুবিধা হয় না।

৪. 'কৃপণের ধন' প্রহসনের হলধরের কৃপণতার সঙ্গে 'দি মার্চেন্ট অব্ ভেনিস' নাটকের শাইলকের মিল আছে। এখানকার লরেঞ্জো এবং জেসিকার প্রণয়ের ছায়া রূপ দেখতে পাই আমরা হলধরের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত মন্মথ এবং কুন্তলার মধ্যে।

এইভাবে ছোটখাটো, এদিক-ওদিক মিলের সন্ধান আমরা অমৃতলালে পেলেও তাঁর প্রতিভা বাঙলা নাট্য-সাহিত্য-ক্ষেত্রের বিদ্রূপাত্মক নক্‌শা এবং প্রহসনের আঙিনায় যেভাবে মুক্তি পেয়েছে সেখানে শেক্সপীয়রীয় নাটকের বিচিত্র মানব স্বভাবের তরঙ্গকে স্থান দেবার পরিসর কোথায় ? তাই তাঁর বাল্যের শেক্সপীয়রের সংস্কার বা যৌবনের শেক্সপীয়রকে অধিকার সম্বন্ধে অভিমান, ব্যাপক বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো কাজেই লাগে নি বলে মনে হয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ [১৮৬৪-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ] বাঙলা সাহিত্যের

জগতে একজন প্রতিভাবান নাট্যকার রূপে স্বীকৃত। ইনি বাঙলা নাটকের প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী বা যুগসন্ধির' নাট্যকার হিসাবে সম্মান পেয়ে থাকেন। অন্যপক্ষে গিরিশচন্দ্র বাঙলা নাটক এবং মঞ্চে যে ভক্তিভাব-রসের প্লাবন বইয়েছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ এসে তাতে শক্ত হাতে রোমান্সের সিমেন্টে তৈরী বাঁধ দিলেন। উপরন্তু, অধিক পাওনা হিসেবে আমরা তাঁর নাটক থেকে কাহিনীর গল্পরসও পেয়ে গেলাম। অথচ, যাঁকে আশ্রয় করে আমাদের নাট্য-সাহিত্য পাশ্চাত্ত্য নাট্য-সমুদ্রে রস-পোত ভাসিয়েছিলো, সেই শেক্সপীয়র ক্ষীরোদপ্রসাদে এসে প্রায় বর্জিত হয়ে গেলেন। তবে এরই মধ্যে আমরা তাঁর 'রক্ষ ও রমণী' [১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ] নাটকে শেক্সপীয়রের 'দি টেম্পেস্ট'-এর প্রভাব অনুভব করি। তবে এই প্রভাব একেবারেই বাহ্যিক। ফলে, সর্বাণীর মধ্যে আমরা মিরাণ্ডার ছায়াটুকু মাত্র পেয়ে থাকি, তার বেশি কিছু নয়।

অবশ্য ঘটনা বা সংলাপ-সাদৃশ্য নয়, ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর শ্রেষ্ঠ তথা বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক 'নরনারায়ণ' [১৩৩৩ বঙ্গাব্দ]-এর আন্তর-পট রচনায় শেক্সপীয়রের দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ-সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন: 'শেক্সপীয়রীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে গেলে নাটকখানা ট্রাজেডী। এই ট্রাজেডী আসিয়াছে দুই দিক দিয়া।··· একদিকে মৃত্যুরূপা জননী, অন্যদিকে ইষ্টরূপী কৃষ্ণ। তাই নাটকটি শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডীর উপকরণ বহন করে ; ···কাহিনী বিন্যাসে ইহা যে শেক্সপীয়রীয় নাট্যশৈলীর সার্থক অনুবর্তন তাহা আমরা স্বীকার করিবই। কেন না, নাটকের কাহিনী গড়িয়া উড়িয়াছে নায়কের চরিত্র-বিকাশের মধ্য দিয়া।'[৭২]

ধীরে ধীরে এই ছায়াও ক্ষীণ হয়ে আসতে আসতে আজ প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্বদেশী আন্দোলন, কোলকাতা থেকে ভারতের রাজধানীর অপসারণ, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তি, প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ইত্যাদি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনা বাঙালী বুদ্ধিজীবীর উপরিস্তরে আমূল ও অবক্ষয়াত্মক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। জীবনাচরণের পথ গেছে তার পাল্টে। পুরাণো সমস্ত

মূল্যবোধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সর্বোপরি, আবেগপ্রবণ বাঙালীর কাছে শেক্সপীয়রীয় সাহিত্যের প্রবল হৃদয়াবেগ যে পরিবেশ এবং অবকাশে, প্রধানত উনবিংশ শতাব্দীতে [বা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার কয়েক বছর পর্যন্ত] মুক্তি পেয়েছিলো তা সাম্প্রতিককালে এসে যন্ত্রযুগের যন্ত্রণার জটিল জীবন জিজ্ঞাসার অরণ্যে হারিয়ে গেলো। তাই শেক্সপীয়রকে আর আক্ষরিক ভাবে অনুকরণ বা ভাবের দিক থেকে অনুসরণের প্রয়োজন রইলো না। যদিও শেক্সপীয়র ব্যাখাত মানব-প্রবৃত্তির ভালো-মন্দ দিকগুলির কোন পরিবর্তন হয় নি একথা ঠিকই,—কিন্তু সেইগুলি আর ঐ ভাবে বাঙলা নাটকে শেক্সপীয়রীয় অনুবর্তনায় প্রকাশ করার দরকার হলো না। দ্বিতীয়ত, শেক্সপীয়রের সামগ্রিক নাট্য-কৌশল অর্থাৎ ভাব-ভাষা-আঙ্গিক-গঠনশৈলী প্রভৃতি বিস্ফারিত হয়ে সমগ্র বাঙালীর নাট্যধারণাকে আবৃত করে ফেললো—সুগন্ধি আতর ছোট্ট শিশি থেকে বেরিয়ে সমস্ত বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়লে যেমন তাকে আর নির্দিষ্ট আধারে ধরা যায় না; অধিকন্তু ইবসেন, শ', গল্সওয়ার্দি, পিনেরো, স্ট্রিণ্ডবার্গ, ব্রেশট্, বেকেট, মিলার, ক্যামু, ইউজিন ও'নিল, ইওনেস্কো প্রমুখের জীবনযন্ত্রণায় জটপাকানো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ডায়েলেকৃটিক্সের উত্তাপের কাছে শেক্সপীয়র হয়ে গেলেন বাসি ফুলের মালা। তাই শেক্সপীয়র আজ বাঙলা রঙ্গমঞ্চের এবং নাট্যকারদের জগতে সশ্রদ্ধ পূজার্চনা পেলেও দৈনন্দিন উষ্ণ-সান্নিধ্যে থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বললে খুব বেশী একটা ভুল হবে না বলেই মনে করি।

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য: 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' [১ম খণ্ড: ১৯৬৮] পৃ. ১১৬।

২। 'ইহাই ইংরেজি ও সংস্কৃতের যুক্ত আদর্শে রচিত প্রথম মৌলিক মধুরাস্তিক বাঙ্গালা নাটক'। সুকুমার সেন: 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' [দ্বিতীয় খণ্ড: ১৩৬২]: পৃ. ৩১।

৩। 'কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ডিরোজিওর শিষ্যগণ…মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি। ১৮১৩ সালে কলিকাতার ঝামাপুকুর নামক স্থানে মাতামহের আলয়ে ইহার জন্ম হয়। ইহার মাতামহের নাম রামজয় বিদ্যাভূষণ।…কৃষ্ণমোহনের পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহাকে অতি ক্লেশে নিজ পরিবার

প্রতিপালন করিতে হইত।… সে সময়ে ভারতবন্ধু হেয়ার কালীতলাতে স্কুল সোসাইটীর অধীনে একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮১৮ কি ১৮১৯ সালে কৃষ্ণমোহন সেই পাঠশালাতে ভর্তি হইলেন।' তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে হেয়ার তাঁকে ১৮২২ সালে হেয়ার স্কুলে আনেন এবং ১৮২৪ সালে অবৈতনিক ছাত্ররূপে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে নেন। ১৮২৮ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ১৮২৯ সালে হিন্দু কলেজ থেকে পাশ করে বেরোবার পরেই তিনি হেয়ার সাহেবের স্কুলে চাকুরী পান। প্রতিবেশীর বাড়ীতে গো-হাড় নিক্ষেপ করায় ১৮৩১-এর ২৩শে আগস্ট কৃষ্ণমোহন বাড়ী থেকে বিতাড়িত হন এবং এক বছর পরে ১৭ই অক্টোবর খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি গোঁড়াদের বিরুদ্ধে 'এন্‌কোয়ারার' [১৮৩১ সাল] পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টান হিসাবে খ্রীস্টানদের কাছে শ্রদ্ধালাভ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ করেন। খ্রীস্টধর্ম প্রচার-বিষয়ক কিছু গন্থ রচনা তাঁর আছে। 'দি পারসিকিউটেড' ছাড়া আর কোন গ্রন্থেরই কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই। ১৮৬৮ সালে তাঁর পত্নী-বিয়োগ হয়। এবং সবশেষে 'স্বদেশ-বিদেশের লোকের আদর সম্ভ্রম পাইয়া সকলের সম্মানিত হইয়া কাল কাটাইয়া ··১৮৮৫ সালে কৃষ্ণমোহন স্বর্গারোহণ করেন।' : শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [১৯৫৭ সংস্করণ] : পৃ. ১০৯-১১২-এর তথ্য অবলম্বনে লিখিত।

৪। "আধুনিককালে বাঙ্গালীর প্রথম মৌলিক নাট্যরচনা [যেমন প্রথম মৌলিক কবিতা ও গল্প রচনা] হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের এবং ইংরেজিতে। এটি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় [পরে পাদরি] রচিত 'দি পার্সিকিউটেড' [১৮৩১]। উদারপন্থীর উপর গোঁড়া হিন্দুদের নির্যাতন যাহা কৃষ্ণমোহন নিজে অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই রচনাটির উপজীব্য।" : দ্রষ্টব্য ২ নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৪৬৫।

৫। "প্রকৃতপক্ষে এই নাটকখানি 'ভদ্রার্জুন'-র কয়েক মাস পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল····· "। দ্রষ্টব্য ১নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ১৩০।

৬। 'নাটকটিতে শেক্সপীয়রের হ্যামলেটের অনুকরণ প্রচেষ্টা আছে। নায়ক কীর্তিবিলাসের [আচরণ] হ্যামলেটের মত'। দ্রষ্টব্য ২নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৩০।

৭। দ্রষ্টব্য ১নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ১৬৬।

৮। ক্ষেত্র গুপ্ত: 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' [১৯৬০]: পৃ. ১০৩।

৯। দ্রষ্টব্য ১নং পাদটীকার গ্রন্থ: পৃ. ২০৩-৪। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য "গ্রন্থকার যে বলিয়াছেন তাঁহার রচনা 'is the first attempt made to introduce the regular tragedy into Bengallee drama,' সে দাবি মিথ্যা নয়। বিধবাবিবাহ নাটকের পূর্বে মরণান্তিক নাটক লেখা হইয়াছিল—কীর্তিবিলাস। কীর্তিবিলাস নাট্যরচনা হিসাবে কিছুই নয় এবং বইটির প্রচারও হয় নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় প্রথম ট্রাজিক নাটক আসলে 'বিধবা বিবাহ'। সুলোচনার আত্মহত্যার মত মর্মান্তিক পরিণতি সেকালের নাটক-গুলির মধ্যে মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী ছাড়া অন্যত্র পাই না। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর আত্মলোপ এমন ট্রাজিক নয়।": দ্রষ্টব্য ২নং পাদটীকার গ্রন্থ: পৃ. ৪৪-৫।

১০। দ্রষ্টব্য ৮নং পাদটীকার গ্রন্থ: পৃ. ১০৫।

১১। আশুতোষ ভট্টাচার্য: 'নাট্যকার শ্রীমধুসূদন'

১২। ঐ ঐ: পৃ. ৫১।

১৩। ঐ ঐ: পৃ. ৪৭।

১৪। অজিতকুমার ঘোষ: 'বাংলা নাটকের ইতিহাস'

১৫। বৈদ্যনাথ শীল: 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' [১৩৬৪]: পৃ. ১৩০।

১৬। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত: 'মধুসূদন: কবি ও নাট্যকার' [১৯৬০]: পৃ. ১৩২।

১৭। এই বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা আছে যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত'

১৮। ঐ ঐ: পৃ. ৪৮৪-৫।

১৯। দ্রষ্টব্য ১১নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৫১।

২০। এ-বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: ক্ষেত্র গুপ্ত: 'নাট্যকার মধুসূদন' [১৯০০]: পৃ. ১৮৮-৯। এবং মুনীর চৌধুরী: 'তুলনামূলক সমালোচনা' ঢাকা:

২১। মুনীর চৌধুরী: 'তুলনামূলক সমালোচনা' [ঢাকা: ১৯৬০]: পৃ. ২৪৫-৪৭।

২২। ঐ ঐ: পৃ. ২৩৯।

২৩। সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত: 'শেক্সপীয়ার' [১৯০৫]: পৃ. ৪৯৮।

২৪। ঐ ঐ : পৃ. ১৬৩।

২৫। 'দীনবন্ধু মিত্র' [১৩৫৮] : পৃ. ১২।

২৬। আশুতোষ ভট্টাচার্য : সম্পাদিত 'নীলদর্পণ' [১৯০৯] : ভূমিকা : পৃ. ২৪।

২৭। ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'দীনবন্ধু রচনাবলী' [সংসদ সংস্করণ : ১৯৬০] : ভূমিকা : পৃ. একত্রিশ।

২৮। ঐ ঐ । পৃ. বত্রিশ।

২৯। দ্রষ্টব্য ১৪নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ১০২-০৩।

৩০। দ্রষ্টব্য ১নং ঐ । পৃ. ৩৬৯।

৩১। বীণা ঘোষ : 'শেক্সপীয়র-অনুবাদ ও অনুবাদ-সমস্যা পৃ. ১১১।

৩২। দ্রষ্টব্য ১নং পাদটীকার গ্রন্থ [দ্বিতীয় ভাগ]। পৃ. ২৮।

৩৩। দ্রষ্টব্য ৩১ নং ঐ । পৃ. ১১৩-৪।

৩৪। দ্রষ্টব্য ৮নং ঐ । পৃ. ১২৪।

৩৫। দ্রষ্টব্য ১৪নং ঐ । পৃঃ ১৪৫-৬।

৩৬। দ্রষ্টব্য ১নং ঐ । [দ্বিতীয় ভাগ] : পৃ. ৫৩-৪, ৬৩।

৩৭। দ্রষ্টব্য ১৪নং ঐ । পৃ. ১৭১-র ১ ও ২ নং পাদটীকা।

৩৮। দ্রষ্টব্য ১নং ঐ । [দ্বিতীয় ভাগ] : পৃ. ৮৫।

৩৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'জনা' সম্পাদিত সংস্করণ

৪০। দেবেন্দ্রনাথ বসু : 'গিরিশচন্দ্র' [১৯৩৯] : পৃ. ৯৯।

৪১। '*Macbeth*' টীকাযুক্ত সংস্করণ : পি. ঘোষ এণ্ড কোং : পৃ. ৪২০।

৪২। আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'প্রফুল্ল' সম্পাদিত সংস্করণ পৃ. ১॥/০।

৪৩। 'গিরিশচন্দ্র' [১৯৩৮] : পৃ ১৩৬-৭।

৪৪। দ্রষ্টব্য ৪০নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৪৪-৫।

৪৫। দ্রষ্টব্য ৪৩নং ঐ । পৃ. ১২০-১।

৪৬। দ্রষ্টব্য ১৪নং ঐ । পৃ. ২০২।

৪৭। ক্ষেত্র গুপ্ত : 'সিরাজদ্দৌলা' সম্পাদিত সংস্করণ

৪৮। দ্রষ্টব্য ৪৭নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৯৮।

৪৯। ঐ ঐ : পৃ. ১৩২।

৫০। এই নাটকটি গিরিশচন্দ্রের একটি অসমাপ্ত রচনা। এর পঞ্চম অঙ্কটি দেবেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক রচিত হয়েছে। তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' [১৯৬০] : পৃ. ১৯৯ [পাদটীকা]।

৫১। কুমুদবন্ধু সেন : 'গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য' : পৃ. ৬০।

৫২। দ্রষ্টব্য ৪০নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৬১।

৫৩। দ্রষ্টব্য ১৪নং ঐ। পৃ. ১৭১-২।

৫৪। তুলনীয়: 'গিরিশচন্দ্রই শেষ খাঁটি বাঙালী প্রতিভা, বাঙালীর জাতীয় নাটক ও নাট্যাভিনয়ের আদর্শ, এমন কি একটা নাটকীয় ছন্দও সেই প্রতিভার সৃষ্টি, বাঙালী-যাত্রা ও বিলাতী নাটকের এমন সমন্বয় আর কেহ করিতে পারে নাই,—ঠিক ঐ বস্তুই বাঙালীর হৃদয় জয় করিয়াছিল।' : মোহিতলাল মজুমদার : 'বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি

৫৫। 'দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী' [সংসদ সংস্করণ] :
নাট্যজীবনের আরম্ভ' : পৃ. ৭০৮-০৯।

৫৬। ঐ ঐ

৫৭। ঐ ঐ

৫৮। ঐ ঐ

৫৯। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : 'নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল'

৬০। তুলনীয়: '...in her temper some adamant qualities and severity of purpose not ordinarily associated with the typically feminine' : A. Nicoll : *The Theory of Drama* [1937] : p. 157.

৬১। চিত্তরঞ্জন লাহা : 'বাংলা নাটকে ট্রাজেডি'

৬২। প্রভাতকুমার গোস্বামী : 'দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক'

৬৩। দ্রষ্টব্য ৫৯নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৮৪।

৬৪। ঋষি দাস : 'শেক্সপীয়র'

৬৫। বর্তমান গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট'-এ 'ম্যাকবেথ' নাটকের ডাইনীদের সংলাপ মূল ইংরেজী সহ রবীন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত করা হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক তা দেখে নিতে পারেন।

৬৬। দ্রষ্টব্য ৩১ নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ১৩৯। প্রসঙ্গত, সনৎকুমার

মিত্র : 'চন্দ্রগুপ্ত' সম্পাদিত সংস্করণ [১৯০৯]-এর ভূমিকাংশটি পাঠ করা যেতে পারে।

৬৭। দ্রষ্টব্য ৬২ নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ২১৯।

৬৮। দ্রষ্টব্য ৫৫নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৬৬০।

৬৯। রথীন্দ্রনাথ রায় : 'সাজাহান' সম্পাদিত সংস্করণ একশ চার-পাঁচ।

৭০। 'অমৃত-মদিরা' : পৃ. ২৭৭-৮।

৭১। অরুণকুমার মিত্র : 'অমৃতলাল বসুর জীবন ও সাহিত্য' পৃ. ৪৪।

৭২। দ্রষ্টব্য ১৫ নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৪৭৫।

৫.

শেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথের নাটক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১-১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ] তাঁর 'জীবনস্মৃতি' [১৯১২ খ্রীস্টাব্দ] গ্রন্থে লিখেছেন: 'তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্সপীয়র মিল্টন ও বায়রণ। ইহাদের লেখার ভিতরকার যে-জিনিসটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা।...আমাদের বাল্যবয়সের সাহিত্য-দীক্ষাদাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোর হইয়া ইংরেজী কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ধানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।'[১] শেক্সপীয়র সম্বন্ধে এই বাল্যকালীন সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা এবং বোধ ও উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথ কোনো দিনই ভুলতে পারেন নি। কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'মালিনী' নাটকের ভূমিকা ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে লিখতে গিয়েও পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'শেক্সপীয়ারের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহু শাখায়িত বৈচিত্র্য ব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।'

এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবনের বহু গল্পে-কবিতায় এবং আলোচনায় ও প্রবন্ধে শেক্সপীয়রকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন বা তুলনায় সমালোচনা করেছেন।[২] কিন্তু তার থেকে এ ধারণা করা সঙ্গত হবে না যে উনবিংশ শতাব্দীর অসংখ্য নাট্যকার যেভাবে শেক্সপীয়রকে অনুসরণ, অনুকরণ বা অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারেও তারই অনুবৃত্তি ঘটেছে; কিন্তু তা আদৌ নয়. রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঐ বিষয়টি কোনদিন গভীরশায়ী তো হয়ই নি, উপরন্তু যেটুকু শেক্সপীয়রীয় নাট্য-প্রতিভার ছায়া তাঁর ওপর পড়েছিলো, তাও বেশী দূর পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে পারে নি। অচিরেই রবীন্দ্রনাথের সমীভবনাত্মক প্রতিভা আপন স্বধর্মানুযায়ী নাটক রচনার জগতে প্রবেশ করলেন, যা

একেবারেই রাবীন্দ্রিক। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে অল্পস্বল্প শেক্সপীয়রের অনুভাবনা, কিংবা পরবর্তী সময়ের রূপক-সাঙ্কেতিকতায় কিছু কিছু ইয়েটস বা মেটারলিঙ্ক-এর প্রভাব থাকলেও সর্বত্রই রবীন্দ্রনাট্য-প্রতিভা এমন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে উপস্থিত থেকেছে যে অন্য সবকিছুই তার নীচে চাপা পড়ে গেছে,—ঠিক যেমন দিনের সূর্যালোকের প্রচণ্ড দীপ্তিতে ঢাকা থাকে রাতের তারারা। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মধুসূদন-দীনবন্ধু-গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ নাট্যকারেরা অসীম আগ্রহে শেক্সপীয়রীয় রীতি ছন্দ ভাব, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষা পর্যন্ত কমবেশী অনুসরণ করে বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এক নির্দিষ্ট ও ক্রমবিবর্তিত গতিপথ সুচিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথ বহুলাংশে এর সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও 'বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের আলোচনা করিবার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। কারণ, বাংলা নাটক রচনার ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটকের কোন যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই।'[৩]

অতএব আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে: ক। শতবর্ষের অধিককাল ধরে বহুমুখী বাঙলা নাট্য সাহিত্য-ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ খুব ক্ষীণ। এবং খ। শেক্সপীয়র বা অন্য কোনো পাশ্চাত্য নাট্যকারের অনুসরণ বা প্রভাব রবীন্দ্র-নাটকে শিশু প্রতিভার স্ব-শক্তিতে পথ চলার ক্ষেত্রে 'দেওয়াল ধরার' মতোই কাজ করেছে; যা একান্ত ভাবেই প্রাকৃতিক বা স্বল্পকাল স্থায়ী। এবং এই কারণের জন্যেই রবীন্দ্রনাথের নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাবের অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়ে যেমন আমরা বেশী দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারি না, তেমনি সে বিষয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ উপকরণও আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় না।

আসলে এই ব্যাপারটা এমন ভাবে ঘটেছে কেন? তার কারণ এই যে, রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্পূর্ণতই ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তিনি আজন্ম যে সনাতন ও ঔপনিষদিক ভাবধারায় লালিত হয়েছেন, যে সত্য-শিব এবং সুন্দরের আইডিয়াকে কবিতা-গান প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা বা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন তাকেই তিনি তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ 'খেয়া', মানসী', 'গীতাঞ্জলি', 'সোনার তরী' ইত্যাদির কবি রবীন্দ্রনাথের সত্তাই অপর একটি সাহিত্য প্রকরণের—যাকে নাটক

নামে অভিহিত করতে পারি—মধ্যে দিয়ে আরও কিছু বৈচিত্র্য নিয়ে বহুবিস্তারী এবং গভীরতর আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় অভিনব হয়ে উঠেছে। ফলে, সাধারণ বাস্তবধর্মী বাঙলা নাটককে আমরা যে ভাবে এতক্ষণ আলোচনা করে এসেছি রবীন্দ্রনাথের ভাবধর্মী আলোচনার সময় সেই মাপকাঠির ব্যবহার চলতে পারে না। কেন না: 'রবীন্দ্রনাথের যে সব শ্রেষ্ঠ নাটকে তাঁর কবিত্ব-শক্তি ও নাট্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটিয়াছে, সে সব নাটকে চলমান জীবন-প্রবাহ বা ঘটমান জটিল পরিস্থিতিকে তিনি নাটকের শ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সমসাময়িক কালকে অতিক্রম করিয়া তিনি অতীতের রাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে আত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ।'[৪]

এই যদি রবীন্দ্রনাট্য-প্রতিভার মৌল-বৈশিষ্ট্য হয় তবে শেক্সপীয়রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়। কেন না উক্ত রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশিষ্টতার সঙ্গে আমাদের এও জানা আছে যে: "'চলমান জীবন-প্রবাহ বা ঘটমান জটিল পরিস্থিতি'র উপর নির্ভর করিয়াই শেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি রচিত হইয়াছে এবং বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই আদর্শই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। চলমান জীবন-প্রবাহ কিংবা ঘটমান জটিল পরিস্থিতি বাহির হইতে যে ভাবে বিশ্লেষণ করিলে সহজেই বোধগম্য হইতে পারে, মানবাত্মার আকুতিকে সেই প্রণালীতে বাহির হইতে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া বলিবার উপায় নাই, তাহা প্রধানতঃ গভীর ভাবে উপলব্ধি করিতে হয়। একটি বুদ্ধিগম্য আর একটি অনুভূতি সাপেক্ষ। যাহা বুদ্ধিগম্য তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে বেগ পাইতে হয় না, কিন্তু যাহা অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা কিছুতেই বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকই বুদ্ধিগম্য নহে, অনুভূতি সাপেক্ষ... ।"[৫] সেই কারণই রবীন্দ্রনাট্য-প্রতিভা তার উষালগ্নে যতক্ষণ পর্যন্ত চলমান জীবন-প্রবাহ কিংবা ঘটমান এবং জটিল জগৎ পরিস্থিতির ঢেউয়ে দোল খেয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত শেক্সপীয়রের নাটকের সু-পবনে তাঁর নৌকার পাল ভারি হয়ে উঠেছে। আমরা এখানে তারই কিছু পরিচয় সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবো।

এ-বিষয়ে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' [১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দ] নাটকটির বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ, এখানে শেক্সপীয়রের প্রভাব প্রভাত-সূর্যের মতোই ভাস্বর। এখানকার রাণী সুমিত্রার প্রতি রাজা

বিক্রমদেবের সংযমহীন আসক্তি আমাদের 'এ্যান্টনি এণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা' নাটকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রোমসম্রাট এণ্টনি রাজ্যের কল্যাণ-কর্ম অপেক্ষা ক্লিওপ্যাট্রার উষ্ণ সান্নিধ্যকেই অনেক বেশী কামনা করেছেন। তিনি যেমন রোম থেকে আগত দূতকে বলেছেন :

Ant. Let Rome in Tiber melt, and the wide arch
Of the rang'd empire fall. Here is my space
Kingdoms are clay ; our dungry earth alike
Feeds beast as man. The nobleness of life
Is to do thus [*embracing*], when such a mutual pair
And such a twain can do't, in which I bind,
On pain of punishment, the world to weet
We stand up peerless. 1. I.

প্রায় একইভাবেই রাজ্য বা প্রজার বিষয়ে আপন কর্তব্যের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বিক্রমদেব যেন এ্যান্টনির উচ্ছ্বাসের প্রতিধ্বনিতেই বলে উঠেছেন :

বিক্রমদেব ॥ রাজা রানী। কে রাজা ? কে রানী ?
নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে।
জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে। ১।৩

বিক্রমদেব অন্যত্র আরও বলেছেন :

থাক্ গৃহ, গৃহকাজ।
সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি
অন্তরে তোমার গৃহ, আর গৃহ নাই— ১।৩

কঞ্চুকী মন্ত্রীর পক্ষে রাজাকে গুরুতর রাজকার্যের বিষয়ে পরামর্শ প্রার্থনার কথা বলতে এলে বিক্রমদেব প্রচণ্ড অস্বস্তির সঙ্গে বলে উঠেছেন :

ধিক্ তুমি ! ধিক্ মন্ত্রী ! ধিক্ রাজকার্য !
রাজ্য রসাতলে যাক মন্ত্রী লয়ে সাথে ! ১।৩

এ যেন এ্যান্টনির ভাষা থেকেই নেওয়া হয়েছে :

Now for the love of Love and her soft hours ;
Lets not confound the time with conference harsh. 1. I.

এইভাবে এ্যাণ্টনি এবং বিক্রমদেব দু-জনের কণ্ঠে একই সুরে ভোগ এবং লালসার প্রমত্ত রাগিনী ধ্বনিত হয়েছে।

রবীন্দ্র-নাট্য-সমালোচক লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদের ঘটনাটি রবীন্দ্র-নাট্য সাহিত্য সমালোচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, দেখা যায়, নাট্যকাব্য রচনার যুগ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে সকল পাশ্চাত্ত্য নাটক দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 'ম্যাকবেথ' নাটকটির একটি বিশেষ স্থান ছিল।"[৬] এই বিষয়টি আমরা রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকের রেবতী ও চন্দ্রসেন এবং 'ম্যাকবেথ' নাটকের লেডী ম্যাকবেথ ও ম্যাকবেথের আচরণ এবং সংলাপের উদ্ধৃতির সাহায্যে দেখাবার চেষ্টা করবো।

স্বামী চন্দ্রসেনের মনের পাপ ইচ্ছা এবং নিজের উচ্চাভিলাষ রেবতী ক্রূর ও নগ্ন ভাবে প্রকাশ করেছে:

রেবতী॥ যেতে দাও মহারাজ। কী ভাবিছ বসি?
ভাবিছ কী লাগি? যাক যুদ্ধে-তারপরে
দেবতাকৃপায়, আর যেন নাহি আসে
ফিরে।

চন্দ্রসেন॥ ধীরে, রানী, ধীরে।

রেবতী॥ ক্ষুধিত মার্জার
বসে ছিলে এতদিন সময় চাহিয়া,
আজ তো সময় এলো—তবু আজো কেন
সেই বসে আছ!······
······নিজ হাতে
উপায় রচনা করো অবসর বুঝে।
বাসনার পাপ সেই হতেছে সঞ্চয়,
তারপরে কেন থাকে অসিদ্ধির ক্লেশ! ৩।৪

ইত্যাদি সংলাপ ও চরিত্র যেন লেডী ম্যাকবেথের সার্থক অনুসরণে [1. VII] রচিত। অন্যদিকে চন্দ্রসেনও ম্যাকবেথের মতোই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সেও স্ত্রীর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছে:

Mac.···I have no spur
To prick the sides of my intent, but only

Vaulting ambition, which ov'r-leaps itself,
And falls on th' other. 1. VII.

চন্দ্রসেন। অতি ইচ্ছা চলে অতি বেগে। দেখিতে না
পায় পথ, আপনারে করে সে নিষ্ফল।
বায়ুবেগে ছুটে গিয়ে মত্ত অশ্ব যথা
চূর্ণ করে ফেলে রথ পাষাণ প্রাচীরে। ৫।১

যুক্তিহীন এবং অন্ধ হৃদয়াবেগই বিক্রমদেবের চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বিষয়টির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে ওথেলোর মিল দেখতে পাওয়া যায়। ডেস্‌ডেমনার মৃত্যুর পর ওথেলোর অনুতাপ ও শোকের অনুসরণে সুমিত্রার প্রাণত্যাগে বিক্রমের অনুশোচনা অংশটি রচিত বলে মনে হয়। যেমন:

From the possession of this heavenly sight.
Blow me about in winds, roast me in sulphur,
Wash me in steep down gulfs of liquid fire.
O Desdemona! Dead! Desdemona! Dead!
O! O! 5. II.

এইরকম হৃদয়বিদারক সুরেই বিক্রমদেবও বলেছেন:

বিক্রমদেব। দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির অপরাধী করে? ইহ জন্ম
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারো দিলে না অবকাশ?
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর—
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান! ৫।৯

* 'জীবনস্মৃতি'তে শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে কবি-কথিত হৃদয়-বৃত্তির অতিশয়তা—এই নাটকে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। প্রবল পৌরুষসম্পন্ন, প্রচণ্ড আবেগময় বিক্রমদেব চরিত্র অবিমিশ্র শেক্সপীয়রীয় গুণান্বিত। ওথেলোর মত প্রবল বীর্যবত্তা সত্ত্বেও তার হৃদয়বেদনা সহৃদয় হৃদয়কে স্পর্শ করে:

Oth. ... O balmy breath, that dost almost persuade justice to break her sword! 5. II.

তুলনীয়:

বিক্রমদেব। রাজার হৃদয় সেও হৃদয়ের তরে কাঁদে। ২।২

এবং

বিক্রমদেব। আর সখা, আর কেহ যদি থাকে সেথা,
যদি দেখা পাও আর কারো— ৫।৭"৭

এই নাটকেরই উল্লেখযোগ্য একটি পার্শ্বচরিত্র শঙ্করের প্রভুভক্তি ও আনুগত্য দৃষ্টে মনে হয় এ যেন শেক্সপীয়রের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট্' নাটকের অ্যাডম চরিত্র। অর্লাণ্ডোর প্রতি তার অনুরাগ, কুমারের প্রতি শঙ্করের অনুরাগেরই অনুরূপ।

এছাড়াও "ইলা এবং কুমার সেনের প্রণয়-বৃত্তান্ত এবং তাহাদের জীবনের পরিণতির সঙ্গেও শেক্সপীয়রের আর একখানি ট্রাজিডির বিষয় ও ভাগবত সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা 'রোমিও জুলিয়েট'। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই সাদৃশ্য অত্যন্ত গৌণ বলিয়া মনে হইলেও একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ইহাদের উভয়ের পরিণতি একই অভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করিয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই নিয়তির একটি প্রধান ভূমিকা আছে। উভয় নাটকেই শেষ পর্যন্ত এক একটি ভুলের উপর নাট্যকাহিনীর করুণ পরিণতি সংঘটিত হইয়াছে। জুলিয়েটকে মৃত বলিয়া ভুল করিয়াই যেমন রোমিও আত্মহত্যা করিয়াছিল, তেমনিই 'রাজা ও রানী' নাটকেও বিক্রমদেব যে কুমারকে মার্জনা করিয়াছিলেন, সে সংবাদ কুমারের নিকট পৌঁছাইবার পূর্বেই সে আত্মঘাতী হইয়াছিল। বহির্মুখী শক্তির বিরুদ্ধতাই উভয় ক্ষেত্রেই ট্রাজিডির কারণ হইয়াছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্যের সম্পূর্ণ অভাব আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না।"[৮]

এরও অতিরিক্ত শেক্সপীয়রের আরো দু-একটি নাটকের বিষয়বস্তু ও ঘটনার সাদৃশ্য এই 'রাজা ও রানী' নাটকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেমন: ক. এই নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের রাজপথের বিদ্রোহী ও ক্ষুধার্ত জনসাধারণের কথাবার্তা, আচার আচরণের সঙ্গে *Coriolanus* নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের অন্তর্গত রাজপথে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়া রোমের বিদ্রোহী জনগণের কথা, আচার-আচরণ ও ঘটনাগত সাদৃশ্য বেশ স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। খ. তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কাশ্মীর রাজপ্রাসাদের সামনের পথে দাঁড়িয়ে দুজন সৈনিক কথা প্রসঙ্গে মহিচাঁদের

মেয়ের যে আচরণের উল্লেখ করেছে, তার সঙ্গে *The Winter's Tale*-এর Autolycus-এর চরিত্রের মিল লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী নাটক 'বিসর্জন' [১৮৯১] গ্রন্থেও শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করেছেন। এই নাটকের অন্যতম মুখ্য চরিত্র রঘুপতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন যে: 'রঘুপতির দয়া মায়া নেই, সে নিষ্ঠুর প্রথাকে পালন করে এসেছে এবং এমনি ভাবে শক্তিলাভ করে বড় হয়ে উঠেছে।' কবি কথিত রঘুপতির এই ধাত অনেকাংশে শেক্সপীয়রের ট্রাজিডির নায়কদের কাছ থেকেই পাওয়া। অধিকন্তু শেক্সপীয়রের যুগের ম্যাকিয়াভেলির চরিত্রের ছায়া যেমন রঘুপতির ওপর পড়েছে, তেমনি ইয়াগোর মনোভাবের প্রতিফলনও তার মধ্যে পাই। যেমন দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে রঘুপতি বলেছে:

রঘুপতি। পাপপুণ্য কিছু নাই। কেবা ভ্রাতা, কেবা
আত্মপর। কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ।
এ জগৎ মহাহত্যাশালা।

এই ভীষণ রঘুপতির প্রচণ্ড ব্রাহ্মণ্যাভিমানের সঙ্গে রাজশক্তির যে বিরোধ 'বিসর্জন' নাটকে দেখা গেছে তাও রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রীয় ট্রাজিডির সংঘাত-সংকুল আবহাওয়া থেকেই গ্রহণ করেছেন।

রাজাকে হত্যা করে রাজ-ভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের রাজা হওয়ার ইচ্ছার বিষয়টি ম্যাকবেথ নাটকের ডাইনীদের ও নিজ স্ত্রীর কথাবার্তা শুনে ম্যাকবেথের মনে সৃষ্ট উচ্চাভিলাষের সঙ্গে তুলনীয়। নক্ষত্ররায় নিজের মনে বলেছে:

নক্ষত্র। [স্বগত]

যেথা যাই সকলেই বলে, রাজা হবে?
রাজা হবে? এ বড়ো আশ্চর্য কাণ্ড। একা
বসে থাকি তবু শুনি কে যেন বলিছে,
রাজা হবে? রাজা হবে? দুই কানে যেন
বাসা করিয়াছে দুই টিয়ে পাখি; এক
বুলি জানে শুধু, রাজা হবে? রাজা হবে?
ভাল বাপু, তাই হব, ··

এ-যেন ডাইনীদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ম্যাকবেথের উক্তির মতোই:

Macb. Stay, you imperfect speakers, tell me more.
By Sinel's death I know I am Thane of Glamis;

But how of Cawdor ? The Thane of Cawdor lives,
A prosperous gentleman ; and to be King
Stands not within the prospect of belief,
No more than to be Cawdor.' 1. III.

অথবা যখন সব শুনে দেখে ম্যাকবেথ নিজের মনে মনেই বলছে :

Macb. [*Aside*] Glamis, and Thane of Cawdor !
The greatest is behind.—Thanks for your pains. 1. III.

রবীন্দ্রনাথের নাট্য-চর্চার প্রথম যুগের এবং তাঁর সাঙ্কেতিক-রূপক নাটক রচনার বাইরে দুটি শ্রেষ্ঠ নাটক হচ্ছে 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন'। সমালোচকগণ তো বটেই, সাধারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগীরাও এই মত পোষণ করে থাকেন। এখন ঐ-দুটি নাটকের প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা সু-চিত্রিত চরিত্র-দুটির ওপর শেক্সপীয়রের *Hamlet* নাটকের নাম চরিত্রের প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন : "শেক্সপীয়র সৃষ্ট সর্বাধিক আলোচিত এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হ্যামলেট চরিত্রের প্রভাব 'বিসর্জন' নাটকের 'জয়সিংহ' এবং 'রাজা ও রানী' নাটকের কুমারসেন উভয়ের চরিত্রেই লক্ষণীয়। Hamlet-এর চরিত্রের মণীষা অবশ্য এদের চরিত্রে নেই, কিন্তু তার চরিত্রের আবেগধর্মিতা এই দুটি চরিত্রেই অতি সুস্পষ্ট। এই সাদৃশ্য মাত্র শব্দগত নয়, হ্যামলেট সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা এবং পরিচিতির কালেই জয়সিংহ এবং কুমারসেনের চরিত্র দুইটির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।"[৯]

এ-ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ নাট্যচর্চা কালের মধ্যেকার বেশ কিছু নাটকের ভাবে-ভাষায়, রূপে-ভঙ্গীতে, রীতিতে, প্রকৃতিতে শেক্সপীরীয় নাট্যপ্রভাবকে লক্ষ্য করা খুব কঠিন নয়। এখানে আমরা সূত্রাকারে তাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

ক. যে নাটকীয় বিভ্রান্তির ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোড়ায় গলদ' [১৮৯২] বা তার পুনর্লিখিত রূপ 'শেষ রক্ষা' [১৯২৮]—প্রহসনে যে হাস্যরস উৎসারিত করেছেন, তা বহুলাংশে শেক্সপীয়রের 'দি কমডি অব এরর্স'-নাটকের বিষয়-বস্তুর সঙ্গে মেলে। এ-ছাড়াও 'মাচ্ এ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং'-এর বেনেডিক ও বিয়াত্রিস্-এর ঘোর বিবাহ-বিরোধিতার প্রভাব এখানে থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

খ. শেক্সপীয়রের বিখ্যাত কমেডি 'এ মিড সামার নাইটস্' ড্রীম'-এর সঙ্গে

কবির 'চিত্রাঙ্গদা' [১৮৯২] নাটকটির কিছু সাদৃশ্য যেন খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন; চিত্রাঙ্গদা তার যে কু-রূপের পরিবর্তে এক বছরের জন্যে বসন্ত ও মদনের কাছ থেকে অপূর্ব রূপ-লাবণ্য ও প্রেম-সোহাগ সংগ্রহ করেছে; তাও শেক্সপীয়রের উক্ত নাটকের পাকের সাহায্যে লাইসেণ্ডার, ডেমিট্রিয়াস, হেলেনা ও হারমিয়ার কিছুকালের জন্যেও অন্তত প্রেমময় স্বপ্ন-জগতে বাস করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

গ. শেক্সপীয়রের 'লাভ্‌স লেবার্স লস্ট'-এর সঙ্গে 'চিরকুমার সভার' [১৯২৬] বিপিন, শ্রীশ ও পূর্ণ-র কৌমার্য ব্রত গ্রহণের মধ্যে মিল দেখা যায়। আবার ঐ কুমারত্রয় যেমন তিন সুন্দরীকে দেখেই প্রেমজ্বরাক্রান্ত হলো, শেক্সপীয়রের ঐ নাটকেও ঠিক তেমনিই হয়েছে। এই নাটকে শৈলবালার পুরুষের বেশ-ধারণ শেক্সপীয়রের ব্যবহৃত অন্যতম বহু পরিচিত কৌশলের অনুসরণে সৃষ্ট একথা মনে করতে পারি। অধিকন্তু উক্ত দুই নাটকে উভয় নাট্যকারের ব্যবহৃত wit বা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যও অনেকখানি সমধর্মীয়।

ঘ. রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যরচনার সেই আদি-যুগ থেকেই অর্থাৎ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' [১৮৮৪] রচনার সময় থেকেই তাঁর নাটক বা নাট্যকাব্যগুলিতে এক ধরণের 'জনতা চরিত্রে'র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এই সব দোলাচলচিত্ত, মতামতবিহীন, নির্বোধ চরিত্রগুলি তাদের তরল বিশ্বাস, সরল কথাবার্তা এবং পাঁচপাঁচী চরিত্র নিয়ে তাঁর নাটকে এক অভিনব স্বাদ সৃষ্টি করেছে। তাদেরকে দেখে শেক্সপীয়রীয় mob scene-গুলির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। এ-বিষয়ে অনেকের মত এই যে প্রাণচাঞ্চল্যে Shakespearian *mob*-এর চেয়ে রবীন্দ্রনাথের 'জনতা' অনেক বেশী নিষ্প্রভ। কিন্তু তাঁদের ঐ ধারণার প্রতি প্রতিস্পর্ধা প্রকাশ না করেও জনৈক রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচকের সম-প্রাসঙ্গিক একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে 'জনতা চরিত্র' সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ যে একটি অনন্য মাত্রা যোগ করে দিয়েছিলেন সে কথা বেশ গৌরবের সঙ্গেই বলতে পারা যায়। তিনি বলেছেন: "বাংলাদেশের লোকজীবনের একটি প্রধান অঙ্গ পথপার্শ্ববর্তী মেলা। এইসব মেলায় বিচিত্র ধরণের, বিচিত্র স্বভাবের এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যের লোক সমবেত হইয়া থাকে। ইহার pattern-এ একদিকে যেমন বৈচিত্র্য, আর একদিকে তেমনি সরলতা।··· তাঁহার অধিকাংশ নাটকে যে জনতা দৃষ্ট হয় তাহা এই প্যাটার্ণেরই অঙ্গ; যে গানের দল ও ঠাকুর্দা দৃষ্ট হয় তাহাদেরও অনুরূপ মেলাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ফকির ও বাউলের দল নাই,

এমন মেলা বাংলা দেশে বিরল। রবীন্দ্রনাথের গানের দল ও ঠাকুর্দার মূলে মেলার ও যাত্রার প্রভাব দুই-ই আছে বলিয়া বিশ্বাস।

"আমার এইসব উক্তি ও অনুমান যদি সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তবে বুঝিতে পারা যাইবে যেসব 'খাঁটি বাঙালী' নাট্যকার শেক্সপীয়রীয় ধরনের ট্র্যাজেডি বা মোলিয়ার-ভাঙা কমেডি লিখিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের নাটক, এখানে তত্ত্বনাট্যগুলি, কি আকৃতির বিচারে, কি প্রকৃতির বিচারে তাঁহাদের নাটকের চেয়ে অনেক বেশী 'খাঁটি দেশী' এবং সেইজন্যই অনেক বেশী বাস্তব।......এমন ভাবে লোকজীবন ও দেশের গভীরতর জীবনোপলব্ধির উপরে আর কাহারও রচনা প্রতিষ্ঠিত নহে।"[১০] এবং কেবল এই গুণেই রবীন্দ্রনাথের নাটক শেক্সপীয়র তুল্য মহৎ ও কালজয়ী।

ঙ. "প্রত্যক্ষভাবে কথাবার্তার ভিতর দিয়া যেমন পাত্র বা পাত্রীর চরিত্র ফুটিয়া ওঠে, তেমন আবার সময়ে সময়ে অপ্রত্যক্ষ উপায়েও কোন কোন চরিত্রের বিশেষ বিশেষ দিক বর্ণনা করানো হয় অন্যান্য চরিত্রের দ্বারা। · যেমন ধরা যাইতে পারে, 'ওথেলো' নাটকের পাত্রপাত্রীগণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া প্রায় শেষ পর্যন্ত নিজেদের কথাবার্তায় ইয়াগো সম্বন্ধে 'সাধু', 'সরল' প্রভৃতি বিশেষণের ব্যবহার করিয়াছে। ··· এই পরোক্ষ প্রথার অবলম্বনে, চরিত্র বর্ণনের রীতির ব্যবহার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' ও 'বিসর্জন'"[১১] নাটক থেকে বেশ কিছু উদাহরণ ['রাজা ও রানী' : ১।১, ১।৪ ; 'বিসর্জন' ১।৩, ১।৫, ২।৩] নেওয়া যেতে পারে। আমরা এখানে 'রাজা ও রানী' থেকে একটি মাত্র উদ্ধৃতি গ্রহণ করবো :

দেবদত্ত। শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যদি,
আছেন ত্রিবেদী ; অতিশয় সাধুলোক ;
সর্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে
ক্রিয়াকর্ম নিয়ে ; শুধু মন্ত্র-উচ্চারণে
লেশমাত্র নাই তাঁর ক্রিয়াকর্ম জ্ঞান। ১।১

চ. কারও মতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঠাকুরদা' বা 'দাদাঠাকুর' জাতীয় চরিত্র শেক্সপীয়রের 'এ্যাণ্টনি এ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা' নাটকের Domitius Enobarbus চরিত্রটির অনুসরণে রচনা করতে প্রেরণা পেয়েছিলেন।

ছ. 'শেক্সপীয়রের নাটকের অনুরূপই নানা উপকাহিনী ও শাখাকাহিনী সৃষ্টি করিয়া···[নাটকের] কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টি করা হইয়াছে, অন্ধপ্রবৃত্তি

ও সংস্কারের দুর্নিবার আকর্ষণের করুণ পরিণতি উভয়'[১২] নাট্যকারই তাঁদের নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে বহু ক্ষেত্রেই গ্রহণ করেছেন।

জ. এছাড়াও নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাগ, অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার, জনতা ইত্যাদির মুখে গদ্য সংলাপ দেওয়া শেক্সপীয়রের অনুপ্রেরণায়-ই এসেছে—এ কথাও সঙ্গত কারণেই মনে করা যেতে পারে। এই আঙ্গিকগত প্রভাব প্রসঙ্গে আমরা সমালোচককে অনুসরণ করে এই ভাবে বলতে পারি যে: ইবসেন, শ্য, সিঙ্ এবং মেতারলিঙ্ক প্রমুখের 'রচনার প্রায় সমকালে নাট্যভাষা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নির্বাচন ক'রে নিলেন পদ্য। কেন?

'শেক্সপীয়রের আদর্শে ক্ষণস্থায়ী আশ্রয় এর একটা বড়ো কারণ হয়তো। ঠিক প্রথম সেই যুগে সমকালীন ইয়োরোপের রচনা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ থাকলেও আসক্তি খুব তীব্র দেখি না। বিশেষত ইবসেন প্রসঙ্গে, সিঙ্ এর মতো, তাঁকেও মনে হয় বেশ সন্দিগ্ধ। ফলে গীতিনাটক থেকে মুক্ত হবার প্রাথমিক পদ্ধতি হিসেবে পুরোনো প্রথাকেই তিনি বরণ করলেন নাটকে, বরণ করে নিলেন শেক্সপীয়রকে এবং সেই সূত্রে খানিক-বা রোম্যান্টিক কবিকুলকেও।'[১৩]

এইভাবে তুলনামূলক আলোচনার ধারাকে রবীন্দ্রনাথের নাটক সৃষ্টির ভেতর দিয়ে বেশী দূর পর্যন্ত এবং খুব গভীর দাগ কেটে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যে সম্ভব নয় তা আমরা আগেই বলে এসেছি। এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের সমসময়েই আমাদের সঙ্গে ইংরাজদের যে সংঘাতময় ইতিহাসের সূচনা হলো তা, শেক্সপীয়রসহ সমগ্র ইংরেজী আদর্শকে কিভাবে আমাদের কাছে অবমূল্যায়ন ঘটালো সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন: 'একদা ডেভিড হেয়ারের মতো মহাত্মা অত্যন্ত নিকটে আসিয়া ইংরেজ চরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে আনিতে পারিয়াছিলেন —তখনকার ছাত্রগণ সত্যই ইংরেজ জাতির নিকট হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল। এখন ইংরেজ অধ্যাপক স্বজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা কেবল যে আনিয়া দিতে পারেন না তাহা নহে তাঁহারা ইংরেজের আদর্শকে আমাদের কাছে খর্ব করিয়া ইংরেজের দিক হইতে বাল্যকাল হইতে আমাদের মনকে বিমুখ করিয়া দেন। তাহার ফল এই হইয়াছে পূর্বকালের ছাত্রগণ ইংরেজের সাহিত্যে ইংরেজের শিক্ষা যেমন সমস্ত মন দিয়া গ্রহণ করিত, এখনকার ছাত্ররা তাহা করে না। তাহারা গ্রাস করে তাহারা ভোগ করে না। সেকালের ছাত্রগণ যেরূপ

আন্তরিক অনুরাগের সহিত শেক্সপীয়ার, বায়রণের কাব্যরসে চিত্তকে অভিসিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন এখন তাহা দেখিতে পাই না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরেজ জাতির সঙ্গে যে প্রেমের সম্বন্ধ সহজে ঘটিতে পারে, তাহা এখন বাধা পাইয়াছে।'[১৪]

১। সুলভ সংস্করণ [১৩৬০ বঙ্গাব্দ] : পৃ. ১০০।

২। এই বিষয়ে কৌতূহলজনক, সংক্ষিপ্ত ও স-উদাহরণ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : রীণা ঘোষ : 'শেক্সপীয়র-অনুবাদ ও অনুবাদ-সমস্যা' পৃ. ১২৩-৪।

৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'রবীন্দ্রনাট্যধারা' পৃ. ।৶০।

৪। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সুত্রধার' সাহিত্য বিচারের ভূমিকা' : পৃ. ২৫

৫। দ্রষ্টব্য ৩ নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ॥/০-॥৶১।

৬। ঐ : পৃ. ৫১।

৭। দ্রষ্টব্য ২ নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ১২৪-৫।

৮। দ্রষ্টব্য ৩ নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৫৫।

৯। দ্রষ্টব্য ২ নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ১২৬।

১০। প্রমথনাথ বিশী : 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' পৃ. ১৬৯-৭০।

১১। অশোক সেন : 'রবীন্দ্র নাট্য-পরিক্রমা'

১২। দ্রষ্টব্য ৩ নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৫৩।

১৩। শঙ্খ ঘোষ : 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক'

১৪। দ্রষ্টব্য 'সমাজ' : 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধ।

৬.

উপসংহার

পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে সুবিস্তৃত আলোচনার দ্বারা আমরা নানাভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে বাঙালীর মনীষা, সাধারণ বাঙালীর রস ও রুচি কতদিক থেকে, কত ভাবেই না শেক্সপীয়রকে সংবরণ, সংহরণ ও সম্-শোষণ করার চেষ্টা করেছে। আর এই প্রক্রিয়ার আয়ুষ্কাল প্রায় দু-শ বছর। এখন এখানে যদি ঐ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলিকে সূত্রাকারে দাঁড় করাই তবে এই রকম হয়: ক. য়ুরোপীয়গণ কর্তৃক শেক্সপীয়রের অভিনয় দর্শনে অভিমুগ্ধ বাঙালী। খ. আপন চেষ্টায় স্বরূপে শেক্সপীয়রকে বরণ-সচেষ্ট বাঙালী। গ স্কুল-কলেজের পাঠ্য তালিকায় এবং সশ্রদ্ধায় নিজ নিজ জীবনাচরণে শেক্সপীয়রকে আসনদানে আগ্রহী বাঙালী। ঘ. মাতৃভাষায় শেক্সপীয়রীয় নাট্যরসাস্বাদনে পুলকিত বাঙালী। ঙ. শেক্সপীয়রের ভাব-ভাষা আঙ্গিক-চরিত্র-কৌশলের অনুসরণ ও অনুকরণ দ্বারা নিজ ভাষায় নির্মিত 'নাটক' [Drama] নামে একটি নতুন সাহিত্য-প্রকরণ সৃষ্টিতে সার্থক-কর্মা বাঙালী।

কিন্তু এইভাবে বাঙলা সাহিত্যের নবজাগরণের সূচনা-লগ্ন থেকে শেক্সপীয়রকে বাঙালী তার সাহিত্য ও জীবনাবেগের সঙ্গে সংবৃত করে নিলেও তার জাতীয় ঐতিহ্য, রস-সংস্কার এবং জীবনবোধের কোনখানে শেক্সপীয়রের স্থান হয়েছিলো সে-বিষয়টি আজ আলোচিত হওয়ার প্রয়োজন। কারণ, আজ বাঙালীর যে সমাজ-মানস ও জীবন-গঠন, তার যে প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা সেখানে প্রায় দু-শ বছর ধরে আস্বাদিত শেক্সপীয়র কোন্ স্থায়ী চর জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন, কতখানি শ্যামল আচ্ছাদন তৈরী করতে পেরেছেন তার কিছু হিসাব করা আমাদের গ্রন্থের উপসংহারে কর্তব্য বলে মনে করি। এবং তা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, বাঙলা নাটকের জন্মকাল থেকে অন্তত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-কাল [১৯১৪-১৮] পর্যন্ত শেক্সপীয়রের প্রভাব বাঙলা নাটকের ওপর একান্ত ভাবে সক্রিয় ছিলো। এই প্রভাবগুলি কেমন: ১. 'এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনা-স্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় প্রায় হইয়াছে··· সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্য-

কারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা—প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় [Act] এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক [Act] এক্ট যেরূপ [Scene] সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে,·· যেস্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটক ব্যক্ত হয়, তাহাকেই [Scene] সিন কহে।··অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম' [তারাচরণ শিকদার: 'ভদ্রার্জুন': ভূমিকা]। প্রথম বাঙলা মৌলিক নাটকের এই যে শৃঙ্খলানুসরণ তা যে পরোক্ষে শেক্সপীয়রের অনুপ্রেরণাজাত তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

২. শেক্সপীয়রের নাটকের 'lofty passions' অথবা 'প্রবল অতিশয়তা' আমাদের গোড়া থেকেই আকর্ষণ করেছে। আমরা উনিশ শতকের সেই নবোন্মাদনার কালে—যখন আমরা প্রাচীন ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছি, তখন শেক্সপীয়রীয় হৃদয়াবেগের অতিশয়তাকে বিশেষভাবে বরণ করার চেষ্টা করেছি; এবং সদ্যোজাত বাঙলা নাটককে আশ্রয় করে এই দিকটিই সবচেয়ে বেশী আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে।

৩. বাঙলা ভাষায় প্রথম মৌলিক বিষাদান্ত নাটক রচনার পেছনেও শেক্সপীয়রের যে প্রভাব তাকে অস্বীকার করি কেমন করে? এর কারণ ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'কীর্তিবিলাস' নাটকের কৈফিয়ৎ অংশে নাট্যকার স্বয়ং উল্লেখ করেছেন [দ্রষ্টব্য: বর্তমান গ্রন্থের ৬৯ পৃষ্ঠা]।

৪. এ-ছাড়াও শেক্সপীয়রের নাটকস্থ 'রোমিও জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রণয়-দাবদাহ অথবা চরিত্রগত নানাবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও সামান্য ভুল, সামান্য ত্রুটির ফলে অপরিসীম সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের সর্বগ্রাসী ধ্বংস, বা পরিপূর্ণ অপচয়ের অনুভূতি' বাঙলায় ট্রাজেডি রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তার ফল বাঙলায় কতটুকু সার্থক হয়েছে সে আলোচনা ভিন্নতর, কিন্তু বাঙালী নাট্যকার যে শেক্সপীয়রীয় নাটকে প্রাপ্ত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ও তা থেকে জাত গতিময়তাকে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন তাকে অস্বীকার করা যায় না।

৫. শেক্সপীয়রের নায়ক-নায়িকার স্বাধীন প্রেম, কোথাও নারীর উজ্জ্বল

ব্যক্তিত্ব, কারুর মধ্যে বা স্বাধীন পতি নির্বাচন ও অভিভাবকদের প্রতি অনুগত থাকার দ্বন্দ্ব বাঙালী জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তার নাটকেও ছায়াপাত করেছে। এই প্রেম ও বিবাহ সমস্যা বহু বাঙলা নাটকের উপজীব্য হয়েছে।

৬. শেক্সপীয়রের প্রধানতঃ ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে যে দেশপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, তার ধারা প্রথম দিকে না হলেও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙলা নাটকের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। ঐ সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র প্রমুখের দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাঙলা নাটকগুলি অনুসরণ করলেই আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপাদিত হতে পারবে বলে মনে হয়।

৭. শেক্সপীয়রের নাটকীয় form-এর অন্যতম আদর্শ ছিলো poetic drama। বাঙলা নাটকে এই আদর্শ পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হয় নি। মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ যে নাটক এবং যাতে শেক্সপীয়রের অনুসরণ সর্বাধিক, সেখানে তাঁরা এই form গ্রহণ করেন নি। আবার গিরিশচন্দ্র শেক্সপীয়রের দ্বারা প্রভাবিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলিতে এই form-কে গ্রহণ করেছেন [যেমন : 'জনা'—ইত্যাদি]। দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়রকে সবচেয়ে সার্থকভাবে যেখানে অনুসরণ করেছেন সেখানে কিন্তু তিনি এই poetic drama-র form সম্বন্ধে বলেছেন : 'কবিতায় আমার অতিরিক্ত আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারি নাই।' তবুও তিনি poetic drama-র form-কে গ্রহণ করেন নি। আবার অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শেক্সপীয়রকে অনুসরণে সৃষ্ট প্রখ্যাত নাটকগুলির সবই কাব্যনাট্য। অতএব বাঙলা নাটক শেক্সপীয়রের পোয়েটিক ড্রামাকে স্বাগত জানায় নি— একথা বললে সত্যের মর্যাদা পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় না।

৮. এ-ছাড়াও মঞ্চ-নির্দেশ, স্বগতোক্তির ব্যবহার, ক্রিয়া-প্রাধান্য, মঞ্চে এক বা একাধিক হত্যাকাণ্ড ঘটানো, বা নায়কের বা নায়িকার আত্মহনন-দৃশ্য দেখানো, জনতার চরিত্র প্রভৃতির মধ্যে শেক্সপীয়রীয় বিষয়বস্তুকে স্থান দেবার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু এহো বাহ্য। বাঙলা নাটক রচনার প্রায় একশো বছরের ইতিহাসে শেক্সপীয়রের যে প্রভাব সে-সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নাট্যকার-অভিনেতা ও সমালোচক বন্ধু যে কথা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : 'এই দীর্ঘস্থায়ী শেক্সপীয়রীয় প্রভাবের চরিত্র কোনো সময়েই গুণগত নয়, তা

সব সময়েই বহিরজগত এবং নিতান্তই ভাসা-ভাসা' [রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত]। কিন্তু কেন এমন মন্তব্য করা হলো? রেনেসাঁসে-র সঙ্গে মিলিয়ে আমরা আমাদের উনবিংশ শতকীয় যে নব-জাগরণকে গ্রহণ করে থাকি, সেই নব-জাগরণের অন্যতম ফসল আমাদের নাট্য-সাহিত্যের-জগৎ নির্মাণে শেক্সপীয়রীয় সহায়তা গ্রহণের দ্বারা কেন আমরা সামগ্রিকভাবে সার্থক হলাম না? এর বহুতর কারণ আছে। এখানে কয়েকটি মাত্র কারণের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করবো, যার দ্বারা বাঙলা নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাবের স্বরূপটিকে বোঝা সহজ হবে বলে মনে করি।

প্রথমত, য়ুরোপের নব জাগরণ বা রেনেসাঁস তার সামাজিক কাঠামোটিকেই পরিবর্তিত করে দিয়েছিলো। অর্থাৎ তা পুরাতন সামন্ততন্ত্রকে সরিয়ে নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয়কে নিশ্চিত করে দিয়েছিলো। আমাদের এখানের অর্থাৎ বঙ্গীয় নবজাগরণের ক্ষেত্রে সেটি হয় নি। এখানে মধ্যযুগীয় সামাজিক ও আর্থ কাঠামো পরিবর্তিত না হয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এক নতুন সামন্ত শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। ফলে, এ আদৌ নবজাগ্রত বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাব-কর্ম-জ্ঞান-এর বিপ্লব বলে গৃহীত হতে পারে নি।

দ্বিতীয়ত, য়ুরোপীয় নবজাগ্রত বিপ্লব জন্মলাভ করেছে, বর্ধিত হয়েছে এবং বিকাশ লাভ করেছে এক মুক্ত-স্বাধীন পরিবেশে। কিন্তু আমাদের কোন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তো ছিলোই না; উপরন্তু উক্ত নবোদ্ভূত সামন্তশ্রেণী সর্বপ্রকারে ইংরেজের পোষকতা, স্তাবকতা ও বহুলাংশে দাস্যবৃত্তি করে এসেছে। ফলে, কোন স্বাধীন বুদ্ধি ও আর্থ-সমাজ বিকাশ আমাদের এখানে সম্ভব হয় নি।

তৃতীয়ত, য়ুরোপীয় রেনেসাঁস তার জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও প্রধানত বিপুল কর্মোদ্যমের মধ্যে দিয়ে তার সমাজ-আর্থ-ও-রাষ্ট্রিক জীবনে নিয়ে এসেছিলো ব্যাপক মুক্তি। এই মুক্তির জয়গান তার সমগ্র সাহিত্য-শিল্প ও বিজ্ঞান-সাধনায় আত্মপ্রকাশ করেছিলো। কিন্তু আমাদের কর্মে কোন মুক্তি আসেনি। আমরা নতুন নতুন ভৌগোলিক আবিষ্কারের অভিযাত্রায় বার হই নি; বিশ্ব জুড়ে বাণিজ্য সম্ভার বহন করে বেড়াই নি; যন্ত্রশিল্পের উদ্যম আমাদের শূন্য, আর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও জ্ঞান য়ুরোপেরই ধার করা। এমন অবস্থায় আমরা কেবল ইংরেজী হৌসে চাকুরী বা মুৎসুদ্দীর কাজ করেছি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপস্বত্ব ভোগ করেছি। ফলে, যে ক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব শেক্সপীয়রীয়

বা য়ুরোপীয় নাটকের প্রাণ তো আমাদের নাটকে আদৌ সঞ্চারিত হতে পারে নি। যদি কোথাও একটু আধটু হয়ে থাকে, তবে তা অনুকরণাত্মক—স্বভাবগত বা সংশ্লেষাত্মক নয়।

চতুর্থত, যেখানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ফলে য়ুরোপে নবজন্মের বিপ্লব সাধিত হয়েছিলো, সেখানে আমরা প্রথম দুটি বাদ দিয়ে বা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে 'মানবতাবোধ, স্বাধীন চিন্তার আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রীজাতির সামাজিক বন্ধন মোচনের প্রচেষ্টা, প্রাচীন প্রথানুগত্য অপেক্ষা উদার ধর্মবোধের শ্রেষ্ঠতা প্রচার' ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে মাত্র জেগে উঠলাম,—স্বাস্থ্য, স্বভাব-চরিত্র সবই ঠিক রইলো। তাই অন্যান্য অনেক দিকের মতো বাঙলা নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের নাট্য-সাহিত্য সভায় শেক্সপীয়রকে আমন্ত্রণ করে এনে সর্বশ্রেষ্ঠ ও শ্রদ্ধেয় আসন দান করলাম বটে, কিন্তু তাঁকে পরিপাক করে নিয়ে আমাদের নাটকের স্বাস্থ্য—রক্ত-মাংস-মেদ সৃষ্টি করতে পারলাম না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই প্রথম সার্থক নাট্যকার যিনি আমাদের এই অক্ষমতাটুকু অল্পদিনের মধ্যে বুঝতে পেরে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি নাট্যপথ সৃষ্টি করে নিতে পেরেছিলেন। এবং সেইখানেই আমাদের নাট্যসাহিত্যের যথার্থ সার্থকতা।